রো য়া ক

রোয়াক

দীপক চৌধুরী

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ১২

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

মূল্য : ৩·৫০

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক : শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বিনয় ঘোষ

বন্ধুবরেষু

দীপক চৌধুরীর অন্যান্য উপন্যাস

শঙ্খবিষ

ঝড় এলো

কুমারী কন্যা

এই গ্রহের ক্রন্দন

'Running faster, faster along
the very edge of the abyss—'

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

অর্থবিদ্যা নিয়ে এম-এ পড়ছিল ললিতা। ললিতা মিত্র। কি ক'রে পড়ছিল, কেমন ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনে যোগাচ্ছিল এবং ট্রামের ভাড়াই বা পাচ্ছিল কোথায় সে-সব সংবাদ কারো জানা ছিল না। পিতা সুবোধ মিত্র এমনভাবে চলাফেরা করতেন যে, ললিতার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'তো দিনে ছু'একবার। কোন কোন দিন একবারও না। ললিতার সঙ্গে যেন দেখা না হয় সেই জন্যে সুবোধ-বাবুকে রীতিমত প্ল্যান করতে হ'তো। পোস্ট অফিসের কেরানী তিনি। প্ল্যান করতেন অফিসে ব'সে। কোনদিন বাড়ি ফিরতেন রাত দশটার পরে, ললিতা যখন ঘুমিয়ে পড়ত। কোন কোন দিন পাঁচটা না বাজতেই ফিরে আসেন তিনি, ললিতা যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরে না। শরীরটা ভাল নেই ব'লে শুয়ে পড়েন বিছানায়। ঘরে ঢুকে সামনেই দেখতে পান ললিতার মাকে। সুবোধবাবু বলেন, "বোধ হয় জ্বর এল।"

"জ্বর?" প্রশ্ন করেন স্নেহলতা।

"হ্যাঁ। মনে হচ্ছে ফ্লু।" সুবোধবাবু উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে থাকেন। স্নেহলতা বলেন, "রাত্তিরে তা হ'লে ভাত খাওয়ার দরকার নেই। পাউরুটি খেয়ো।"

প্রথম প্রথম স্নেহলতা বিশ্বাস করতেন যে, সুবোধবাবুর সত্যিই বুঝি জ্বর আসছে। তাই তিনি ভাতের বদলে পাউরুটি খাওয়ার সতর্কতা অবলম্বন করতেন। ছোট ছেলে চন্দনকে ডেকে বলতেন, "রাত ন'টা বাজল। তোর বাবার বোধ হয় জ্বর এল। যা তো, সিকি পাউণ্ডের একটা রুটি নিয়ে আয়।"

হাত বাড়িয়ে চন্দন বলত, "দাও, পয়সা দাও।"

আঁচলের কোনাটা দাঁত দিয়ে চেপে ধ'রে স্নেহলতা যখন গিঁট

খুলছিলেন, সুবোধবাবু তখন জিজ্ঞাসা করলেন, "এখনো ঘুমতে যাস নি কেন, চন্দন ?"

"যাচ্ছিলুম তো। তোমার জন্যে এখন পাউরুটি আনতে যাচ্ছি।"

"দাঁড়া।" স্ত্রীর দিকে চেয়ে সুবোধবাবুই বললেন, "ঘাম দিচ্ছে।"

"ঘাম দিচ্ছে ?" স্নেহলতা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন।

"হ্যাঁ, গেঞ্জিটা ভিজে গেছে।"

"তা হ'লে আর জ্বর আসবে না।"

"না, মনে হচ্ছে কাল সকাল পর্যন্ত ভালই থাকব। হ্যাঁ রে চন্দন, দিদি কি এখনো ঘুমতে যায় নি ?"

"দিদি আজ সাড়ে আটটায় ঘুমিয়েছে, বাবা।"

"তা হ'লে—" সহসা উঠে বসলেন সুবোধবাবু, "তা হ'লে রুটি আনবার দরকার নেই। শুয়ে পড়্গে যা।"

চন্দন চ'লে যাওয়ার পরে স্নেহলতা বললেন, "রুটি তো আনতে দিলে না। ঘরে বার্লি আছে, খাবে ?"

কাঁচি সিগারেটের বাক্স বা'র করলেন সুবোধবাবু। সাড়ে পাঁচটার সময় অর্ধেকটা টেনে রেখেছিলেন। এখন বাকী অর্ধেকটা টানবার জন্যে দেশলাই খুঁজতে খুঁজতে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাতে কি জল দিয়ে দিলে নাকি ?"

"রুটি খাবে বললে—"

"এখন তো মিনিটে মিনিটে খিদে বাড়ছে। অফিসে গিয়ে কাল কাজও করতে হবে। কাজের প্রেসার দিনদিনই বাড়ছে। বুঝলে স্নেহ, কোন কিছুই টিকবে না। পোস্ট অফিসই বলো, আর রাষ্ট্রই বলো—এত প্রেসার সহ্য করা অসম্ভব। ভাত চাট্টি বেড়ে দাও, খেয়ে নিই। জলসুদ্ধই খাব। যা গরম পড়েছে।"

মাত্র মাস দুই আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছে ললিতা। এর মধ্যেই সুবোধবাবু বার পাঁচেক জ্বরের ছুতো ক'রে বাড়ি এসে শুয়ে পড়েছেন। ললিতা ঘুমিয়ে পড়বার পরে বিছানা থেকে উঠে ভাতও খেয়েছেন তিনি। স্নেহলতার বুঝতে আর বাকী নেই যে, তিনি চান না ললিতার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। দেখা হ'লে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এবং জিজ্ঞাসাও করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ভর্তি হ'ল কি ক'রে। মাসে মাসে মাইনে দেয় কোথা থেকে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকদিন ট্রাম-বাসের ভাড়া যোগাচ্ছে কে, ইত্যাদি।

লেখাপড়ার প্রতি গভীর অনুরাগ ওর ছেলেবেলা থেকেই ছিল। অল্প মাইনে পান সুবোধবাবু। অনেক কষ্ট ক'রে মেয়েকে তিনি লেখাপড়া শেখাচ্ছিলেন। এদিক ওদিক থেকে ধার করতে হয়েছিল তাঁকে। এখনো ধারের টাকা তিনি শোধ দিতে পারেন নি। পোস্ট অফিসে যাঁরা ক্লাশ 'থ্রী'-র কেরানী তাঁরা বন্ধু কিংবা আত্মীয়-স্বজনের কাছে ধার পান না। সুবোধবাবুর ভাগ্য ভাল। স্বাধীন রাষ্ট্রে নতুন বর্ণাশ্রমধর্মের ক্লাশ 'থ্রী' তিনি, তা সত্ত্বেও ধার পেয়েছেন। ধার দিয়েছে সেই ছোকরাটি। দামী গ্যাবার্ডিন কাপড়ের প্যাণ্ট পরে। নতুন চাকরি পেয়েছে। ক্লাশ 'ওয়ানে'র ব্রাহ্মণ নয়, ক্লাশ 'টু'-র বৈদ্য। সত্যিই বৈদ্য। অমিয়াংশু সেন। বাপ মা নেই। বড় ভাই দু'জন দিল্লীর সরকারী অফিসে বড় চাকরী করেন। তাঁরাই অমিয়াংশুকে পোস্ট অফিসে ঢুকিয়েছেন। একেবারে প্রথমেই অফিসার, ক্লাশ 'টু'। ভাগ্যের জোর না থাকলে অমিয়াংশুর সঙ্গে সুবোধবাবুর পরিচয় হ'তো না। পরিচয় হ'লেও টাকা ধার পেতেন না তিনি। ফী জমা দেওয়ার শেষ তারিখটা প্রায় পার হ'য়ে গিয়েছিল। হতাশ হ'য়ে পড়েছিলেন সুবোধবাবু। দুপুরবেলার দিকে পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ডালহাউসি স্কোয়ারের পশ্চিম দিকের বড় পোস্ট অফিসের দোতলায় উঠলেন। আবার

নেমে এলেন একতলায়। এমনি ক'রে বার পাঁচেক ওঠানামা হ'ল। শুধু ডাল-ভাত খেয়ে মধ্য বয়সে তিনি কি ক'রে যে এতবার ওঠানামা করেছিলেন সেকথা ভেবে সুবোধবাবু আজও মাঝে মাঝে বিছানায় শুয়ে ছটফট করেন। তবুও তিনি চেষ্টা করতে ছাড়েন নি। ধার পাওয়ার জন্যে বড় পোস্ট অফিসের সবগুলো কাউণ্টারের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সুবোধবাবু। কী সর্বনেশে অভিজ্ঞতা রে বাবা! বাড়িটার সবগুলো কাউণ্টারের পেছনে শুধু কাগজ আর কাগজের টাকা। একটা ছোট থাবা মারলেই ললিতার 'ফী'-র টাকা উঠে আসত। কিন্তু পারলেন কই? অপরিমিতভাবে ঘামতে লাগলেন তিনি। ভুল ক'রে একবার ফুটপাতের দিকে চ'লেও এসেছিলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল বড় ঘড়িটার দিকে। ওরে বাবা, একটা যে বাজে! ইন্‌সিওরের চিঠিগুলো যে বিলি করবার জন্যে এখনো পিওনদের দেওয়া হয় নি। ফতুয়ার পকেটে আলমারির চাবি রয়েছে। সুবোধবাবু ছুটতে ছুটতে এসে ব'সে পড়লেন তাঁর চেয়ারে। দু'চার মিনিট বিশ্রাম করলেন। পিওনরা সব ডিউটিতে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আলমারি খুলে ইনসিওরের চিঠিগুলো বা'র করলেন। চিঠি তিনি বা'র করছেন বহু বছর থেকে। হাতের চেটোতে তাপ লাগে নি কোনদিন। আজ লাগল। রাগ হ'ল ললিতার ওপর। কি দরকার ছিল বি-এ পড়বার? সে কি জানে না যে, বাবা ওর ক্লাশ 'থ্রী'-র শূদ্র? এখন তিনি কি করবেন? হাতের চেটোয় তাপ লাগছে যে।

পরিস্থিতি যখন ক্রমশই গরম হ'তে হ'তে স্ফুটনাঙ্কের গা ছুঁতে যাবে, ঠিক সেই সময়—ঠিক সেই মুহূর্তে অমিয়াংশু সেন এসে উপস্থিত হ'ল সুবোধবাবুর সামনে। আজও সে নতুন কেনা গ্যাবার্ডিনের সুট প'রে এসেছে। ছোকরা তো ফক্কুড়িতে নম্বর ওয়ান! সারা কলকাতা একশো পাঁচ ডিগ্রীর তাপে জ্ব'লেপুড়ে

ছাই হ'য়ে যাচ্ছে, আর এই ছোঁড়াটা গ্যাবার্ডিনের কোট গায়ে রেখেছে কি ক'রে ?

সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল অমিয়াংশু। গরম পরিস্থিতির মধ্যে সুবোধবাবুর মাথা প্রায় গ'লে যাচ্ছিল, এমন সময় চৈতন্য তাঁর ফিরে এল। তিনি অনুরোধ করলেন, "বসুন, বসুন।"

টেবিলের সামনে চেয়ার একটা ছিল। অমিয়াংশু তক্ষুনি বসল না। ক্লাশ 'টু' ছু' একবার অনুরোধ শুনলেই বসতে পারে না। তাতে জাত বাঁচে না। অমিয়াংশু তাই পকেট থেকে সোনার সিগারেট কেস বা'র করল। কেসটা খুলতে অনাবশ্যক সময় নষ্ট করছিল সে। সুবোধবাবু পুনরায় অনুরোধ করলেন, "বসবেন না ?"

অমিয়াংশু তবু জবাব দিল না। ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেটটা ধ'রে রেখে প্যান্টের পকেটে দেশলাই খুঁজতে লাগল। দেশলাই ছিল ওর ডান পকেটে। কিন্তু হাত ঢোকাল বাঁ পকেটে। প্রায় আরও এক মিনিট কাটল। ডান দিকের পকেট থেকে শেষ পর্যন্ত দেশলাইটা টেনে বা'র করল অমিয়াংশু। সিগারেট ধরাতে কাঠি নষ্ট করল তিনটে। তখন তো সুবোধবাবু তাকে বসবার জন্যে চতুর্থ বার অনুরোধ ক'রে ফেলেছেন।

অমিয়াংশু সেন বসল। সিগারেটে ছু'তিনটে ঘন ঘন টান মারল সে। নাকের মধ্যে দিয়ে ধোঁয়া বা'র করল প্রচুর। বাদবাকী ধোঁয়া মুখ দিয়ে ছুঁড়ে মারল সুবোধবাবুর দিকে। নিশ্বাস টানলেন সুবোধবাবু। বিলিতী তামাকের গন্ধ অনেকদিন পরে নাক দিয়ে টানতেও আরাম লাগছিল তাঁর।

অমিয়াংশু জিজ্ঞাসা করল, "এত বেশি ঘামছেন কেন, মিস্টার মিত্র ?"

মিস্টার ? কেমন একটু হকচকিয়ে গেলেন সুবোধবাবু। একশো

পাঁচ ডিগ্রী তাপের মধ্যে ঠাট্টা ইয়ার্কি সহ্য করা সোজা নয়। তিনি বললেন, "যা গরম পড়েছে।"

"দেখুন—" অফিসার সেন এদিক ওদিক চেয়ে শেষ পর্যন্ত ব'লেই ফেললেন, "দেখুন সুবোধবাবু, আপনি বোধ হয় ভুল ক'রে একটা ইন্‌সিওর চিঠি পকেটের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। ঠিক বলি নি?"

"খুঁজে দেখি—" বাঁ দিকের পকেটে হাত ঢোকাতে যাচ্ছিলেন সুবোধ মিত্র।

অমিয়াংশু বলল, "ডানদিকের পকেটে হাত দিলেই পাবেন। ব্যাপার কি সুবোধবাবু? এতদিনকার পুরনো লোক আপনি। টাকা পয়সাও কম ঘাঁটেন নি। এই বয়েসে তো এমন সর্বনেশে লোভ থাকা উচিত নয়।"

"চুরির লোভ কোন বয়সেই থাকা উচিত নয়। আমি নিশ্চয়ই কয়েক মুহূর্তের জন্যে উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছিলাম। নইলে ভুল ক'রে বাঁ পকেটে সরকারী কাগজ রাখতে যাব কেন? ওপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট করবেন নাকি?"

"নাঃ। সেই মতলব থাকলে সাক্ষী রাখতুম। বাড়িতে কারো অসুখবিসুখ যাচ্ছে বুঝি?"

সুবোধবাবু মুখ নিচু করলেন, বললেন না কিছু। এত বছর চাকরি করার পর এই বয়সে হঠাৎ যেন এইমাত্র তিনি প্রথম আজ একজন জ্যান্ত মানুষের মুখ থেকে সহানুভূতির কথা শুনলেন। ভাবপ্রবণতার বাষ্পে চোখ তাঁর ভিজে উঠছিল। অমিয়াংশু হয়তো বুঝতে পারল তা। ইন্‌সিওর চিঠিখানার ওপর টুপটুপ ক'রে দু' ফোঁটা জল পড়তে দেখল সে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করল অমিয়াংশু, "শুনি-না কি হয়েছে?"

"টাকার অভাবে প'ড়ে গেছি। বেশি টাকা নয়। কিন্তু এটা

এমন একটা অভাব যার মধ্যে অপমান রয়েছে। আর এ অপমান আমার ঘরের লোকের কাছেই।”

“কিরকম ?” সেন সাহেব আগ্রহশীল হ’য়ে উঠল। দ্বিতীয় সিগারেটটি সে ধরিয়ে নিল শেষ-হ’য়ে-আসা প্রথমটির আগুন থেকে।

সুবোধবাবু বললেন, “সন্তানের কাছে আর মুখ দেখাতে পারব না।”

“সন্তান ? কিরকম সন্তান ?”

“মেয়ে সন্তান সার।”

“বয়স কত তার সুবোধবাবু ? নিশ্চয়ই বেশি, নইলে ছেলে-মানুষের কাছে বাপের আবার অপমান কি ?”

“আপনি ঠিকই বলেছেন। বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছে। পরশুদিন তার ফী জমা দেওয়ার শেষ তারিখ।”

এরই মধ্যে অমিয়াংশু তার সিগারেট কেসটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল সুবোধবাবুর দিকে। বেলা সাড়ে দশটার সময় কাঁচি সিগারেটের আধখানা ফুঁকে বাকী অর্ধেকটা তিনি রেখে দিয়েছিলেন পাঞ্জাবির পকেটে। বেলা একটার সময় তাঁর লাঞ্চ খাওয়ার সময়। লাঞ্চ শেষ ক’রে তিনি সওয়া একটার মধ্যে সেই অর্ধেকটা টানেন। আজকে আর সুবোধবাবু কোন নিয়মই মেনে চলতে পারেন নি। মনে মনে বি-এ পরীক্ষার ফী যোগাড় করতে গিয়ে সব কিছু ওলটপালট হ’য়ে গেল।

অমিয়াংশু বলল, “সিগারেট খান তো, সুবোধবাবু ?”

“আজ্ঞে।”

“একটা তা হ’লে নিন। বিলেতী ব্র্যাণ্ড। স্বাধীন ভারতবর্ষে বাস ক’রেও এইটুকু পরাধীনতা জীইয়ে রেখেছি। দিল্লীর ওপর-ওয়ালাদের মুখেও পরাধীনতার লোভ খুব প্রবল।”

"হবেই তো। এর স্বাদের মধ্যে যে সভ্যতার নিকোটিন রয়েছে। একটা তা হ'লে নিলুম।"

সুবোধবাবু যখন সিগারেট ধরাচ্ছিলেন, অমিয়াংশু তখন দেওয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে চেয়ে সময় দেখে নিল। নিজের হাত-ঘড়িটা দুনিয়ার কোন ঘড়ির সঙ্গে সময় মিলিয়ে চলে না। সে তার নিজের ছন্দে প্রতিদিন পাঁচ মিনিট ক'রে পেছন দিকে চলতে থাকে। প্রত্যেক দিনই সময় ঠিক করতে হ'লে ওকে অঙ্ক কষতে হয়। পাঁচ কি সাত মিনিট যোগ দিয়ে তবে বেরুতে হয় কাজে। তাই সে জিজ্ঞাসা করল, "এখন ক'টা বাজল, সুবোধবাবু?"

সুবোধবাবুও দেওয়ালের দিকে চেয়ে বললেন, "সওয়া একটা।"

"কারেক্ট টাইম জিজ্ঞাসা করছি—"

"আজ্ঞে—" হাঁ ক'রে চেয়ে রইলেন সুবোধবাবু, "আজ্ঞে পোস্ট অফিসের সময় তো কারেক্ট হবেই। প্রত্যেকদিন কলকাতা-রেডিয়োর টাইমের সঙ্গে মেলানো হয়।"

"কলকাতা-রেডিয়ো কার সঙ্গে মেলায়?"

"শুনেছি, গ্রীনউইচ টাইমের সঙ্গে—"

"দোতলায় ওঠবার সময় আপনাদের দেওয়ালে চারটে ঘড়ি আমার চোখে পড়ল, কিন্তু কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই কেন?"

জবাব দিলেন না সুবোধ মিত্র। কি জবাব দেবেন তিনি? ভারতবর্ষ যাঁরা শাসন করছেন তাঁদের ঘড়িতে যদি বে-টাইমের শেকড় গজিয়ে গিয়ে থাকে তা হ'লে তিনি তার সংশোধন করবেন কি ক'রে? তিনি পোস্ট অফিসের কেরানী। ব্রিটিশ আমলে শুধু কেরানী নামেই পরিচিত ছিলেন। এখন আবার নতুন উৎপাতের তখমা পরতে হয়েছে। ক্লাশ 'থ্রী'-র গৌরব তাঁর বিনে পয়সার তখমা।

প্রশ্নের জবাব না পেয়ে অমিয়াংশু বলল, "ছাত্র-জীবনে এই ঘড়িটা পেয়েছিলুম বৌদির কাছ থেকে। কীই বা এর দাম। প্রত্যেকদিন অন্তত পাঁচ মিনিট ক'রে শ্লো হ'য়ে যায়।"

"মেরামত করিয়ে নিন। আমার একজন বন্ধু খুব ভাল মেরামত করে।"

"কতবার যে মেরামত করিয়েছি তার হিসেব দিতে গেলে আবার আমায় অঙ্ক কষতে হয়। ঘড়ির যা দাম তার তিনগুণ টাকা খরচ হ'য়ে গেছে মেরামত করাতে।"

"তা হ'লে নতুন একটা কিনেই ফেলুন।"

"কিনতুম। কিন্তু—" ইচ্ছে ক'রেই কথাটা শেষ করতে দেরি করল অমিয়াংশু, "বৌদি বলেন, নতুন ঘড়ি কিনে কি হবে, যৌতুক তো পাবেই।"

"যৌতুক?" বিস্ময়ে চোখ দু'টো বিস্ফারিত করলেন সুবোধবাবু, "আজকাল কেউ কাউকে যৌতুক দেয় না কি?"

"বিয়ে যদি করি তা হ'লে—" হাসবার চেষ্টা করল অমিয়াংশু, "বৌদি লিখেছেন, অনেক কিছু পাওয়া যাবে।"

অমিয়াংশু যে এখনো অবিবাহিত সেই খবরটা দেওয়া হ'য়ে গেল। এবার সে নিশ্চিন্ত বোধ করল। ইতিমধ্যে সুবোধবাবুর ঘাম শুকিয়ে গেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বিয়ে বুঝি পাকা হ'য়ে গেছে?"

"নাঃ—সম্বন্ধ আসছে ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরে থেকে। উত্তরে সিকিম, দক্ষিণে কুমারীকা অন্তরীপ, পশ্চিমে বোম্বে, আর পুবের সীমান্ত ভারতবর্ষের বাইরে—ভিয়েৎনাম। দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামের রাজধানী হচ্ছে সাইগন। সেখানে একটি বাঙালী পরিবার আছে। কিন্তু বিয়ে আমি এখন করব না।"

"কেন সার?" সুবোধবাবু এর মধ্যেই অন্য মানুষ হ'য়ে

গেলেন। 'ফী'-র টাকা কোথা থেকে আসবে তাও তাঁর মনে নেই। থাকা সম্ভবও নয়। পোস্ট অফিসের বাইরে অন্য এক জগতে বিচরণ করছিলেন তিনি। বিচরণ করতে করতে একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলেন। অমিয়াংশু তাঁকে সজাগ ক'রে তুলল, "তা হ'লে সুবোধবাবু—"

লম্বা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "তা হ'লে আপনাকে ধন্যবাদ। ইনসিওরটা যথাস্থানে রেখে দিই। কাল বিলি হ'য়ে যাবে। আপনি কি উঠছেন?"

"আমায় আবার 'আপনি' বলছেন কেন? বয়স তো আমার আপনার অর্ধেক। কিংবা অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশিও হ'তে পারে। ছ' মাস পরে পঁচিশে পড়ব। তা হ'লে—" অমিয়াংশু উঠল, "চলি। ব্যাঙ্ক বন্ধ হ'তে আর মিনিট কুড়ি বাকী।"

"কোন্ ব্যাঙ্ক?" অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করলেন সুবোধবাবু।

"সব ব্যাঙ্কই এক সময়ে বন্ধ হয়। আমার একাউণ্ট হচ্ছে লয়েড্সে। এখান থেকে খুবই কাছে। মিনিট তিনেকের মধ্যে বেরতে পারলে পৌঁছতে পারব। পারবই। ত্ব'টোর সময় ওরা টাকা দেওয়া বন্ধ করে।"

"আপনি বুঝি টাকা তুলতে যাচ্ছেন?" কিছু একটা বলা দরকার ব'লেই সুবোধবাবু প্রশ্নটা করলেন। জবাব পাওয়ার জন্যে করেন নি। সেনসাহেব এখন তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেই যেন রক্ষা পান তিনি। বাঁ পকেটে হাত ঢুকিয়ে সাড়ে দশটার পোড়া সিগারেটটা খুঁজতে লাগলেন সুবোধবাবু। অমিয়াংশু বুঝতে পেরে আবার তার সিগারেট কেসটা এগিয়ে ধ'রে বলল, "নিন। না, না, একটা নয়, গোটা তিন তুলে নিন।"

নিতে গিয়ে হাত কাঁপতে লাগল সুবোধ মিত্রের। এক সঙ্গে তিনটে সিগারেট তিনি নিতে পারলেন না। অমিয়াংশু নিজেই

গোটা চার সিগারেট টেবিলের ওপর ফেলে রেখে বলল, "তা হ'লে—এই যা, ভুলেই গিয়েছিলাম।" ব'লে থামল সে। ভেবেছিল, সুবোধবাবু নিজেই আলোচনাটা চালু করবেন। করলেন না ব'লে অমিয়াংশু জিজ্ঞাসা করল, "তা হ'লে 'ফী' জমা দেওয়ার কি করবেন?"

ভস ভস ক'রে বার দুই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুবোধবাবু জবাব দিলেন, "দেখি, কেউ যদি দয়া ক'রে অল্পকিছু টাকা ধার দেয়। বাকীতে পরীক্ষা ওকে দিতে দেবে না। পরে হয়তো আমি যোগাড় ক'রে দিতে পারতুম। কিন্তু বাড়ি ফিরে ললিতার সামনে দাঁড়াব কি ক'রে তাই ভাবছি।"

"ললিতা? মানে—" তোতলাতে লাগল অমিয়াংশু।

"আমার মেয়ের নাম ললিতা। লেখাপড়ায় বেশ ভাল। প্যাস করবার আগ্রহ খুব বেশি। কিন্তু—"

চেয়ারে ব'সে পড়েছিল অমিয়াংশু। এবার সে বলল, "চলুন, আর দেরি করলে লয়েড্‌সে ঢোকা যাবে না। আসুন আমার সঙ্গে।"

"কোথায় যাবো?"

"এখান থেকে দু' মিনিটের পথ। লয়েড্‌স ব্যাঙ্ক। দিশী ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার বাবারও ছিল না। দাদাদের তো নেই-ই। আসুন, দেরি করবেন না। সরকারী ব্যাঙ্কে পর্যন্ত আমরা এক আধলা রাখি না। কে জানে মশাই, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কখন কি খেয়াল হয়—ধার আমি আপনাকে দিচ্ছি। সুবিধে মত ফিরিয়ে দেবেন। তা ছাড়া, লেখাপড়ার প্রতি যার এত আগ্রহ তার ক্ষতি আপনি কিছুতেই করতে পারেন না। কি যেন নাম বললেন? মানে, আপনার মেয়ের নামটা এর মধ্যেই ভুলে গেছি।"

ঢোক গিলে গিলে গলা ভেজাতে হ'ল সুবোধবাবুর। ভিজিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, "ললিতা।"

"কোন্ কলেজে পড়ে?"

"আশুতোষ।"

"বড় নাম—"

"কলেজটাও খুব বড়।"

তারপর অমিয়াংশু আর দেরি করল না। সুবোধবাবুকে এক রকম টানতে টানতে নামিয়ে নিয়ে এল নিচে। প্রতিদিনকার চেনা সিঁড়িটাও কেমন যেন তাঁর চোখে নতুন নতুন ঠেকতে লাগল। ফুটপাতে পৌঁছে তাঁর মনে হ'ল, এ-পথে সত্যিই তিনি কোনদিনও পা দেন নি।

এ একেবারে অচেনা পথ।

দরজা বন্ধ হওয়ার সাত মিনিট আগে অমিয়াংশু এসে পৌঁছে গেল ব্যাঙ্কে। সুবোধবাবুর প্রয়োজন মত টাকা তুলল সে। একটা টাকাও বেশি তুলল না। টাকাগুলো সুবোধবাবুর কাপড়ের কোনায় বেঁধে দিয়ে অমিয়াংশুই বলল, "বড্ড কষ্ট দিলুম আপনাকে। টানা হেঁচড়া ক'রে নিয়ে আসতে হ'ল। ট্যাক্সি নিলেও পারতুম। ফেরার পথে একটা 'বেবি' নিয়ে নিই। কি বলেন? ধার শোধ দেওয়ার এখুনি কিছু তাড়া নেই, সুবোধবাবু। চা খাবেন? ওই তো 'গ্রেট ইস্টার্নে'র এক তলাতে বসা যায়। আবার ট্যাক্সি ক'রে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব। সরকারী কাজ তো আজ গোল্লায় গেল। তেষ্টা পায় নি আপনার?" অমিয়াংশু ঘাড়ের মাংস দুলিয়ে নিলে একবার।

হতভম্বের মত ফুটপাতের একধারে দাঁড়িয়ে রইলেন সুবোধ-বাবু। বোধ হয় শেষ পর্যন্ত অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। সারাটা জীবন অভাবের বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে প'ড়ে অভিজ্ঞতা তাঁর

কম হয় নি। কষ্টের নানা অবস্থার সঙ্গে পরিচয়ও আছে তাঁর। কিন্তু এ কি অভিজ্ঞতা! এত বড় একটা বিরাট শহরের মধ্যে বাস ক'রেও কোনদিন কারো কাছ থেকে এক বিন্দু সহানুভূতি পান নি তিনি। টাকাপয়সার মধ্যেই যে তিনি সহানুভূতির বিন্দু খুঁজে বেড়িয়েছিলেন তা নয়। শুধু মুখের কথার সহানুভূতিও তিনি পান নি। ভেবেছিলেন, এত বড় কৃপণ শহর বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। কিন্তু এ কি হ'ল? অমিয়াংশু সেন তাঁর সারাজীবনের অভাব বোধ হয় মিটিয়ে দিল আজ।

ধীরে ধীরে সুবোধবাবু বললেন, "আজ থাক, অমিয়।"

"বেশ, বেশ—" একটু যেন নেচে উঠল অমিয়াংশু, "অন্য একদিন হবে। যাব চ'লে আপনার ওখানে—চা খেয়ে আসব।"

"নিশ্চয়ই। এ যে আমার কত বড় সৌভাগ্য! কবে আসবে?"

"আজ তো আর হবে না। জরুরী কাজ আছে। অন্য যে-কোন দিন যাওয়া যাবে। বলেন তো কালও যেতে পারি।"

"কাল তুমি এসো, অমিয়।"

"যাব। কথা দিচ্ছি, নিশ্চয়ই যাব। ঠিকানাটা যেন কি?"

"কর্নেল বিশ্বাস রোড। তারক দত্ত রোডের মুখে নেমে পড়তে হবে। মানে, পার্ক সার্কাস চেনো তো?"

"এখনো কলকাতার রাস্তাঘাট সব চিনে উঠতে পারি নি। নম্বরটা আবার বলুন তো—" অমিয়াংশু পকেট থেকে নোট বই বা'র ক'রে ঠিকানা লিখছিল, "পার্ক সার্কাস আমি চিনি। কোন্ দিকটায় পড়বে? একটু আইডিয়া না পেলে মেলাই ঘুরতে হবে।"

"এসপ্লানেড থেকে বালিগঞ্জের ট্রাম ধরতে হবে—" সুবোধবাবু কথাটা শেষ করতে পারলেন না। খোলা নোট বইটা হাতে নিয়ে অমিয়াংশু হাসতে হাসতে বলল, "আমি একটা বেবি ট্যাক্সি ধ'রে

নেব।” এই ব’লে অমিয়াংশু সত্যি সত্যি তক্ষুনি একটা বেবি ট্যাক্সি ধরল, “আজ তা হ’লে চলি। দু’ একটা জরুরী কাজ শেষ করতে হবে। হয়তো সন্ধে ছ’টার মধ্যে কাজ সব শেষও হ’য়ে যাবে। তারপর রাত আটটা পর্যন্ত ফ্রী। ডিনারের আগে ফিরে এলেই হ’ল। সন্ধে ছ’টার পরে আজ আপনি কোথায় থাকবেন, সুবোধবাবু? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। গ্রেট ইস্টার্নে একবার ঢুঁ মেরে যাই। চা খাওয়ার নেশা আমার। আজ হয়তো ছ’টা নাগাদই আপনার ওখানে একবার গিয়ে উঁকি দিয়ে আসতে পারি—”

“আমার ফিরতে আজ একটু রাতই হবে। ললিতা কোচিং ক্লাশে যায়। তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে কি না—”

“কি ক্লাশে যায় বললেন?” ট্যাক্সিতে ব’সে প্রশ্ন করল অমিয়াংশু। সুবোধবাবু বললেন, “কোচিং ক্লাশ। ভাল ক’রে পাস করবার চেষ্টা করছে ললিতা। পয়সা থাকলে ভাল ঘরে এতদিনে ওর বিয়েও হ’য়ে যেত। কাল তুমি এসো কিন্তু, অমিয়।”

“আসব—হঠাৎ যদি কোন জরুরী কাজে আটকে না পড়ি। ড্রাইভার, চলো। তা হ’লে নমস্কার, সুবোধবাবু।”

ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেল। সেই দিকেই খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন সুবোধ মিত্র। তারপর হাঁটতে হাঁটতে চ’লে এলেন অফিসে। দোতলায় উঠে আসতে আর তাঁর কষ্ট হ’ল না আজ।

বিকেলের দিকে একশো পাঁচ ডিগ্রীর তাপ অনেক ক’মে এল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবার দরকার ছিল না সুবোধবাবুর। ললিতাকে নিয়ে আসতে হবে কোচিং ক্লাশ থেকে। রাত আটটার আগে ক্লাশ ওর শেষ হবে না। আরাম ক’রে সিগারেট খাওয়ার জন্যে অমিয়াংশুর দেওয়া বিলিতী ব্র্যাণ্ড বা’র করলেন তিনি। দু’চারটে

টান মারবার পরে মাথাটা একটু পরিষ্কার হ'য়ে এল। সওয়া একটার পর থেকে ছ'টো পর্যন্ত কি একটা ব্যাপার যেন ঘ'টে গেল আজ? সাধারণ ঘটনা নয়। যখন তখন এমন ঘটনা ঘটেও না। ছু' দশ বছর কেন, বোধ হয় শতাব্দীর সাধনায় এমন সিদ্ধি হাত দিয়ে ছোঁয়া সম্ভব হয়। পকেট থেকে টাকাগুলো বা'র করলেন সুবোধবাবু। বার ছুই গুনলেন তিনি। ললিতার সামনে এবার তিনি মুখ তুলতে পারবেন। অপমানের হাত থেকে রক্ষা পেলেন তিনি। পিতা হওয়ার দায়িত্ব যে কী ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ তেমন ধারণা তাঁর ছিল না। থাকলে, অবশ্যই তিনি বিয়ে করতেন না। করলেও, ললিতা যেন না জন্মায় তার জন্যে সতর্কতা অবলম্বন করতেন সুবোধবাবু। ললিতার জন্মের জন্যে যেমন তিনি দায়ী, না জন্মাবার জন্যেও দায়ী থাকতেন তিনিই। কিন্তু সওয়া একটার পরে যা ঘটল তার জন্যে দায়ী শুধু অমিয়াংশু। ইতিহাসের 'হিরো' হওয়ার উপযুক্ত লোক সে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 'ডানকার্কে' দাঁড়িয়ে তিনি যেন হতাশ হ'য়ে অনামিকার নখ খুঁটছিলেন। সামনে পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে পালাবার পথ পাচ্ছিলেন না। এমন সময় কোথা থেকে অমিয়াংশু সেন এসে উপস্থিত হ'ল তাঁর পরাজয়ের ডানকার্কে। প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের মত অমিয়াংশুও পুরো যুদ্ধটা জিতিয়ে দিল আজ। কিন্তু সেই খোলা নোট বইটাতে তিনি কি দেখলেন? ঠিক দেখেছেন তো? অমিয়াংশু যখন ঠিকানা লিখছিল, তখন তিনি দেখেছিলেন, ঠিকানার ঠিক ওপরে সে ললিতার নামটাও লিখে রাখল।

বিলেতী ব্র্যাণ্ড ফুঁকে মাথাটা তাঁর পুরোপুরি পরিষ্কার হ'ল না। আধ-পোড়া কাঁচি বা'র করলেন তিনি। সওয়া একটার পরে এটা তাঁর টানবার কথা ছিল। এখন সাড়ে ছ'টার সময় সেইটেই ধরিয়ে নিলেন সুবোধবাবু।

হ্যাঁ, ললিতার নামটাই সে আগে লিখল। কেন লিখল? কর্নেল বিশ্বাস রোডের বাড়ির ভাড়া তো ললিতা দেয় না। ওখানে গিয়ে সে কি ললিতার খোঁজ করবে না কি? করলে, অমিয়াংশুর অবিশ্যি সুবিধে হবে। বেশি ঘোরাঘুরি করতে হবে না। তারক দত্ত রোডের মোড় থেকে আহিরিপুকুরের সুরু পর্যন্ত ছেলেবুড়ো সবাই ললিতাকে চেনে। ললিতার সুনাম চতুর্দিকে। দেখতে তত ভাল না। কিন্তু গম্ভীর। ললিতার গাম্ভীর্য সবার মনেই রেখাপাত করে। তাতে অনেকেই নিরাশ হয়। কাছে আসতে বাধো বাধো ঠেকে। কাছে আসবার সুযোগ পেয়েছিল শুধু রাহুল গুপ্ত। ললিতার সহপাঠী। ললিতার ক্লাশ ছিল সকালে, রাহুল গুপ্তের ছুপুরে। দু' শিফ্‌টের মধ্যে প্রথমটা শেষ হওয়ার একটু আগেই আসত রাহুল। দেখা হ'তো দু'জনের। চায়ের দোকানে ব'সে গল্প করত। গল্প শেষ হওয়ার আগে দ্বিতীয় শিফ্‌টের দু'একটা ক্লাশও কোন কোন দিন শেষ হ'য়ে যেত।

সুবোধবাবুর মাথাটা ইতিমধ্যে প্রায় পরিষ্কার হ'য়ে এসেছে। টাকাটা না নিলেই বোধ হয় ভাল ছিল। অমিয়াংশুর টাকা যদিও তিনি ধার ব'লে নিয়েছেন তবুও মনটা তাঁর খচখচ করছে। এতদিন তিনি জানতেন, ধারের টাকা সবই সমান। সবই এক জাতের। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ধারের মধ্যেও জাতিভেদের তারতম্য আছে। আছে উঁচুনিচুর স্তর। অমিয়াংশু তবে কোন্ স্তরের?

ট্রামে চেপে বসলেন সুবোধবাবু। হিন্দুস্থান পার্কের কাছাকাছি এসে নামতে হবে। ওইখানেই ললিতার কোচিং ক্লাশ হয়। চারতলা একটা ম্যানসনের ছাদে। চিলেকোঠার দু'দিকে ক্লাশ করবার জন্যে জায়গা ক'রে দিয়েছেন বাড়িওয়ালা। খরচ করতে হয় নি বেশি। বাড়তি ট্যাক্স দেওয়ারও প্রয়োজন হয় নি।

সারাটা দিন তিনি অধ্যাপনার কাজ করেন। সকালবেলা এক কলেজে গিয়ে মেয়েদের পড়িয়ে আসেন। দুপুরবেলা অন্য কলেজে যান ছেলেদের শিক্ষা দিতে। চারু মার্কেটের কাছেই তিনি ফ্ল্যাট নিয়েছেন। বিকেলের দিকে টপ্‌ ক'রে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসেন। তারপর ছ'টায় সিঁড়ি ভেঙে উঠে পড়েন চারতলার ছাদে। সুবোধবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন বুঝছেন ?"

"কি সম্বন্ধে ?" ক্লাশ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সম্বন্ধ সব ঘুচে গেছে।

সুবোধবাবু তবু বললেন, "ললিতার কথা জিজ্ঞেস করছিলুম।"

"কোন্ ললিতা ?"

"আমার মেয়ে। এই তো—"

ললিতার চেহারাটা দেখতে পেয়ে অধ্যাপক রায় ব'লে উঠলেন, "ও, আমাদের ললিতার কথা বলছেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কলেজের ভিড়ে ভাল পড়া হয় না ব'লেই তো আপনার সামনে ব'সে পড়া শেখে। সেই জন্যেই মাসে মাসে দশ টাকা ক'রে খরচ করা। পরীক্ষা তো এসে গেল—"

পনরো মিনিটের ইনটারভেল প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। চারতলার ছাদে বাথরুম নেই। তাঁকে নেমে যেতে হবে একতলায়। সময়ের টানাটানি খুব বেশি ব'লেই অধ্যাপক রায় বললেন, "চলুন, যেতে যেতে কথা হবে। হ্যাঁ, ললিতার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন তো ? মাসে দশ টাকা লাগে কেন জানেন ?"

"আজ্ঞে, আপনারা নেন তাই।"

"সপ্তাহে তিন দিন আসে সেই জন্যে ওকে দশ টাকা দিতে হয়। পাঁচ দিন এলে চোদ্দ টাকায় হ'তো। আমরা তো ছাত্রছাত্রীদের সব সময়েই চোদ্দ টাকার সুবিধে নিতে বলি।"

একতলায় নামবার সিঁড়ির মুখে সুবোধবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাল ক'রে পাস করবে তো ললিতা ?"

"গ্যারান্টি দেওয়া যায় না। কেউ দিতে পারবে না। মেয়েকে চোদ্দ টাকার সুবিধে নিতে বলুন। ক'টা বাজল বলুন তো ?"

"ঘড়ি নেই। আটটা বেজে গেছে।"

"আমি চলি। সওয়া আটটার মধ্যে আমার আবার ছাদে গিয়ে পৌঁছতে হবে। নমস্কার।" অধ্যাপক রায় ডান দিকে ঘুরলেন। অন্ধকার মত একটা বাই-লেনের মধ্যে ঢুকে পড়লেন তিনি।

হিন্দুস্থান পার্ক থেকে গড়িয়াহাটের মোড় পর্যন্ত হেঁটে এলেন সুবোধবাবু। নিঃশব্দেই এলেন। তিনি ভেবেছিলেন, আগামী-কালের 'ফী' জমা দেওয়া সম্বন্ধে ললিতাই আলোচনা তুলবে। নিজে থেকে তিনি কিছু বলতে চান না। এখন পর্যন্ত মনে মনে ঠিক করতে পারেন নি, অমিয়াংশুর কাছ থেকে ধার-পাওয়া টাকাটা সত্যিই নেওয়া যায় কিনা। খানিকটা এই সম্বন্ধে আলোচনা হ'লে সুবোধবাবু হয়তো বা যে-কোন রকমের একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতেন। কিন্তু গড়িয়াহাটের মোড়ে এসে ললিতা শুধু বলল, "ট্রামে ওঠবার দরকার নেই, বাবা। তুমি যখন সঙ্গে আছ তখন বেড়াতে বেড়াতে চ'লে যাই। তোমার কষ্ট হবে না তো ?"

"কষ্ট ?" বিলেতী সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সুবোধবাবু বললেন, "রোদ্দুরের তাপ নেই, কষ্ট কি ? আর ক'টাই বা স্টপেজ ? এখান থেকে বণ্ডেল রোডের মোড়, তারপর বিড়লা পার্ক, তারপর তারক দত্ত রোড। সেখান থেকে কর্নেল বিশ্বাস রোড তো দু' কদমের পথ। তুই পারবি তো ?"

"পারব।"

"গোটা চার স্টপেজের হিসেব কিন্তু করি নি ?"

"তা হোক। কথা বলতে বলতে এর মধ্যে হু'টো তো পার হ'য়ে এলুম। বাবা, গুন্‌গুন্‌ ক'রে সেই গানটা গাইব ?".

"কোন্‌টা রে ?"

"রবীন্দ্রনাথের 'ছুঃখের তিমিরে—' তোমার প্রিয় গান, বাবা।"

"পরীক্ষার মুখে গান গাইতে তোর সাহস হয় ? লেখাপড়া সব যদি গুলিয়ে যায় ?"

"নাঃ।" জবাবের মধ্যে দীর্ঘশ্বাসের গভীরতা, "না বাবা, পরীক্ষার দিন পর্যন্ত সব ঠিক থাকবে। তারপর গুলিয়ে যায় ক্ষতি নেই। যা পড়ছি তার হু'টো লাইনও মনে ক'রে রাখবার মত নয়। আরও কাছে স'রে এসো, গুন্‌গুন্‌ ক'রে গাইব। রবীন্দ্রনাথ নিজেও গুন্‌গুন্‌ ক'রে গাইতে ভালবাসতেন।"

গান ধরল ললিতা। বাঁ দিকের ফুটপাতে লোকজন কেউ নেই। এসব অঞ্চলে বয়-বাবুর্চি ছাড়া অন্য কেউ পায়ে হেঁটে চলেও না। বিড়লা পার্কের কোনা পর্যন্ত পৌঁছতে পুরো গানটা ললিতার গাওয়া হ'য়ে গেল। এবার ওর 'ফী' জমা দেওয়ার আলোচনাটা চালু না হ'লে রবীন্দ্রনাথের ওপরেও রাগ হবে সুবোধবাবুর। বিলেতী সিগারেটের শেষটুকু বিড়লা পার্কের উঁচু দেওয়ালের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি বললেন, "এই যাঃ, গেল না। কী উঁচু পাঁচিল রে বাবা।"

"সিগারেটের আগুন গেলেও কোন ক্ষতি হ'তো না।"

"তোর কথা মিথ্যে নয়। এ আগুন ফুচফুচ ক'রে জ্ব'লে জ্ব'লে নিজে থেকে নিবে যায়। জ্বালাতে পারে না কিছু। এমন কি একটা খড়কে পর্যন্ত না।"

"এসব কথা থাক বাবা। তোমার বয়সে আগুন নিয়ে খেলা করতে যাওয়া উচিত নয়। ফরাসীদেশের সেই গল্পটা তোমায় একদিন বলেছিলুম না ?"

"কোন্‌টা যেন ?"

"ওই যে সেই দুর্গটা ওরা জয় করল—ফরাসীদেশের বাস্তিল কিন্তু এটার চেয়েও অনেক বেশি উঁচু ছিল। আবার একটা সিগারেট ধরালে কেন, বাবা ? পথ তো প্রায় শেষ হ'য়ে এল।"

"বিলেতী সিগারেটের মধ্যে এইটেই শেষ। টানতে ভাল লাগছে। নিজের কেনা নয়।" সুবোধবাবু মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করছিলেন, "আমাদের একজন নতুন ছোকরা অফিসার এসেছে। সব সময়ে গ্যাবার্ডিনের স্যুট প'রে থাকে, আর—" আসল কথাটা বলবার জন্যে এবার দম নিতে হ'ল।

"আর কি বাবা ?"

"লোকটাকে আমার খুব পছন্দ। বেশি ইংরেজী বলে না। তোর মত বি-এ পাস করবার সুযোগ পেলে আমিও আজ অফিসার হ'তে পারতুম। অমিয়াংশু এম-এ পাস করেছে। দিল্লীর দরবারে ওর প্রতিপত্তি খুব। আমার তো কিছুই হ'ল না। জীবনের বেশির ভাগ সময় লোকের কাছ থেকে মনিঅর্ডার নিলুম, আর রসিদ কাটলুম। তোদের মত বি-এ পাস করতে পারলে—"

বাধা দিয়ে ললিতা বলল, "আমি এখনো বি-এ পাস করি নি।"

"ফী-টা জমা দিলেই তো পাস করবি। হ্যাঁ রে—"

"ভাল কথা মনে পড়েছে বাবা। ফী আমি আজ জমা দিয়েছি। আমি জানতুম, রাত্রে তোমার ঘুম আসছিল না। কী ভীষণ গরিব আমরা, না বাবা ?"

বিলেতী সিগারেটের সবটুকু খেলেন না সুবোধবাবু। কর্নেল বিশ্বাস রোডে ঢোকবার মুখে বাকীটা ফেলে দিলেন। এমনভাবে ফেললেন যে, ওপাশের ডাস্টবিনের মধ্যে গিয়ে উড়ে পড়ল সেটা। নিঃশব্দে বাড়ি পর্যন্ত এলেন। সাহস ক'রে জিজ্ঞেস করতে

পারলেন না, কোথা থেকে ললিতা ফী-র টাকা যোগাড় ক'রে নিয়ে এল।

সারাটা রাত ছটফট করলেন সুবোধবাবু। স্নেহলতাকেই বা প্রশ্ন ক'রে লাভ কি? তাঁর কাছেও অপমানের ভয় আছে। বাপ হওয়ার আগে ফী-র টাকাটা পোস্ট অফিসে জমিয়ে রাখতে পারেন নি কেন? সারা জীবন পোস্ট অফিস থেকে টাকাই আনলেন, সেখানে কিছু ফেলে রাখতে পারলেন না। এই জন্মে স্নেহলতার ক্ষোভের অন্ত নেই। যে-মেয়ের মাথায় এত বিদ্যা, তার জন্যে কিছুই তো তিনি করতে পারলেন না। স্নেহলতার পক্ষ নিয়ে সুবোধবাবু তাঁর নিজের সঙ্গে তর্ক করলেন রাত দু'টো পর্যন্ত। উলটো দিকের আকাশচুম্বী ম্যানসনটার দেওয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দু'টো বাজল। অতবড় ম্যানসনটায় দেওয়াল-ঘড়ি একটা নয়, গোটা পাঁচেক। সবগুলো ঘড়িতে এক সঙ্গে দু'টো বাজল না। দু'এক মিনিট পর পর বিভিন্ন তলা থেকে একই সময় ঘোষিত হয় ব'লে সুবোধবাবু সেইদিকে কান দেন না। কান দিলেও ঘড়িগুলোর ওপর নির্ভর ক'রে কাজে বেরোন না তিনি। কর্নেল বিশ্বাস রোডের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ঘড়ি হচ্ছে ডাক্তার বিকাশ ঘোষের। ম্যানসনটা ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গেলেই ডাক্তারের চেম্বার। ওষুধপত্র বিক্রির দোকান ওটা নয়। শুধু রোগীদের পরীক্ষা ক'রে ওষুধের ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন তিনি। বছর দুই থেকে ভদ্রলোক চেম্বার খুলেছেন। কিন্তু রোগী বড় কেউ একটা আসে না। কি ক'রে যে তিনি প্রতি মাসে ঘর ভাড়া দিচ্ছেন সেও এক গবেষণা এবং তর্কের বিষয় হ'য়ে উঠেছে। গবেষণা এবং তর্ক করে পাড়ার ছেলেরা। কর্নেল বিশ্বাস রোড আর তারক দত্ত রোডের যতগুলো রোয়াকে আড্ডা বসে সব

জায়গাতেই ডাক্তার বিকাশ ঘোষকে নিয়ে আলোচনা চলে। তারপর অবিশ্যি অন্য আলোচনায় ডুবে যায় সবগুলো রোয়াক। রক্ষে পান ডাক্তার বিকাশ ঘোষ। তাঁর জন্যে সুবোধবাবুর দুঃখ বড় কম নয়। এম-বি পাস ক'রে ভদ্রলোকের এ কি হাল হ'ল? ঘরের সামনে কালো বোর্ডের ওপরে শাদা রং দিয়ে নাম লিখিয়েছিলেন তিনি। নামের তলায় লেখা ছিল, 'রোগী দেখিবার সময় সকাল আটটা হইতে বারোটা। বিকাল চারটে হইতে নয়টা।' মাত্র দু' বছরের মধ্যে শাদা রং গ'লে গিয়েছে। 'রোগী দেখিবার সময়' সাইনবোর্ড প'ড়ে আর জানা যায় না। ডাক্তার ঘোষ তবু সময় মত চেম্বারে আসেন। সেই জন্যেই সুবোধবাবু তাঁর ঘড়ির ওপর নির্ভর করেন এত বেশি। খেতে বসবার আগে প্রত্যেক দিন তিনি চন্দনকে সময় দেখতে পাঠান। আজ পর্যন্ত পোস্ট অফিসে পৌঁছতে তাঁর একদিনও লেট হয় নি। চন্দনের সঙ্গে ডাক্তার বিকাশ ঘোষের পরিচয় হয়েছে সেই সূত্রে। কিন্তু সুবোধবাবুর সঙ্গে তাঁর আলাপ নেই। কোনদিন যদি অসুখবিসুখ হয়, তাহ'লে ডাক্তার ঘোষকে ছাড়া অন্য কাউকে যে তিনি ডাকবেন না তেমন প্রতিজ্ঞা সুবোধবাবু বছর দুই আগেই ক'রে রেখেছেন। কিন্তু গত দু' বছরের মধ্যে ডাক্তার ডাকবার সুযোগ এল কই?

স্নেহলতা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। রাত দুটো পর্যন্ত জেগে থাকবার দরকার ছিল না তাঁর। সব সংসারেই অভাব অভিযোগ আছে। তাই ব'লে স্নেহলতা রাত জাগতে যাবেন কেন? কিন্তু অভাব অভিযোগের জন্যে ললিতার বাবা আজ জেগে ছিলেন না। অমিয়াংশুর টাকাটা এখন পর্যন্ত তিনি গা থেকে আলগা করেন নি। ট্যাঁকে বেঁধে রেখেছেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুবোধবাবু। দোতলার ঘর। সবসুদ্ধ

ঘর দু'খানাই। পাশাপাশি নয়, সামনে পেছনে। পাশাপাশি হ'লেও সুবিধে হ'তো না কিছু। হাওয়া এর কোন ঘরেই ঢোকে না। ঢোকবার পথ নেই। বাড়িটার তিন দিকই বন্ধ। প্রথম যখন তিনি এখানে আসেন, তখন হাওয়া আসবার পথ ছিল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমীর আলী এ্যাভিন্যুর ট্রাম রাস্তাটা দেখা যেত। গত ক' বছরের মধ্যে সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে বিরাট বিরাট অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাঝখানে র'য়ে গেলেন সুবোধবাবু। উঠিয়ে দেওয়ার জন্যে বাড়িওয়ালা কম চেষ্টা করেন নি। বৌবাজারের গোকুলবাবু এর মালিক। গোকুল সরকার, সোনা-কুঠির অধীশ্বর। পুরনো বাড়িটা ভেঙে ফেলে নতুন বাড়ি তৈরি করবেন ব'লে প্ল্যান করেছিলেন। তুলে দেওয়ার জন্যে মকদ্দমাও রুজু করেছিলেন। হেরে গেছেন তিনি। এক তলায় যিনি থাকেন তিনি উকীল। নকুলেশ্বর ভৌমিক। খুবই গরিব উকীল। এ পর্যন্ত একটা মকদ্দমাও নকুলেশ্বর-বাবু জিততে পারেন নি ব'লে পাড়ার ছেলেরা রোয়াকে ব'সে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে। কি ক'রে জিতবেন? যে-সব মকদ্দমা স্বয়ং ভগবানও জিততে পারতেন না সেইগুলোই আসত তাঁর কাছে। রোয়াকে ব'সে দুনিয়া জয় করা যায়, মকদ্দমা জেতা যায় না। সুবোধবাবুর ভাগ্য ভাল। সোনা-কুঠির মালিকের সঙ্গে তাঁকে লড়তে হয় নি। তাঁর হ'য়ে লড়াই করেছেন নকুলেশ্বর ভৌমিক। এবং এইটেই তাঁর জীবনের প্রথম জয়।

সামনের দিকে সরু বারান্দা। খুবই সরু। রেলিং আছে। কাঠের রেলিং। কনুই রেখে রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে দাঁড়ানো যায় না। ঝুঁকে দাঁড়াতে গেলে রেলিং-এর কাঠ সব খুলে খুলে প'ড়ে যায়। সুবোধবাবু ভাবলেন, গোকুল সরকারকে দোষ দেওয়া চলে না। বছর দশ আগে বাড়িটা ভেঙে ফেললে দু'দশ হাজার

ইট হয়তো নতুন বাড়ির কাজে লাগত। কিন্তু এখন আর গোটা দশ ইটও বোধ হয় আস্ত নেই।

এ-বাড়ির প্রত্যেকটা ইটের মধ্যেও গলদ ঢুকেছে।

ঢোকা স্বাভাবিক। ছ'পুরুষ ধ'রে ভাড়া খাচ্ছেন সরকাররা। দ্বিতীয় পুরুষের গোকুলবাবু আবার এত বেশি খেলেন যে, বাড়িটার মেদ, মজ্জা এবং অস্থি পর্যন্ত চেটে চেটে শেষ করলেন তিনি। দশ বছর আগে একটা দেওয়ালেরও আস্তর ছিল না। সিমেণ্টের নামগন্ধ পর্যন্ত নেই। আর এখন তো ইটের বুকও ফাঁপা! খেয়ে খেয়ে খাক ক'রে দিয়েছেন গোকুলবাবু। গোড়ার দিকে কিছু খেয়ে কিছু খরচ করলে হয়তা বা আয়ু এর বাড়ত। মেরামতের মধ্যে সামর্থ্য খানিকটা থাকতই। কিন্তু একটা পয়সাও তিনি খরচ করলেন না।

খরচ করেন নি ব'লেই বোধ হয় সোনা-কুঠির দেহে আজ সোনার যৌবন ঝিকমিক করছে।

ট্যাকের টাকায় হাত বুলতে লাগলেন সুবোধবাবু। বিলেতী ব্যাঙ্কে টাকা রাখে অমিয়াংশু। রাখবার দায়িত্বও বড় কম নয়। টাকা তৈরি করার চেয়ে টাকা রাখা অনেক শক্ত। কিন্তু অমিয়াংশুর টাকা নিয়ে এখন তিনি কি করবেন? তাকে ফিরিয়ে দেওয়াই তো উচিত। কেন উচিত?

সুবোধবাবু এবার নৈতিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। হ'তে পারেন তিনি পোস্ট অফিসের সামান্য একজন কেরানী, কিন্তু তাই ব'লে কি সামান্য একজন কেরানীর নীতিজ্ঞান থাকতে নেই? পৃথিবীর গরিব লোকদের হাতেই তো আজো নীতির নিশান উড়ছে। নড়বড়ে রেলিং-এর কাঠ একটা হাত দিয়ে চেপে ধরলেন সুবোধবাবু। নীতির কাঠ ধ'রে রাখবার জন্য বি-এ পাস করতে হবে তেমন মন্ত্র কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে?

বরং নীতিহীন বি-এ ডিগ্রীর মূল্য কিছু নেই। ললিতা তবে টাকা পেল কোথায়? তাঁকে জানতে হবে কোথা থেকে টাকা এল। তিনি পিতা, পরীক্ষার ফী দেওয়ার অধিকার শুধু তাঁরই আছে। কিন্তু অধিকার থাকলে কি হবে, ললিতা আজ ফী জমা দিয়ে দিয়েছে। তা দিক। কার কাছ থেকে ললিতা টাকা এনেছে তিনি আর তা জানতে চান না। ললিতা গিয়ে তাকে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আসুক। তাতেই নীতি রক্ষা হবে। অমিয়াংশুর আসল চেহারা তিনি চেনেন না। উঁচু সমাজের লোক ওরা। চেনবার সুযোগ তিনি পান নি। তা হোক। অমিয়াংশুর কাছ থেকে টাকা তিনি ধার ব'লেই নিয়েছেন। ফিরিয়ে দিতে পারলেই সম্পর্ক সব ঘুচে যাবে। ধার নেওয়া অপরাধ নয়। সবার সংসারেই আপদবিপদ ঘটতে পারে। বিপদে পড়লে বড়লোকেরাও ধার নেয়। স্বাধীন ভারতবর্ষ কি ধার নিচ্ছে না? কখনো-সখনো খবরের কাগজ পড়েন সুবোধবাবু। কি-একটা বাংলা দৈনিক কাগজে তিনি পড়েছেন, বিশেষজ্ঞরা ধার পাওয়ার জন্যে পৃথিবীর চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছেন। পরিকল্পনার গহনা দিয়ে মাতৃভূমির গা তাঁরা ঢেকে দিয়েছেন বটে, কিন্তু প্রায় সব গহনাই তো কাগজের। সেই জন্যে ভারতবর্ষের একটা হাত সব সময়েই বিদেশের বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধার পাওয়ার জন্যে ঘোরাতে হচ্ছে। তবে আর সুবোধবাবু দোষ করলেন কি? তাঁকে তো হাতও বা'র করতে হয় নি। সেনসাহেব নিজেই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে তাঁকে ধার দিল।

মাঝরাত্রির আলোচনা পরের দিন সকাল বেলায়ই ভুলে গেলেন সুবোধবাবু। ললিতাকে কোন প্রশ্নই তিনি করতে পারলেন না। সাহস পেলেন না। নীতিহীন নোংরা টাকা যে ললিতা নিতে পারে না, তেমন বিশ্বাস আছে সুবোধবাবুর। ললিতাকে অবিশ্বাস করা

অসম্ভব। অফিসে বেরুবার আগে তিনি বললেন, "বুঝলে স্নেহ, *এমন মেয়ের বাপ হওয়া কিন্তু বরাতের জোর না থাকলে হওয়া যায় না। সারা দেশটাই তো দেখছি, কই ললিতার মত বিশ্বাস-যোগ্য*—"

বাধা দিয়ে স্নেহলতা জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাত ক'টা ফেলে রাখলে কেন?"

"খাচ্ছি, খাচ্ছি।" মসুর ডালের বাটিটা উপুড় ক'রে ঢেলে দিয়ে সুবোধবাবু বললেন, "চন্দনকে পাঠিয়ে কিছু খাবার আনিয়ে রেখো। ম্যাংগো সন্দেশ এক জোড়া—নাঃ, অমিয়াংশু একা খাবে কেন, আমরাও খাব। আমরা চারজন, ম্যাংগো সন্দেশ সবসুদ্ধ ছ'টা আনলেই হবে। ও, এই তো চন্দন এসে গেছে। এদিকে আয়, শোন্। ইস্কুল যখন বন্ধ, তখন এখুনি গিয়ে কিছু মিষ্টি কিনে আন্। ম্যাংগো সন্দেশ ছ'টা, রসকদম্ব ছ'টা, বরফিও ছ'টা, রাবড়ি আধসের —ম্যাংগো বরং আরও দু'টো বেশি আনিস। আমি এককালে ম্যাংগো সন্দেশ ছাড়া অন্য কিছু খেতাম না। এককালে মানে, প্রায় পাঁচ বছর আগে—"

"পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা তো সন্দেশ একটা চোখে দেখি নি।" অনুযোগ করলেন স্নেহলতা।

"আজ দেখবে। হ্যাঁ, শোন্—কিছু নোন্‌তাও আনিস। সিঙ্গাড়া, কচুরি—"

চন্দনের মুখের ভঙ্গি অনেকক্ষণ আগেই বদলে গিয়েছিল। পয়লা নম্বর খাবারের নামগুলো যে বাবা এমন সুন্দরভাবে আবৃত্তি করতে পারেন তার প্রমাণ সে আগে কোনদিনও পায় নি। একটু অবাক হ'য়েই চন্দন জিজ্ঞাসা করল, "ঠিক বলছো তো বাবা?"

"ঠিক।"

"বাবা—"

"বাবা, বাবা করিস নে। ধর্, এই নে দশটাকা। পয়সা ফিরিয়ে আনবার দরকার নেই। সেনসাহেবকে ভাল ক'রে খাওয়াতে হবে। বিকেলবেলা কি পরবি? প্যাণ্ট, না পাজামা?"

"ভাল প্যাণ্ট একটাও নেই। দু'টোর মধ্যে এটা ময়লা, অন্যটা ছেঁড়া।"

"ছেঁড়া? আগে বলিস নি কেন?—" আরও একটা দশটাকার নোট বা'র করলেন সুবোধবাবু, "নে, হাফপ্যাণ্ট কেন্ একটা। বাকী যা থাকবে তাই দিয়ে হাফশার্ট—জুতো কই?"

সুবোধবাবুর যেন নেশা ধ'রে গেল। স্নেহলতা ডালের কড়াইটা সরিয়ে রাখলেন দূরে। ভয়ে মুখ তাঁর পাংশু হ'য়ে গেছে। রান্না-ঘরের মেঝেতে যেন বিরাট একটা ফাটল দেখলেন তিনি। মনে হ'ল, গোটা পরিবারটাকে চন্দনের বাবা ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন সর্বনাশের ফাটলটার মধ্যে। একি হ'ল? এত টাকা তিনি কোথায় পেলেন? পোস্ট অফিসের কাজে তাঁকে টাকা পয়সা নাড়াচাড়া করতে হয়। এতকাল গরিব ছিলেন ব'লে স্নেহলতা ভয় পান নি। পরের টাকা গুন্তে ভুল করেন নি চন্দনের বাবা। হঠাৎ তিনি বড়লোক হলেন কি ক'রে? বড়লোকেরাই তো পরের টাকার ধর্ম মানে না। এ যাবৎকাল তিনি সুখের মুখ দেখতে পান নি, কিন্তু শান্তি পেয়েছেন। এবার বোধ হয় সুখ এবং শান্তি সবই নষ্ট হ'ল।

নেশার ধাক্কা সামলে নিতে পারলেন না সুবোধবাবু। অফিসের দেরি হ'য়ে যাচ্ছে তাও তাঁর মনে রইল না। তিনি ধমকে উঠলেন, "কি, হাঁ ক'রে কি দেখছিস?"

"নোট দেখছি বাবা।"

"ওতে দেখবার কি আছে, লক্ষ্মীছাড়া?"

"তিনটে সিংহ—"

ঠাস্ ক'রে চন্দনের গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে সুবোধবাবু বললেন, "সিংহ? কাগজের সিংহ কেউ দেখে না কি? যা—"

গালের উপর হাত বুলোতে বুলোতে চন্দন বেরিয়ে গেল। তার পর সুবোধবাবু নিজের গালে হাত রাখলেন একবার। দু' পা এগিয়েও গেলেন দরজার দিকে। হঠাৎ পেছন ফিরে ডাকলেন, "স্নেহ—ওকি, তুমি কাঁদছ?"

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে স্নেহলতা জবাব দিলেন, "এতদিন এখানে শুধু টাকার অভাবই দেখতে পেয়েছি। এখন দেখছি, ভদ্রতার অভাবও ঘটেছে। ছিঃ!"

সারাটা দিন অফিসে ব'সে উসখুস করলেন সুবোধ মিত্র। সরকারী কাজে মন বসল না তাঁর। বহুদিন তো মন দিয়ে কাজ করেছেন তিনি। দু' একদিনের অবহেলা এমন কি অপরাধের? আজ তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন। অমিয়াংশু হয়তো ছ'টার আগে গিয়ে উপস্থিত হবে। ট্রামে-বাসে গেলে হয়তো বা তার দশ-বিশ মিনিট দেরি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অমিয়াংশু যাবে বেবি ট্যাক্সি চেপে। খালি বাড়িতে চন্দনের মা বিপদে পড়বেন খুবই। বসবার ঘর ব'লে কিছু নেই। সরু বারান্দাটার এক-পাশে গোটা তিন মোড়া প'ড়ে আছে। গ্যাবার্ডিনের সুট প'রে অমিয়াংশু কি ক'রে যে মোড়ার ওপর বসবে সেকথা ভেবে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন সুবোধবাবু। পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে লাভ নেই। আজ তিনি সাড়ে চারটেতে উঠে পড়লেন। কামরা থেকে বেরিয়েও আসছিলেন, এমন সময় সেনসাহেব এসে উপস্থিত হ'ল।

"পি-এম-জির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম। জরুরী কাজ ছিল।" এইটুকু ব'লে থেমে গেল অমিয়াংশু।

"কাজ শেষ হ'ল?"

"বড় বড় রুই-কাৎলাদের সঙ্গে কাজ কি সহজে শেষ হ'তে চায়? আপনি কোথাও যাচ্ছিলেন নাকি?"

"হ্যাঁ, ভাবছিলাম আজ একটু আগে আগে বাড়ি ফিরব।"

"আমিও ফ্রী হ'য়ে গেলাম।" সিগারেট-কেসটা অমিয়াংশু এগিয়ে ধ'রে, বলল, "বাই দি ওয়ে—আচ্ছা সুবোধবাবু, আপনার ওখানে কি আমার আজই যাওয়ার কথা ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"আজ না গেলেই কি নয়?"

হাতে আকাশ ঠেকল সুবোধবাবুর। তখুনি তিনি জবাব দিলেন, "কেন, অন্য কোথাও তোমার কাজ আছে বুঝি? বেশ তো—"

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে অমিয়াংশু ব'লে ফেলল, "না, না—তেমন দরকারী কিছু নয়। চলুন, বেরিয়ে পড়ি। ক'টা বাজলো? মাত্র সাড়ে চারটে। ঠিক এই সময়েই আমার তেষ্টা পায়। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ক'টার সময় চা খান জানেন?"

একটু হেসে সুবোধবাবু বললেন, "আমি খবরের কাগজ প্রত্যেক দিন পড়ি নে।"

"সর্বনাশ! পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন কি ক'রে!" এই ব'লে অমিয়াংশু সুবোধবাবুকে নিয়ে চ'লে এল অফিসের বাইরে। রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সিও ধ'রে নিল তক্ষুনি।

অমিয়াংশুর সঙ্গে সঙ্গে সুবোধবাবুও ট্যাক্সিতে উঠে বসলেন। ঝড়ের মত অমিয়াংশু যেন তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এত স্পীডে চলতে আরম্ভ করলে সে হয়তো মিনিট দশেকের মধ্যে সুবোধবাবুকে পৃথিবীটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে। ঘুরতে তিনি চান না। পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাঁর কি লাভ? কর্নেল বিশ্বাস রোডের সংসারটুকু টিকিয়ে রাখতে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার

উপক্রম, আর অমিয়াংশু সেন প্রশ্ন করে, প্রধানমন্ত্রী ক'টার সময় চা খান ?

"আসুন, এইখানে একটু নামি। ট্যাক্সিটা অপেক্ষা করুক।" পার্ক স্ট্রীটে নেমে পড়ল অমিয়াংশু। নামিয়ে নিয়ে এল সুবোধ বাবুকেও। অমিয়াংশুর গতির সামনে কোনকিছুই টিকছে না। তার পেছনে পেছনে তিনিও ঢুকে পড়লেন বড় একটা রেস্তরাঁয়।

"দেখছেন, সাহেবসুবোরা ঠিক সময়মত চা খায় ?"

"দেখছি। ভারতবর্ষে এখনো সাহেবের সংখ্যা এত বেশি ?"

"এই দেশে সেইজন্যেই এখনো বাস করছি। নইলে গরম সুট চাপিয়ে কবে কেটে পড়তুম। আচ্ছা সুবোধবাবু—কি নেওয়া যায় বলুন।"

জবাবের জন্যে অপেক্ষা করল না অমিয়াংশু। সামনের দিকে চেয়ে সে অর্ডার দিল, "চিকেন প্যাটিস আছে ? বাঃ, বেশ। এক ডজন। হ্যাম স্যাণ্ডউইচ ? ভেরি গুড। এক ডজন। কেক তো দেখছি মেলাই রয়েছে। দু' পাউণ্ড দিলেই চলবে।"

সুবোধবাবু ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলেন না। ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। চারটে বাক্স এসে পৌঁছল। দু'টো দশ টাকার নোট টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অমিয়াংশু জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা সুবোধবাবু, কাল আপনি বলছিলেন, আপনার দু'টি ছেলে। বড়টির বয়স কত ?"

"ছেলে আমার একটি—"

"তাই নাকি !" অমিয়াংশু যেন আকাশ থেকে পড়ল, "মেয়েও আছে তাহ'লে ?"

"হ্যাঁ, ললিতা।"

"তাই তো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাল আপনি বলছিলেন বটে। আসুন।"

ট্যাক্সিতে উঠে সুবোধবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "অমিয়, আমাদের এই দরিদ্র ডাকবিভাগে তুমি চাকরি নিলে কেন? আর নিলেই যদি, তাহ'লে একেবারে পোস্টমাস্টার জেনারেল হওয়া উচিত ছিল।"

"আপনার কি সুবিধে হ'তো তাতে?" প্রশ্নটা একটু কর্কশ শোনাল।

"তোমার সঙ্গে এক ট্যাক্সিতে ব'সে এই পথটুকু আসতে পারতুম। ড্রাইভার, রোকো—" সুবোধবাবুর স্বর কর্কশতর।

"কোথায় নামছেন আপনি?" ব্যস্তভাবে ট্যাক্সির দরজায় হাত রাখল অমিয়াংশু, "এখানে নামবেন না। এটা সাহেবপাড়া, পার্ক স্ট্রীট।"

"জানি—" ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়বার দ্বিতীয় চেষ্টা করলেন সুবোধ মিত্র। অমিয়াংশু তবু দরজার ওপর হাতটা ঠেকিয়ে রেখে বলল, "না, না, আপনি জানেন না। আপনার বাড়ি পার্কসার্কাসে, পার্ক স্ট্রীট আর পার্কসার্কাস এক নয়। এখানে সাহেবসুবোরা থাকে—"

ঠেলা দিয়ে হাতটা সরিয়ে দিয়ে সুবোধবাবু বললেন, "দশ বছর আগে পার্ক স্ট্রীটের পোস্ট অফিসে আমি ডাকটিকিট বেচতুম। তখন সত্যিই এখানে সাহেবসুবোরা থাকতেন।"

"আর এখন?"

ট্যাক্সি থেকে নেমে সুবোধবাবু বললেন, "এখনকার কথা বলতে পারি না আর। নমস্কার। সামনের মাসের মাইনে পেলে ধারের টাকাটা শোধ করব।" এই ব'লে সুবোধবাবু এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। ম্যাকেঞ্জি কোম্পানীর কাছে এসে পেছন ফিরে চেয়ে দেখলেন একবার। কেকের বাক্স হাতে নিয়ে অমিয়াংশু সেন তখনো দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সির পাশে।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

পরীক্ষা শুরু হয়েছে ললিতার।

প্রথম দিন সুবোধবাবু বলেছিলেন, "ট্যাক্সি ক'রে যা ললিতা। ভাড়া লাগে আমি দেব।"

"না, আমি ট্রামে চেপেই যাব। তুমি কোন ভয় ক'রো না, বাবা।"

"আমি নিজে তো বি-এ পরীক্ষা দিই নি, ভয় পাওয়া স্বাভাবিক।"

"এমন কিছু কঠিন পরীক্ষা নয়। তা ছাড়া, লেখাপড়ায় তো ফাঁকি দিই নি কোনদিন।"

পাশে দাঁড়িয়ে স্নেহলতা বলেছিলেন, "এ আর কি পরীক্ষা, আসল পরীক্ষা তো দিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে।"

"তার মানে ?" প্রশ্ন করলেন সুবোধবাবু।

কি যেন ভাবলেন স্নেহলতা। তারপর বললেন, "আর অপেক্ষা করবার দরকার নেই, পাত্র দেখ। এই বয়সেই বিয়ে হওয়া উচিত।"

সংসারের সবরকম 'উচিত' এযাবৎকাল সুবোধবাবু এড়িয়ে এসেছেন। দোষ তাঁকে দেওয়া যায় না। কোনটাই তিনি পেরে ওঠেন নি। স্নেহলতার কথা শুনে মুখ শুকিয়ে গেল সুবোধবাবুর। পরীক্ষার ফী ধার পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু বিয়ের টাকা ধার দেবে কে ? অনেকদিন হ'ল অমিয়াংশুর সঙ্গে দেখা হয় না। ঠিকানাটাও জানা নেই। সেদিন পার্ক স্ট্রীটে কেন যে তিনি হঠাৎ তার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বসলেন ভেবে কষ্ট পেয়েছেন সুবোধবাবু। মাঝে মাঝে আজও পান। কলকাতায় বাস ক'রে বিদ্যাসাগরীয় 'তেজ দেখাবার দরকার ছিল না। এটা বিদ্যাসাগরদের যুগ নয়। লোক বেড়েছে অনেক।

"কি, কিছু বললে না তো ?" জিজ্ঞাসা করলেন স্নেহলতা।

"বলবার কি আছে! পাত্রের খোঁজ করতে হবে। চন্দন কোথায় গেল ? সে যেন ললিতার সঙ্গে যায়। কোথায় পরীক্ষা দিতে বসবি ?"

"বেথুন কলেজে। ইস্কুল কামাই ক'রে চন্দনের গিয়ে কাজ নেই। দশ নম্বরে উঠে কলেজ স্ট্রীট থেকে ট্রাম ধ'রে নেব।"

"তা না হয় হ'ল। টিফিন নিয়ে যাবে কে ? ললিতার জন্যে কি তৈরি করলে স্নেহ ?"

"কিচ্ছু দরকার নেই বাবা। পেট ভ'রে ভাত খেয়ে যাচ্ছি—" নোট বইটা বন্ধ ক'রে রেখে ললিতাই বলল, "চা বিস্কুট ওখানেই কিনতে পাওয়া যায়। তুমি বরং আজ আমায় চার আনা পয়সা বেশি দিও।"

পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে হঠাৎ একদিন সুবোধবাবু বেরিয়ে পড়লেন পোস্ট অফিস থেকে। ঘড়িতে সময় দেখলেন তিনি। ললিতার টিফিনের সময় হ'ল। মিনিট পনরো বাকী। এক্ষুনি বাস ধরতে পারলে সময় মত বেথুন কলেজের দরজায় গিয়ে পৌঁছতে পারবেন। মেয়েটাকে একদিনও দেখতে যেতে পারেন নি। তিনি শুনেছেন, টিফিনের সময় বাপ-মায়েরা যান মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে। শুধু খাবার নিয়েই যে যান তা নয়। উৎসাহ দেওয়ার প্রয়োজনেও তাঁদের যেতে হয়। কিন্তু মেয়ের জন্যে সুবোধবাবু কি করলেন ? খাবার তো কিছু নিলেনই না, উৎসাহই বা দিলেন কই ? প্রশ্নটা মনে আসতেই তিনি টেবিলের কাগজপত্র সব গুছিয়ে ফেলতে লাগলেন। এক ঘণ্টার ছুটি নিয়ে নেমে এলেন নিচে। বড় পোস্ট অফিসের সামনেই বাস দাঁড়াবার স্টপেজ আছে। সুবোধবাবু সেখানে এসেই দাঁড়ালেন। সাড়ে দশটার আধ-পোড়া

সিগারেটটা তিনি ধরাতে যাচ্ছিলেন এমন সময় দোতলা বাস এসে গেল। লাফিয়ে উঠে পড়লেন তিনি। বাসটা যখন লাল-বাজারের মোড়ে এল তখন তাঁর মনে পড়ল, কিছু খাবার হাতে ক'রে নিয়ে যাওয়া তাঁর উচিত ছিল। কিন্তু এখন আর সময় নেই। টিকিটও কাটা হ'য়ে গেছে। শুধু মুখের মিষ্টি কথা দিয়ে ললিতাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে সুবোধবাবু চললেন বেথুন কলেজের দরজা পর্যন্ত।

পৌঁছলেন এসে। মেয়েরা সব বেরিয়ে পড়েছে। রাস্তার দু'ধারে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দু' দিকেই লম্বা লাইন। গাড়িতে ব'সে মেয়েরা জলখাবার খাচ্ছে। পাশে ব'সে মা কিংবা বাবা হাত পাখা দিয়ে মেয়ের মাথায় হাওয়া দিচ্ছেন। মাথার ঘিলু ঠাণ্ডা রাখতে হবে। ওবেলার পরীক্ষা ভাল ক'রে দেওয়া চাই। কিন্তু ললিতা কই? দু'টো গাড়ির মাঝখান দিয়ে তিনি ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। পাঞ্জাবির কোনাটা গাড়ির হেডলাইটের সঙ্গে আটকেও গিয়েছিল। ভ্রূক্ষেপ করলেন না সুবোধবাবু। সময়ের অভাব ব'লেই টান মেরে পাঞ্জাবিটা খুলতে গেলেন তিনি। পকেটের মুখটা ছিঁড়ে গেল। পকেটে তাঁর তেমন দরকারী জিনিস কিছু ছিল না। গোটা দুই শুধু এক টাকার নোট ছিল। কিন্তু সে তো ডান দিকের পকেটে রেখেছিলেন তিনি। ছিঁড়েছে বাঁ পকেট। সুবোধবাবু ফটক দিয়ে কলেজের ভেতরে এলেন। ললিতাকে তিনি কোথাও খুঁজে পেলেন না। বেরুবার মুখেও ক্ষতি হ'ল একটু। কলেজের সামনে এবং ভেতরে নির্ভয়ে হাঁটতে পারা যায় না। ডাব খেয়েছে মেয়েরা। খেয়ে, খালি ডাব ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে রাস্তার ওপরেই। হোঁচট খেলেন সুবোধবাবু। পা পিছ্‌লে একবার প'ড়েও যাচ্ছিলেন। মেয়েদের চেয়ে ডাবের সংখ্যা বেশি ব'লে মনে হ'ল তাঁর। ললিতা

কি করল? আজ তো তিনি ওকে মাত্র চার আনা পয়সাই দিয়েছিলেন। অফিসে তিনি শুনেছেন, একটা ডাবের দাম চার আনা। বারুইপুরের ডাব যদি হয়, তবে পাঁচ আনা। গত দশ বছরের মধ্যে তিনি নিজে কখনো ডাব কেনেন নি। শুধু করপোরেশনের জল খেয়েছেন। ডাবের জল মিষ্টি না নোন্‌তা সেকথাও ভুলে গেছেন সুবোধবাবু।

রাস্তা পার হ'য়ে পার্কের কাছে এসে উঠলেন তিনি। অসুবিধে হ'ল। হোঁচট খেয়েছিলেন। ডাবের ওপর পা পড়বার জন্যে প'ড়েই গিয়েছিলেন প্রায়। মেয়েরা হাসছিল খুব। হেদোর মধ্যে ঢুকে পড়লেন সুবোধবাবু। কাবুলী চটির চামড়া ছিঁড়ে গেছে। পা টেনে টেনে হাঁটতে হচ্ছে। কি করবেন? খবরের কাগজ পেলে মন্দ হ'তো না। চটি জোড়া কাগজ দিয়ে মুড়ে নিতে পারতেন। কিন্তু খবরের কাগজ তিনি কেনেন না, পড়েনও না। এখন তিনি বুঝতে পারলেন, খবরের কাগজও দরকারে আসে।

ও কে? ললিতাই তো। উত্তরদিকের কোনায় বেঞ্চির ওপর ব'সে একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলছিল সে। ছেলেটিকে তিনি আগে কখনো দেখেন নি। সেই দিকে হাঁটতে লাগলেন সুবোধ-বাবু। তাঁকে দেখলে ললিতা নিশ্চয়ই অবাক হবে। অবাক ক'রে দেবার জন্যেই বোধ হয় তিনি পা টিপে টিপে হাঁটতে লাগলেন। কাবুলী চটিজোড়া তাঁর পায়ে নেই, হাতে।

পেছন থেকে সুবোধবাবু দেখলেন, ছেলেটির প্রায় গা ঘেঁষেই বসেছে ললিতা। পা ঝুলিয়ে দিয়েছে ছু' জনেই। পায়ের তলায় ছু'টো ডাব প'ড়ে আছে। বেঞ্চির একদিকে যে একটা টিফিন-ক্যারিয়ার রয়েছে তাও চোখে পড়ল সুবোধবাবুর। এবার তিনি বুঝতে পারলেন, ললিতা পড়া শিখছে ছেলেটির কাছে। ছেলেটি? তবে বোধ হয় কলেজের অধ্যাপক কেউ হবে। সামনে গিয়ে

উপস্থিত হ'লে সবই তিনি বুঝতে পারবেন। অধ্যাপকটি যদি মিছে কথা বলতে চায়, ললিতা বলবে না। প্রাণ গেলেও ললিতাকে দিয়ে কেউ মিছে কথা বলাতে পারবে না। আরও একটু কাছে এগিয়ে গেলেন সুবোধবাবু। চটিজোড়া ফেলে রাখলেন ঘাসের ওপর। অধ্যাপকটি তাঁর চেয়েও গরিব নাকি? ঘাড়ের তলায় শার্টের ওপর তালি পড়েছে। দূর থেকে তালির দৈর্ঘ্য মাপবার জন্যে তিনি ডান হাতের পাঞ্জাটা টান ক'রে খুলে ধরলেন। পাঞ্জাটা তুলে রেখেছিলেন ঘাড় বরাবর। হ্যাঁ, ছ' ইঞ্চি তো হবেই। শার্টের কলারটার দিকেও দৃষ্টি পড়ল তাঁর। সেখানে তালি লাগাতে পারে নি অধ্যাপক। তালি লাগানো যায়ও না। একাধিক সুতোর মুখ সব ঝুলে রয়েছে। সেই জন্যেই বোধ হয় অধ্যাপকটি মাঝে মাঝে ঘাড় চুলকচ্ছে। সুতোর মুখগুলো সব সুড়সুড়ি দিচ্ছে ঘাড়ের চামড়ায়।

আর অপেক্ষা করা যায় না। সুবোধবাবু সামনে এসে দাঁড়ালেন। চমকে ওঠাই স্বাভাবিক হ'তো। কিন্তু ললিতার ভাব ভঙ্গিতে বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা নেই। সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কখন এলে, বাবা?"

"এই তো একটু আগে।" সুবোধবাবু ভেবেছিলেন, ময়লা কাপড় এবং পায়ে জুতো নেই ব'লে তিনি তাঁর আসল পরিচয় গোপন ক'রে রাখবেন। কিন্তু ললিতা তাঁকে গোপন করবার সুযোগ দিল না। ইচ্ছে করলে, সে নিজেই তো মামা কিংবা মেসোমশাই ব'লে তাঁকে সম্বোধন করতে পারত।

ললিতা এবার হাতের বইটা বন্ধ ক'রে বলল, "বাবা, এর নাম হচ্ছে রাহুল গুপ্ত। এক কলেজেই আমরা পড়ি। ওরও পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল—"

রাহুল গুপ্ত পায়ের ধুলো নিল সুবোধবাবুর।

"থাক, থাক—পরীক্ষা দিলে না কেন ?" জিজ্ঞাসা করলেন সুবোধবাবু। জবাব দিল ললিতা, "ভাল ছেলে কিনা। তৈরি হ'তে পারে নি। আসছে বছর দেখবে প্রথম হ'য়ে পাস করবে। বাবা—"

"চুপ ক'রে রইলি যে ?"

"তোমার জুতো নেই কেন ?"

"আছে তো,—" বেঞ্চির পেছন দিকে আঙুল তুলে বললেন, "ওখানে রেখে দিয়েছি।"

"কেন ?"

"কাবুলী চটির ওই এক মুশকিল। চামড়ার স্ট্র্যাপ কখন্ যে কুট ক'রে কেটে যায়—সেলাই করিয়ে নেব এখন। পরীক্ষা কেমন দিলি রে ?"

"খারাপ হয় নি।"

"কিছুই বোধ হয় খাওয়া হয় নি ?" টিফিন-ক্যারিয়ারটা সুবোধবাবু যেন দেখতেই পেলেন না।

ললিতা কোন কিছুই গোপন করল না। সে ব'লে ফেলল, "এত বেশি খেয়েছি যে, ঘুম আসছে। রাহুল প্রত্যেক দিনই আমার জন্যে খাবার নিয়ে আসে। ডাবও কিনলো রাহুল। দু'টো ডাব খেয়েছি, বাবা।"

সুবোধবাবু যেন বিব্রত বোধ করছেন, "কিন্তু···কিন্তু প্রত্যেক-দিন খাবার নিয়ে ছেলেটি আসে—"

"আপনি কিছু মনে করবেন না। আমার কোন অসুবিধেই নেই। বাবুর্চি রান্না করে। বেয়ারা টিফিন-ক্যারিয়ার সাজিয়ে গুছিয়ে দেয়। আমি আর কতটুকু করি ? ট্যাক্সি চেপে চ'লে আসি। আর বোধ হয় সময় নেই। প্রথম ঘণ্টা বাজলো।" এই ব'লে রাহুল গুপ্তই উঠে পড়ল আগে। সুবোধবাবু দেখলেন,

বেঞ্চির ওপরে খবরের কাগজ পেতে রাহুল গুপ্ত ব'সে ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আজকের কাগজ না কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তা হ'লে থাক।"

"দরকার থাকে, আপনি নিন। আমরা প্রায় সবগুলো দৈনিকই রাখি। বাংলাগুলো তো কেউ খোলেই না।" কাগজটা ভাঁজ ক'রে রাহুল গুপ্ত এগিয়ে ধরল সুবোধবাবুর দিকে। তিনি নিলেন। নিয়ে বললেন, "আমার এটা কাজে লাগবে।"

ললিতা এগিয়ে গিয়েছিল। প্রথম ঘণ্টা বেজে গেছে। আর দেরি করা চলে না। সে বলল, "বাবা, আমি চললুম। কিচ্ছু ভেবো না, পরীক্ষা আমি ভালই দেব।" পার্কের বাইরে চ'লে গেল ললিতা।

ললিতার পরীক্ষা যেদিন শেষ হবে সেদিন সময় দেখবার জন্যে সুবোধবাবু নিজেই এলেন ডাক্তার ঘোষের চেম্বারে। ডাকাডাকি করলেন, চন্দনকে পাওয়া গেল না। লেখাপড়া ফেলে ছেলেটা কি রোয়াকে বসতে আরম্ভ করল না কি? অফিসে যাওয়া আসা করবার সময় বক্সিদের বাড়ির পাশ দিয়ে তাঁকে যেতে হয়। বিনোদ বক্সি এম-এল-এ। এই বছরের নির্বাচনে তিনি শ' পাঁচেক ভোট বেশি পেয়েছিলেন। অত চওড়া ক'রে রোয়াকটা তৈরি না করলে বিনোদ বক্সি কিছুতেই আইন পরিষদে পা দিতে পারতেন না।

বিনোদবাবু মোটা সুতোর ধুতি আর ফতুয়া পরেন। তারক দত্ত রোড আর কর্নেল বিশ্বাস রোডের মোড়ে বাড়ি তৈরি করেছেন তিনি। দোতলা নতুন বাড়ি। ওপরে ভাড়াটে বসিয়েছেন। মাদ্রাজী। একতলার অর্ধেকটায় তিনি থাকেন, অত্যন্ত কষ্টেই

থাকেন। বাকী অর্ধেকটা ভাড়া দিয়েছেন পাঞ্জাবীর কাছে। বাঙালী ভাড়াটেরা টের পাওয়ার আগেই বিনোদবাবু বাইরে সাইনবোর্ড লটকে দিয়েছিলেন : বাড়ি খালি নাই।

কিন্তু বাঙালীরা ভোট না দিলে বিনোদ বক্সি এম-এল-এ হ'তে পারতেন না। সেই জন্যে তিনি বাড়ির সামনে বেশ চওড়া একটা রোয়াক তৈরি করিয়েছিলেন। দু' চার বস্তা সিমেণ্ট তাঁর বেশি লেগেছিল। কিন্তু শ পাঁচেক বেশি ভোট পাওয়ার জন্যে সিমেণ্টের লোকসান তাঁর পুষিয়ে গেছে। না গেলেও, দু' চার মাস আইন পরিষদে যাওয়া আসা করলেই পুষিয়ে যাবে। কিছুদিন আগেই তো ভোটের সীজ্‌ন শেষ হয়েছে।

পাড়ার ছেলেরা সব তাঁর রোয়াকেই বসে। একবার বসলে আর উঠতে চায় না। বিনোদ বক্সির রোয়াকে নেশা আছে। এত বেশি সিমেণ্ট ঢালিয়েছেন তিনি যে, রোয়াকের বুক শুধু মসৃণ হয় নি, ঠাণ্ডাও হয়েছে খুব। ছেলেদের বুকের জ্বালা জুড়য়। ভোটের সীজ্‌ন শুরু হওয়ার মাস দুই আগে থেকে ওদের চা খাওয়ার ব্যবস্থাও করলেন বিনোদ বক্সি। নিজের রান্না ঘরেই ব্যবস্থা হ'ল। চাকরের মাইনে বাড়িয়ে দিলেন তিন টাকা। আটচল্লিশ পয়সা দিয়ে একটা মাটির হাঁড়ি কিনিয়ে আনলেন। সারাদিন জল ফুটল তাতে। জ্ব'লে পুড়ে হাঁড়িটা খাক হ'য়ে গেল। কিন্তু ফাটল না। যখন ফাটল তখন তো ভোট গণনা শেষ। বিনোদ বক্সি জিতলেন। রোয়াকের ছেলেরা তাঁর হ'য়ে চেঁচিয়েছিল খুব।

সুবোধবাবু মোড় পর্যন্ত গেলেন। রোয়াকের জনতার মধ্যে চন্দনকে দেখতে পেলেন না তিনি। ছেলেটা গেল কোথায়? এইটেই তো দক্ষিণ কলকাতার সবচেয়ে চওড়া রোয়াক। চন্দন কি তবে অন্য কোন সরু রোয়াকে বসছে। ভাবিয়ে তুলেছে ছেলেটা। বুড়ো বয়সের একমাত্র সম্বল সে। ভালভাবে পাস না

করতে পারলে ভাল চাকরি পাবে না। অথচ বই নিয়ে ছেলেটা একেবারে বসতেই চায় না। কোথায় যায়? বিনোদ বক্সির রোয়াকের ক্ষতটা তিনি এইমাত্র দেখে এলেন। ভন্‌ভন্‌ ক'রে মাছি উড়ছে তাও তাঁর চোখে পড়ল। কিন্তু চন্দনকে দেখতে পেলেন না। হয়তো চন্দন-মাছি অন্য একটা ক্ষতের সন্ধান পেয়েছে। এই ভেবে সুবোধবাবু সময় দেখতে চললেন।

সুবোধ মিত্র এখনো চশমা পরেন না। দৃষ্টিশক্তি সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক বেশি। তিনি যা দেখেন তা গভীরভাবে দেখবার চেষ্টা করেন। রোয়াকের ক্ষতটা দেখতে গিয়ে তাঁর চোখে পড়ল অন্য একটা ক্ষত। চন্দন বাড়ি থাকবে কেন? কর্নেল বিশ্বাস রোডের বাড়িটাতে কি আছে? সেখানেও কি ক্ষতের সৃষ্টি হয় নি? কলকাতার যে-কোন রোয়াক কি ওই দুটো ঘরের চেয়ে ভাল নয়? শুধু গোকুল সরকারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তিনি বনেদী বাড়িওয়ালা। কিন্তু সমাজ?

হ্যাঁ, সমাজ। সুবোধবাবুর দৃষ্টি প্রসারিত হ'ল। ক্ষতের পরিধি বাড়ছে। মানুষগুলো বাধ্য হ'য়েই মাছি হচ্ছে। অমিয়াংশু কি? টাকা এবং শিক্ষার অভাব তার নেই। এম-এ পাস। যা রোজগার করে তা দিয়ে দু'জনার সংসার খুব ভালভাবেই চলে যেতে পারে। কিন্তু সুবোধবাবু জানেন, অমিয়াংশু বিয়ে করতে চায় না। উড়তে চায়। সমাজের নব্বুই ভাগ লোক ওর চেয়ে দুর্বলতর। বিলেতী ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে সে নষ্ট করতে চায় সবাইকে। বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারদের দুর্বলতা সে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। যত দেখছে তত তার শরীর গরম হচ্ছে। হওয়া স্বাভাবিক। মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পেলে এমনটা ঠিক হ'তে পারত না। বিকৃতির বীজ গোড়াতেই বিনষ্ট করা যেত। তাই বা হ'তে পারল কই? বাংলার সমাজে পর্দা নেই সত্যি, কিন্তু

সাহচর্যও নেই। যে-আঙুর ওপরের ডালে ঝুলছে, যাকে দেখা যাচ্ছে অথচ ছোঁয়া যাচ্ছে না, তাকে টক বলাই স্বাভাবিক। সামাজিক মিষ্টত্ব তার থাকতেই পারে না। অমিয়াংশুকে ডেকে আনলে কেমন হয়? আজও তার টাকা তিনি শোধ দিতে পারেন নি। দু'দিন আগে বাড়ির ঠিকানায় অমিয়াংশু একটা চিঠিও লিখেছে। পোস্টকার্ড। বিশেষ প্রয়োজনে সে একদিন সুবোধবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চায়। 'বিশেষ প্রয়োজন' কথা দুটোর তলায় লাইন টানা। সুবোধবাবু জানেন, সন্তোষজনক জবাব না পেলে অমিয়াংশু পরের চিঠিতে টাকার কথা লিখবে। এবং লিখবে তা পোস্টকার্ডেই। স্নেহলতা এবং ললিতার চোখে পড়বার জন্যে পোস্টকার্ডই লিখবে অমিয়াংশু। তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করা দরকার। এই ভেবে সুবোধবাবু এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার ঘোষের চেম্বারের সামনে। সময় দেখবার আগে, ডাক্তারকে দেখতে পেয়ে অবাক হ'য়ে গেলেন সুবোধবাবু।

জানালার মধ্যে দিয়ে ডান হাতটা রাস্তার দিকে বা'র ক'রে রেখেছেন ডাক্তার ঘোষ। মুঠো বন্ধ। মাঝে মাঝে তিনি বলছেন, "এ চলবে না, এ অন্যায়—"

সুবোধবাবু পেছন ফিরে দেখলেন, ম্যানশনটার সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তারের গাড়ি। রাস্তা থেকেই সুবোধ-বাবু বললেন, "আমি চন্দনের বাবা—"

"কে চন্দন? দেখুন, দেখুন কী সাংঘাতিক জোচ্চুরি চলেছে! কতদিন থেকে চলেছে জানেন? বলছি। ক্যালেণ্ডারে লিখে রেখেছি।" ডাক্তার ঘোষ ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে বললেন, "ঠিক এক মাস। সাধারণ সাইটিকা মশাই, বাত। দেখেছেন ডাক্তার চন্দের কাণ্ডটা? বড় ডাক্তার! গুজরাটি পেশেণ্ট পেয়ে এক মাস থেকে চিকিৎসা করছে। উঃ, বত্রিশ টাকা মশাই। যত বার আসবে

তত বারই বত্রিশ। যাক, আমি আর কি করব? চারটে ইনজেকশন দিয়ে দিলে গুজরাটিটা এতদিনে দোকানে গিয়ে বসতে পারত। ওই আসছে ডাক্তার চন্দ। বিরাট বিরাট দু'খানা বাড়ি তুলে ফেলেছে। একটাতে নিজে থাকে, অন্যটা ভাড়া দেয়।".

ডাক্তার চন্দের গাড়িটা জানালার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। সুবোধবাবু দেখলেন, বিকাশ ডাক্তারের চোখ দু'টো বড় হ'য়ে উঠল। ভেতরের আগুন দপ্‌দপ্‌ করছে। কষ্ট পেলেন সুবোধবাবু। দুঃখ বোধ করলেন ডাক্তার ঘোষের জন্যে। তিনি ঢুকে পড়লেন তাঁর চেম্বারে।

ঘরটা বড় নির্জন মনে হ'ল সুবোধবাবুর। কারো পায়ের ধুলো পড়ে না ব'লে হয়তো রাস্তার ধুলো সব উড়ে এসে জ'মে রয়েছে টেবিলের ওপর। ব্যবস্থাপত্র লেখবার জন্যে ছাপানো প্যাডখানা খোলা রয়েছে। প্যাডের পাশে ফাউন্টেন পেন। কলমের মুখটা খোলা। যেন এইমাত্র প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ ক'রে কলমটা তিনি রাখলেন। মুখটা বন্ধ করবার সময় পান নি। টেবিলের সবটা জায়গাই প্রায় জুড়ে রেখেছে ওষুধ কোম্পানীর প্রচার-পুস্তিকা। লাল, নীল, সবুজ এবং হলদে রং-এর পুস্তিকা সব। স্টেথেসকোপটা চোখে পড়ল না তাঁর।

সুবোধবাবু বললেন, "আপনার কাছেই এলুম।"

"কেন? কি চাই?" ডাক্তার ঘোষের অস্বাভাবিক ব্যবহার স্বাভাবিক হ'তে সময় লাগবে, ভাবলেন সুবোধবাবু। চন্দনের পিতা ব'লে পরিচয় দেওয়ার আর দরকার নেই। পিতা হওয়ার চেয়ে পেশেণ্ট হওয়াই বাঞ্ছনীয়, মনে করলেন তিনি। বললেন, "ক'দিন থেকে জ্বর হচ্ছে।"

"জ্বর?" খপ্ ক'রে হাতটা তাঁর টেনে নিলেন ডাক্তার ঘোষ। নাড়ি টিপলেন। তারপর বললেন, "এখন নেই।"

"পরে হ'তে পারে।"

"পরে দেখব—জ্বর এলে আসবেন।"

"তখন তো কল্ দিতে হবে। দেবও। বুকটা একটু দেখুন তো।" ভয়ে ভয়েই কথাটা বললেন তিনি। ডাক্তার ঘোষ এবার একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স খুললেন। খুলতে খুলতে বললেন, "স্টেথেসকোপ বাইরে রাখলে বড্ড ধুলো জমে।"

"বিজ্ঞাপনের জন্যেও মাঝে মাঝে বাইরে রাখতে হয়। মাঝারি ডাক্তাররা তো গলায় ঝুলিয়ে রাখেন।"

"আর বড়রা?"

একটু হেসে সুবোধবাবু বললেন, "চেনা বামুনদের পৈতের দরকার কি? বিজ্ঞাপন ছাড়া চেনা বামুন হওয়া যায় না, ডাক্তার ঘোষ।"

"বিজ্ঞাপন ছাড়াই আমি চিকিৎসক হ'তে চেয়েছিলুম। গেঞ্জিটাও খুলতে হবে।"

"খুলছি—" গেঞ্জিটা খুলতে খুলতে সুবোধবাবু বললেন, "একটা কারবারও খুলে ফেলুন। ওষুধ বিক্রির কারবার।"

"ওষুধ তৈরির কারবারে আরও বেশি লাভ।" বললেন ডাক্তার ঘোষ।

"পুঁজি লাগে অনেক। মাড়োয়ারী শ্বশুর থাকা চাই।"

"একটু ঘুরে বসুন, পিঠটা দেখব।" দেখে নিয়ে ডাক্তার ঘোষ বললেন, "কী আশ্চর্য, কোথাও এতটুকু আওয়াজ নেই! বুকের বিজ্ঞান ভুলে গেলাম না কি?"

গেঞ্জি পরতে পরতে সুবোধবাবু বললেন, "চিকিৎসার সঙ্গে বিজ্ঞানের কি সম্পর্ক? ওষুধ কোম্পানীর পুস্তিকাগুলো যে যত বেশি মুখস্থ ক'রে রাখতে পারবে সে তত বড় ডাক্তার। বিয়ে করেন নি, ডাক্তার ঘোষ?"

"না—প্রেসক্রিপশন একটা লিখে দিচ্ছি।"

হ্যাঁ কি না বলবার আগেই ডাক্তার ঘোষ কলমটা তুলে নিলেন। প্যাডের ওপরেও ধুলো পড়েছিল প্রচুর। পরিষ্কার করবার আগে, তিনি টের পেলেন কলমে কালি নেই। কলমে কালি ভরতে লাগলেন তিনি।

সুবোধবাবু বললেন, "স্বাধীনভাবে ডাক্তারীই যদি করবেন, তা হ'লে বিয়ে করেন নি কেন? আপনাদের তো কেনবার সময় অনেক টাকা লাগে। তা লাগুক। আমি আপনার কথাই ভাবছি। যৌতুকের টাকা দিয়ে একটা ডিসপেনসারি খুলতে পারতেন। বাকী যা থাকত তা দিয়ে পুরনো মডেলের একটা বেবি অস্টিন। বেবি অস্টিনে চেপে রোগী দেখতে যাওয়া মানেই, রোগীর অসুখ সেরে গেল। কলকাতার নিয়ম তাই-ই।"

"পৃথিবীর অন্য জায়গায় এমন নিয়ম নেই। একটা মিকশ্চার দিলুম—চিকিৎসা বিজ্ঞান আর অটোমোবাইল ইঞ্জিনীয়ারিং আলাদা আলাদা সাবজেক্ট। ইন্ ফ্যাক্ট, আপনার কোন অসুখ এখন নেই। বুক পিঠও পরিষ্কার। বত্রিশ টাকাওয়ালাদের পাল্লায় পড়লে বুক পিঠ পরিষ্কার হ'তে সময় লাগত। এক্স-রে করাতে বলত। তার আগে, ব্লাড এবং ইউরিন পরীক্ষার রিপোর্ট ওরা দেখত। আমার কাছে এলেন ব'লে বেঁচে গেলেন। একটু দাঁড়ান—" ডাক্তার বিকাশ ঘোষ ছুটে গেলেন জানালার কাছে। কি যেন দেখলেন তিনি। তারপর ফিরে এসে বললেন, "বিনোদ বক্সির বাড়ির সামনে একটা মস্ত বড় গাড়ি এসে থামল। গাড়িটা আমি চিনি।"

"কার গাড়ি ওটা?"

"চৌষট্টি ওয়ালার। বিনোদবাবুর অসুখ না কি? আগে তো তিনি চার টাকার ডাক্তার ডাকতেন। এম-এল-এ হওয়ার

পরে দেখছি—নাঃ, বড্ড মুশকিলে পড়লাম। আজ তিন দাগ খেয়ে নেবেন।”

হাত বাড়িয়ে প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে সুবোধবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনার মুশকিল হ’ল কি ক’রে? বিনোদবাবু যদি চৌষট্টি টাকা নষ্ট করতে চান, তা হ’লে আপনি তার কি করবেন?”

“টাকার টানাটানি থাকলেই বিকেলে তাঁর লোক আসবে।”

“কেন?”

“ভাড়া চাইতে। তিন মাস বাকী পড়েছে। এই ঘরখানার কত ভাড়া দিই জানেন? চল্লিশ—তাও বাথরুম নেই। রাস্তায় যেতে হয়।”

“এই বাড়িটা যে বিনোদ বক্সির জানতুম না।”

“এম-এল-এ হওয়ার পরে বাড়িটা খুব শস্তায় কিনেছেন। মুসলমান এক ভদ্রলোকের বাড়ি ছিল এটা। বিনোদবাবুই কি-সব ট্যাক্সের ভয় দেখিয়েছিলেন তাঁকে। শস্তায় বেচে দিয়ে তিনি পাকিস্থানে চ’লে গেছেন। তাঁকে তুলে দেওয়ার জন্যে বিনোদবাবু দমদমের বিমানঘাঁটিতে গিয়েছিলেন। কেমন থাকেন, খবর দেবেন।”

“নিশ্চয়ই—” সুবোধবাবু পকেট থেকে চারটে টাকা বা’র করলেন, “আপনার ভিজিট।”

“এখানে এলে দু’ টাকা লাগে। আপনার তাও লাগবে না।”

“কেন?”

“আপনি তো চন্দনের বাবা। সে আমার এখানে রোজই একবার আসে। সময় জেনে যায়।”

“না, না—তা হয় না। দু’ টাকাই তা হ’লে রাখুন।” টাকা

দিয়ে সুবোধবাবুই বললেন, "বয়স তো খুবই কম। বিয়ে ক'রে ফেলুন। বড় রাস্তার ওপরে ডিসপেনসারি খুলতে হবে, যদি দু'শো টাকা ভাড়া দিতে হয় তবুও। এক থোকে শ্বশুরের কাছ থেকে হাজার বিশেক নিয়ে নেবেন। এই সমাজের তাই তো নিয়ম। যদি বলেন, খোঁজ করতে পারি। টাকা এবং মেয়ের অভাব হবে না।"

"আপনাকে বোধ হয় ডাকছেন—"

"কে ?"

"একটি মেয়ে।"

পেছন ফিরে সুবোধবাবু দেখলেন, ললিতা এসে জানালার কাছে অপেক্ষা করছে। ওর নিশ্চয়ই দেরি হ'য়ে গেল।

"ক'টা বেজেছে, বাবা ?"

ডাক্তার ঘোষ তাঁর হাতঘড়িটা সুবোধবাবুর দিকে তুলে ধরলেন। ঘড়ি দেখবার আগে সুবোধবাবু প্রেসক্রিপশনটা পকেটে ভ'রে ফেললেন। তারপর বললেন, "সময় হ'ল। তুই রওনা হচ্ছিস না কি ?"

"হ্যাঁ।"

"সেই ভাল। ট্রামে যাচ্ছিস যখন একটু আগে যাওয়াই ভাল।"

ললিতা চ'লে যাওয়ার পরে সুবোধবাবু বললেন, "আমার মেয়ে। বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছে। আজকেই শেষ হবে। কেমন দেখলেন ?"

"নাঃ—এখন জ্বরটর্ কিছু নেই। টাকা দু'টো আপনি ফিরিয়ে নিন।"

চেম্বারের বাইরে গিয়ে সুবোধবাবু বললেন, "কেমন থাকি আপনাকে খবর দেব। নমস্কার।"

টাকা দু'টো হাতে নিয়ে ডাক্তার বিকাশ ঘোষ কি যেন ভাবতে লাগলেন।

বি-এ পরীক্ষার খবর বেরিয়েছে। চন্দনকে সঙ্গে নিয়ে ললিতা নিজেই গিয়েছিল খবর জানতে। না গেলেও পারত। ব্যস্ত হওয়ার কারণ ছিল না। হেসেখেলেই পাস করেছে ললিতা। সুবোধবাবুও খবরটা শুনলেন। বললেন তিনি, "তুই পাস না করলে ইউনিভারসিটি ফেল হ'য়ে যেত। মনে মনে আমি জানতুম টাকা-গুলো নষ্ট হচ্ছে—দাঁড়া।" আজকে আর আধ-পোড়া সিগারেট নয়, পুরো একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলেন সুবোধবাবু, "এবার বল্, কি চাই?"

"আমাদের একটা ফিল্ম দেখাও, বাবা।" লাফিয়ে উঠল চন্দন।

"তুই আবার মাথা গলাচ্ছিস কেন? তোর কিচ্ছু হবে না। দিদির পায়ের ধুলো নে, চন্দন।"

স্নেহলতা ব'সে ছিলেন ললিতার পাশে। সুবোধবাবুর আগের কথাটা তিনি ভোলেন নি। জিজ্ঞাসা করলেন, "একটু আগে কি বলছিলে না?"

"কি?"

"ওই যে মনে মনে তুমি জানতে টাকাগুলো নষ্ট হচ্ছে। কি ক'রে নষ্ট হ'ল এবং কোন্ টাকা?"

জবাব শোনবার জন্যে ললিতারও আগ্রহ বাড়ল। মাঝে মাঝে বাবা ঝপ ক'রে দু'একটা এমন কথা ব'লে ফেলেন যে, মনে হয় কথাগুলো অসংলগ্ন। কিন্তু ললিতা তার বাপকে চেনে। অসংলগ্ন কথা বাবা বলেন না। আলোচনার মাঝখানে যখনই হোক তিনি কথাগুলো মিলিয়ে দেবেন। দিলেনও। সুবোধবাবু বললেন, "ওই কোচিং ক্লাশের টাকাটার কথা বলছিলুম। বি-এ পরীক্ষার

পড়াটুকু ললিতার কাছে কিছুই নয়। দু'টি ক্লান্ত অধ্যাপককে পার্টনার ক'রে বাড়িওয়ালা অমর সরকার ভাল ব্যবসা খুলেছে। পৈতৃক ব্যবসাটা পর্যন্ত সে তুলে দিচ্ছে। কি ফিল্ম দেখবি বল্? হিন্দী, বাংলা, না ইংরেজী? কবে যাবি তাও আমায় এক্ষুনি ব'লে দে। আগে টিকিট কাটব।"

স্নেহলতা জানতেন বেশি দামের টিকিট ছাড়া আগে টিকিট কাটা যায় না। তাই তাঁর মনে হ'ল, চন্দনের বাবার পকেটে এখন আর টাকা নেই। মাস শেষ হ'তে এখনো দিন দশ বাকী। সত্যি সত্যি যদি ওদের ছবি দেখাবার সামর্থ্য থাকত তাঁর তা হ'লে আগে টিকিট কাটবার কথা তিনি বলতেন না। স্বামীকে চেনেন স্নেহলতা। এত অল্প মাইনে পান যে, অনুযোগ করার মত কোন কথা থাকে না।

স্নেহলতা বললেন, "সিনেমা হাউসের ভিড়ের মধ্যে ললিতা যেতে চাইবে না—" এই রকম একটা মন্তব্য প্রকাশ করবার জন্যেই ললিতা সুযোগ খুঁজছিল। মায়ের কথা শুনে এবার সে বলল, "এসব বাজে জিনিস দেখবার আমার সময় নেই, বাবা। তাও আবার ভিড়ের মধ্যে গিয়ে?"

"যা বলেছিস!" মাঝামাঝি জায়গায় সিগারেটটা নিবিয়ে ফেললেন সুবোধবাবু, "যা বলেছিস, ললিতা। সিনেমা হাউসের বাইরে যে-সব ছবি এঁকে এঁকে রাখে—থুঃ। ওগুলোকে তোরা ছবি বলিস?"

"সেই জন্যেই তোমায় বলছি বাবা, টিকিট কাটবার দরকার নেই। চন্দনকে নিয়ে আমি চিড়িয়াখানায় যাব।"

আবার কেউ আপত্তি তুলতে পারে ভেবে সুবোধবাবু তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা টাকা বা'র ক'রে বললেন, "এই নে, ধর্। বাঁদরগুলোকে দু'চারটে কলা কিনে দিস। এই ভাল হ'ল।"

"হ্যাঁ, এই ভাল হ'ল বাবা। খেয়েদেয়ে আমরা যাব।"

সবচেয়ে বেশি খুশি হ'লেন স্নেহলতা। তিনি ভেবেছিলেন, চন্দন হয়তো আপত্তি তুলে বসবে। সে তো এখনো জানে না, বাবা তার কত টাকা মাইনে পান। বেশি পান না তা ঠিক। কিন্তু এত কম পান যে, তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে ছেলে আর মেয়েটাকে নিয়ে তিনি একদিনও সিনেমায় যেতে পারেন না। বড় হ'লে চন্দন বুঝবে। জানতে পারবে সবই। তখন আর সম্মান বাঁচাবার জন্যে চিড়িয়াখানার পথ খুঁজতে হবে না।

চিড়িয়াখানায় যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা হওয়ার পরে স্নেহলতা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করবি এবার?"

"কি করতে বলো, মা? আজকাল তো মেয়েরা চাকরি করছেই।"

"না, না, আমি তোকে চাকরি করতে বলছি না। তোর কি ইচ্ছে তাই বল্।"

ললিতা ভাবতে লাগল। সুবোধবাবু ইত্যবসরে ব'লে ফেললেন, "চাকরি যদি করিস তা হ'লে মন্দ হয় না। শুরুতেই আমার চেয়ে বেশি মাইনে হবে। অবিশ্যি যদি করিস, তবেই।"

"তোমার কি ইচ্ছে, শুনি?" জিজ্ঞাসা করলেন স্নেহলতা।

"আমার ইচ্ছেমত কোন কিছু হয় নি। হ'লে, ললিতা আজ বি-এ পাস করতে পারত না।"

কথাটা মিথ্যে নয়। মনে মনে তাঁর কেমন একটা সঙ্কোচ ছিল। আই-এ পাস করবার পরে তিনি কেবলই ভাবতেন যে, বাপের চেয়ে মেয়ের বিদ্যা বেশি হ'য়ে যাচ্ছে। তিনি আই-এ পাস। মেয়ে এখন যাচ্ছে বি-এ পড়তে। সুবোধবাবুর দুর্বলতার খবর জানা ছিল স্নেহলতার। তাই তিনি বলেছিলেন, "বিয়ে যদি দিয়ে দিতে, আপত্তি করতুম না। নইলে, ঘরে ওকে বসিয়ে রাখি কি ক'রে?"

বি-এ ক্লাশে ললিতা যেদিন ভর্তি হ'য়ে এল সেদিন রাত্রিতে ভাল ক'রে ঘুমতে পারেন নি সুবোধবাবু। এপাশ ওপাশ করছিলেন ঘন ঘন। মধ্যরাত্রির দিকে স্নেহলতা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ঘুমের ওষুধ খাবে না কি ?"

"দরকার নেই।"

"শরীরটা কি ভাল নেই ?"

"বয়স বাড়ছে। তা ছাড়া পোস্ট অফিসের কাজে খাটুনি বড্ড বেশি।"

"দায়িত্বও কম নয়।" স্নেহলতা সুবোধবাবুর মাথায় হাত বুলতে বুলতে বলেছিলেন, "তোমার মত লোকের আরও কত উন্নতি হওয়া উচিত ছিল।"

"নাঃ! বি-এ ডিগ্রীটা থাকলে—"

"কি যে বলো! আগেকার দিনের যারা আই-এ পাস তাদের সঙ্গে বিদ্যায় কি আজকালকার এম-এ পাসওয়ালারাও পেরে উঠবে ? তোমাদের সময় সত্যিকারের লেখাপড়া হ'তো। তোমার কথাই ধরো—"

এর পরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সুবোধবাবু। দুটো বছর হু হু ক'রে কেটেও গেল। আজ আবার ললিতা বি-এ পাস করেছে। ললিতার ইচ্ছে, সে এম-এ পড়ে। কি ক'রে পড়বে, পয়সা কোথা থেকে আসবে, এসব প্রশ্ন তিনি করলেন না। ললিতা নিজে থেকেই বলল, "তুমি ভেবো না, বাবা। দরকার হয় টিউসনী করব। বিনোদ বক্সির বাড়িতে টিউসনী পাওয়া যায়।"

"সে কি ? তাঁর তো ছেলেপিলে নেই রে!"

"তিনি নিজেই পড়তে চান, বাবা।"

"তার মানে ?"

"ইংরেজীটা ভাল জানেন না। তাই তাঁর স্ত্রী বলছিলেন যে,

সপ্তাহে দু'দিন ক'রে যদি প্রাইভেট্‌লি পড়িয়ে দিই—বিনোদবাবুকে তুমি দোষ দিতে পার না। ছেলেবেলা থেকে ইংরেজদের সঙ্গে কোন বিষয়েই সহযোগিতা করেন নি কিনা—মানে—টিউসনী পাওয়া যাবে।"

স্নেহলতা আলোচনাটা বন্ধ করবার উদ্দেশ্যেই বললেন, "যাক, এই তো সবে পাস করলি। তাড়াহুড়ো করবার কিছু নেই।"

"ভর্তি হ'তে হবে তো, মা। তুমি চুপ ক'রে রইলে যে বাবা? তা হ'লে চন্দনকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় যাচ্ছি।"

বেরুতে বেরুতে প্রায় চারটে বেজে গেল। শনিবার ব'লে ইস্কুল থেকে চন্দনের তাড়াতাড়ি ফেরবার কথা ছিল। কিন্তু ওর ফিরতে ফিরতে তিনটে বাজলো। তারপর একটু জলখাবার খেয়ে ললিতা যখন চন্দনকে নিয়ে নিচে নেমে আসছিল তখন সিঁড়ি দিয়ে কে যেন উঠে আসছিলেন দোতলায়। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ললিতা। মনে হ'ল, ভদ্রলোকটি নিশ্চয়ই বাবার খোঁজে এসেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনিই কি সুবোধবাবুর মেয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"এটি?"

"আমার ভাই, চন্দন।"

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ভদ্রলোকটি ঘোষণা করলেন, "আমার নাম অমিয়াংশু সেন। ডাক-বিভাগে কাজ করতুম—"

"ও, হ্যাঁ, বাবার কাছে আপনার নাম শুনেছি। আসুন।"

"সুবোধবাবু কি বাড়ি আছেন?"

"না। বাবা আজ একটু তাড়াতাড়িই ফিরবেন বটে, কিন্তু এখনো প্রায় ঘণ্টাখানেক বাকী।"

"তা হ'লে আমি চলি। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল না।"

"আপনি বসুন—"

"নাঃ।" অমিয়াংশু নিচের দিকে মুখ ক'রে ঘুরে দাঁড়াল, "খুবই জরুরী দরকার ছিল—থাক, অন্য একদিন আসব।" একটা সিঁড়ি নেমে আবার দাঁড়িয়ে গেল অমিয়াংশু, "আপনি বুঝি বাইরে বেরুচ্ছেন?"

"ওকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় যাচ্ছিলাম। আজ আর যাব না।"

"কেন? কেন যাবেন না? চলুন আমি নিয়ে যাচ্ছি।" এই ব'লে অমিয়াংশু চন্দনের হাত ধ'রে নেমে এল নিচে। কর্নেল বিশ্বাস রোডটা যেন ঝড়ের বেগে পারও হ'য়ে গেল সে। তারক দত্ত রোডে এসে পড়তেই, ট্যাক্সিও জুটে গেল একটা। ললিতা আপত্তি করবার সময় পেল না। চন্দন আর ললিতাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে অমিয়াংশু ব'সে পড়ল ড্রাইভারের পাশে। কথাবার্তা শুরু করতে গিয়ে ললিতা দেখল, ওরা প্রায় চিড়িয়াখানার কাছা-কাছি এসে পড়েছে। টিকিটও কিনে ফেলল অমিয়াংশু। মুখ ঘুরিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলল সে, "আধ ঘণ্টা বোসো, আমরা আবার যাব।"

"না, না, বসবে কেন?" আপত্তি করল ললিতা।

"বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে যদি না পাই?"

"না, পয়সা নষ্ট করবেন না।"

"বেশ, ভাড়া ওকে দিয়েই দিই। কি জানি যদি আধঘণ্টার বেশি হ'য়ে যায়—"

ভাড়াটা চুকিয়ে দিল অমিয়াংশু, "আপনার বাবা আমাকে খুবই স্নেহ করেন। চলো ভাই চন্দন। কোন্ জানোয়ার আগে দেখবে?"

"সিংহ।"

"ভেরি গুড। বাঁদর বললে দুঃখিত হতুম। আপনার কি পছন্দ?"

ললিতা জবাব দিল না, শুধু চেয়ে রইল অমিয়াংশুর দিকে।

তারপর হাঁটতে লাগল ডান দিকে। লোকটিকে লক্ষ্য করছে ললিতা। লক্ষ্য করবার মত লোক বটে অমিয়াংশু সেন। বাবার চেয়ে অনেক বড় চাকরি তাঁর। বাবা ক্লাশ থ্রী-র কেরানী। অমিয়বাবু ক্লাশ টু-র অফিসার। তবুও তিনি বললেন, বাবা তাঁকে স্নেহ করেন।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে অমিয়াংশু বলল, "ভাই চন্দন, এক দিনে যদি সব জানোয়ার দেখে ফেলো, সারাজীবন তবে দেখবে কি? চলো, ফেরা যাক। আপনি কি বলেন?"

"হ্যাঁ, ফেরাই যাক। বাবার সঙ্গে আপনার তো জরুরী দরকার আছে বললেন।"

"পাঁচ মিনিটে সেরে নেব।"

অমিয়াংশু তাড়াতাড়ি পা ফেলে বেরিয়ে এল চিড়িয়াখানার বাইরে। ডাইনে বাঁয়ে দৃষ্টি ফেলতে লাগল। ললিতা বলল, "বাসে ক'রে গেলেও খুব বেশি দেরি হ'তো না।"

"দেরি হোক। আমি তো আজই রওনা হচ্ছি না। বেবি একটা নিয়ে নিই—এই যে আসছে। ট্যাক্সি—"

ট্যাক্সিতে উঠে অমিয়াংশু জিজ্ঞাসা করল, "বি-এ পরীক্ষার ফল বেরয় নি?"

"বেরিয়েছে।"

"ভেরি গুড। পাস করেছেন নিশ্চয়ই?"

ললিতার হ'য়ে জবাব দিল চন্দন। ড্রাইভারের পাশে ব'সে অমিয়াংশু নেচে উঠল, "শুধু মুখের কথায় অভিনন্দন জানানো যায় না। ভাই চন্দন, আমরা আজ দিদিকে খাওয়াব। কি বলো? ড্রাইভার, পার্ক স্ট্রীট।"

"না, না—এ কি করছেন? পার্ক স্ট্রীট নয়, পার্ক সার্কাস।" ব্যস্ত হ'য়ে উঠল ললিতা।

"বেশ, চন্দন যা বলে তাই হবে। কোথায় যাব, তুমি ব'লে দাও।"

ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকে ব'সে চন্দন বলল, "পার্ক—"

ললিতা ব'লে উঠল, "সার্কাস—"

"ষ্ট্রীট—" সুর চড়িয়ে ঘোষণা করল অমিয়াংশু।

"বা রে, আপনি ওকে ডিক্‌টেট করছেন কেন?"

"আপনিই তো আগে করলেন।"

সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে বেবি ট্যাক্সি পৌঁছে গেল পার্ক ষ্ট্রীটে। ড্রাইভার জানে, পার্ক সার্কাসের চেয়ে পার্ক ষ্ট্রীটে সওয়ারীর সংখ্যা বেশি। ট্যাক্সি তার খালি ফিরবে না।

কিন্তু ট্যাক্সিটা ধ'রে রাখল অমিয়াংশু। ললিতাকে বলল, "আপনি বসুন। আমরা খাবার এখান থেকে কিনে নিয়ে যাব। সিলেকসনের ভার নেবে চন্দন। তুমি নেমে এসো ভাই।"

নামবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে ছিল চন্দন। পায়ে হেঁটে দু'একবার হয়তো সে পার্ক ষ্ট্রীটে এসেছে। কিন্তু ট্যাক্সিতে চেপে আসে নি। তা ছাড়া, দু'পাশের দোকানগুলোতে ঢোকবার সুযোগ কিংবা সাহস পায় নি সে। অমিয়াংশুবাবুর মত লোক সে এই প্রথম দেখল। ছুটে বেড়াবার মধ্যে যে এত আনন্দ থাকতে পারে, চন্দন তা আগে জানতো না।

চারটে বাক্স ভর্তি ক'রে কেক আর চিকেন স্যাণ্ডউইচ কিনল অমিয়াংশু। হ্যাম স্যাণ্ডউইচের অর্ডার সে আজ দেয় নি। দু'টো দশ টাকার নোট আজও সে ফেলে দিল টেবিলের ওপর। দাম চুকিয়ে দেওয়ার পরে চন্দন জিজ্ঞাসা করল, "অমিয়দা, বাক্সগুলো তুলে নেব?"

"না, ভাই। এদের বেয়ারাই গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবে।"

ট্যাক্সিতে উঠে এসে অমিয়াংশু বাক্স চারটে নামিয়ে নিল

নিজেই। একটা আধুলি সে আলাদা ক'রে রেখেছিল। বখশিস পেয়ে বেয়ারাটা সেলাম দিল অমিয়াংশুকে। চন্দন জিজ্ঞাসা করল, "আবার পয়সা দিলে কেন, অমিয়দা ?"

"নিয়ম। বেয়ারাটা ব'য়ে আনলো কিনা। সেইজন্যে বখশিস দিতে হ'ল।"

বাকী পথটা ললিতা আর কথা বলল না। বলতে চাইল না অমিয়াংশুও। আজ সে শুধু কর্নেল বিশ্বাস রোড পর্যন্ত পৌঁছতে চায়।

তারক দত্ত রোডের মোড়ে গাড়িটা এসে পৌঁছতেই চন্দন বাইরের দিকে মুখ বা'র ক'রে দিয়ে বলল, "দিদি, আমায় এখানে নামিয়ে দাও না—"

"এখানে কেন রে ?" জিজ্ঞাসা করল ললিতা।

"বিনোদ বক্সির রোয়াকে মিটিং বসেছে—অমিয়দাকে পরিচয় করিয়ে দিই। বিনোদবাবু এম-এল-এ—"

বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে অমিয়াংশু বলল, "পুঁটি মাছদের সঙ্গে আমার কোন কারবার নেই। দিল্লীতে সব রুই-কাৎলার বাজার—এম-পি—নেমে এসো ভাই চন্দন।" অমিয়াংশু গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইল। চন্দন নামবার আগে নেমে পড়ল ললিতা। খাবারের বাক্সগুলো অমিয়াংশুর হাতে দিয়ে চন্দন বলল, "দিদি, অমিয়দাকে নিয়ে তুমি ওপরে চ'লে যাও। আমি এক্ষুনি আসছি—"

"কোথায় যাচ্ছিস তুই ?"

"বিনোদবাবু আমায় ডাকছেন। ওই যে, তিনি এদিকেই আসছেন।"

ললিতা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, বিনোদ বক্সি সত্যি সত্যি গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। বিস্ময় বোধ করল ললিতা। কিন্তু অবহেলার

ভঙ্গি ক'রে অমিয়াংশু বলল, "আমি তা হ'লে চলি। ভাই চন্দন, বাক্সগুলো ধরো। মিস মিত্র, আপনার বাবাকে বলবেন—"

বাধা দিয়ে ললিতা বলল, "না, না, আপনি এখন যাবেন না। মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে যান।"

"তাঁর পায়ের ধুলো না নিয়ে যাই কি ক'রে! কিন্তু ওই লোকটা যে সত্যি সত্যি এদিকেই আসছে। দেখুন ললিতা দেবী, মাছি দেখলে আমার কেমন ঘেন্না আসে। মানে—"

"মাছি? আপনি মাছি দেখলেন কোথায়?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল ললিতা।

কেকের বাক্সগুলো চন্দনের হাতে তুলে দিয়ে অমিয়াংশু বলল, "ঐ তো, এদিকেই আসছে—একটি নয়, অনেক। ভন্‌ভন্‌ ক'রে উড়ছে দেখুন।" এই ব'লে অমিয়াংশু সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। কিন্তু স'রে যেতে পারল না সে। বিনোদ বক্সি পৌঁছে গেলেন। দূর থেকে ললিতা তাঁকে বার কয়েক দেখেছে। এত সামনে বিনোদ বক্সিকে এই সে প্রথম দেখল। বেঁটে এবং মোটা ধরনের মানুষটি। বয়স চল্লিশের চেয়ে বেশি ব'লে মনে হ'ল না। মোটা সুতোর ধুতি পরেছেন। গায়ে হাফ-হাতার ফতুয়া। পায়ে তালতলার চটি। সারা দেহে কেমন একটা স্বার্থত্যাগের বিজ্ঞাপন ঝুলছে। দেশ এবং দশের জন্যে যে তিনি দিনরাত ভেবে মরছেন তেমন একটা ভাব দেখিয়ে বিনোদ বক্সি বললেন, "নমস্কার। আমি এ পাড়াতেই থাকি। তুমি তো সুবোধবাবুর মেয়ে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"চন্দনের কাছে খবর পেলুম, তুমি বি-এ পাস করেছ। সুবোধবাবু কি বাড়ি আছেন?"

"না। তিনি এখনো অফিস থেকে ফেরেন নি।"

"তা হ'লে অন্য একসময়ে আসব। যাই, ডাক্তার ঘোষের

সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাই। ডাক্তার হিসেবে বিকাশ ঘোষ ভাল ডাক্তার। কিন্তু—" অমিয়াংশুর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে বিনোদ বক্সি কথাটা শেষ করলেন, "কিন্তু পসার জমাতে পারলে না। রোগীরা কেউ ডাকে না তাকে। ছ' মাসের ভাড়া বাকী পড়েছে। উনি কে? এঁকে তো কখনো এপাড়ায় দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না।"

ললিতা বলল, "না। আগে তিনি এখানে কখনো আসেন নি।"

"তা হ'লে এতগুলো কেকের বাক্স কেন?" একটু হেসে বিনোদ বক্সিই বললেন, "এ অঞ্চলের এম-এল-এ আমি। খোঁজখবর রাখবার দায়িত্ব সব আমারই। মহাশয়টির কি নাম?"

ললিতা জবাব দিল, "অমিয়াংশু সেন। ডাক-বিভাগের অফিসার, আপনাদের রাষ্ট্রে ইনি ক্লাশ টু।"

"বটে?" বিনোদ বক্সি ফতুয়ার পকেট থেকে চশমা বা'র ক'রে বললেন, "বয়স তো বেশি নয়। নয়া রাষ্ট্রের নতুন জাতবিভাগ কি তোমাদের মনঃপূত হয় নি? আমার রোয়াকে একদিন এসো ললিতা। এ সম্বন্ধে একটু আলাপ-আলোচনা করা যাবে। বিংশ শতাব্দী গ'লে যাচ্ছে। দেরি ক'রো না, দু' একদিনের মধ্যেই এসো। সাহেবটি ভেতরে চ'লে গেলেন! আচ্ছা আসি।" এই ব'লে বিনোদ বক্সি পা বাড়ালেন ডাক্তার বিকাশ ঘোষের চেম্বারের দিকে।

ললিতার দিকে চেয়ে চন্দন জিজ্ঞাসা করল, "দিদি, অমিয়দা বিনোদ বক্সির সঙ্গে কথা বললেন না কেন?"

"আমি কি ক'রে বলব? চল্।"

ভেতরে ঢুকে ললিতা দেখল, অমিয়াংশু সিঁড়ির তলায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দেখতে পেয়ে অমিয়াংশু বলল, "আপনার অনেক সময় আমি নষ্ট ক'রে গেলুম। আজ চলি। অন্য একদিন এসে আপনার মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে যাব।"

"তা হয় না। চা না খেয়ে আপনার যাওয়া চলবে না। বাবা এখুনি এসে যাবেন।" ললিতা উঠে এল সিঁড়ির ওপরে। কি যেন ভাবল অমিয়াংশু। তারপর ললিতা আর চন্দনের পিছু পিছু সে এসে উপস্থিত হ'ল দোতলার ঘরে। ললিতা বলল, "আপনি একটু বসুন। মাকে খবর দিচ্ছি।"

কেকের বাক্সগুলো হাতে নিয়ে চন্দনও চ'লে গেল বাড়ির ভেতর।

বসবার মত পরিচ্ছন্ন জায়গা পেল না অমিয়াংশু। ঘরের একদিকে দু'টো বেতের চেয়ার কাৎ হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে মেঝের ওপর। ওতে কেউ নিশ্চয়ই বসে না। সময়মত মেরামত করলে হয়তো চেয়ারগুলো ব্যবহার করা যেত; অমিয়াংশু এসে দাঁড়াল রাস্তার দিকের জানালার ধারে।

এখান থেকে কর্নেল বিশ্বাস রোডটা পরিষ্কার দেখা যায়। রাস্তার উল্টো দিকে মস্তবড় একটা ম্যানশন। ম্যানশনে অনেক-গুলো ফ্ল্যাট। জানালায় সব পর্দা লাগানো, নইলে ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের দেখতে পেত অমিয়াংশু।

জানালার ধার থেকে স'রে এল সে। বসবার জন্যে জায়গা খুঁজতে লাগল। ডান দিকে একটা তক্তাপোশ রয়েছে। তার পাশে রয়েছে একটা টেবিল। অমিয়াংশু এগিয়ে গেল টেবিলের কাছে। ললিতার টেবিল এটা। একখানা অর্থবিদ্যার বই প'ড়ে রয়েছে। হাতে নিয়ে অমিয়াংশু দেখল, বই ঠিক নয়, নোট বই। তাও আবার নোটবইগুলো ললিতার কেনা নয়। ভেতরের পাতায় নাম লেখা রয়েছে রাহুল গুপ্ত।

টেবিলের কাছ থেকে স'রে এল অমিয়াংশু। বার দুই ঘরের মধ্যে পায়চারিও করল সে। ঘরের মধ্যে হাওয়া আসে না। আসবার জন্যে জানালা আছে বটে, কিন্তু গলিটার কোনও এক

জায়গা থেকে হাওয়ার গতি অন্যদিকে ঘুরে যায়। বোধ হয় সামনের ওই বড় ম্যানশনটাই হাওয়ার গতি রুখে দিয়েছে। স্বাধীন রাষ্ট্রের সরু গলিটায় দম আটকে মারা যাচ্ছে চন্দন আর তার দিদি।

রাত্রিবেলা এই ঘরটাই চন্দন আর ললিতার শোবার ঘর হয়। তক্তাপোশের ওপর একটা বিছানা গোল ক'রে মুড়ে তুলে রাখা হয়েছে। নতুন পরিবেশের প্রতি কৌতূহল বাড়ছে অমিয়াংশুর। দূর থেকেও এমন পরিবেশ সে আগে কখনো দেখে নি। দেখবার সুযোগ আসে নি ওর। ইংরেজ আমল থেকে ওরা দিল্লীতেই বসবাস করছে। বাবা ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের বড় অফিসার। ইংরেজরা তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন। তারপর হঠাৎ একদিন পরিবর্তন এল। খবরের কাগজ প'ড়ে তিনি জানলেন যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হচ্ছে। কয়েক রাত্রি ঘুমতে পারলেন না রায় বাহাদুর সুরেশ সেন। পনরোই আগস্টের আগে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। তারপর শোকে এবং দুঃখে এত অভিভূত হ'য়ে পড়লেন যে, রায় বাহাদুর হঠাৎ একদিন মারা গেলেন। কিন্তু মারা যাওয়ার আগে বড় দু'টি ছেলেকে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে তাঁরা চাকরির মই বেয়ে উঠে এলেন উঁচু তলায়। পরাধীন ভারতবর্ষে কেউ কখনো এত তাড়াতাড়ি এত উঁচুতে উঠতে পারতেন না। অমিয়াংশু মানুষ হ'ল এঁদের কাছেই।

অর্থবিদ্যার নোট বইখানা হাতে নিয়ে অমিয়াংশুর মনে হ'ল, সে যেন এক নতুন জগতের প্রবেশ-মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বিলেতী গ্যাবার্ডিন কাপড়ের কোটপ্যান্টের তলায় গত দেড়শো বছরের ইতিহাসটা যেন সজারুর কাঁটার মত গায়ে ওর খোঁচা মারতে লাগল। কি অর্থনীতি পড়ছে ললিতা? নোটবইটার মধ্যে

যে-নীতিগুলো নম্বর দিয়ে দিয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো কি ওর গ্যাবার্ডিন কাপড়ের মত বিলেতের বন্দর থেকে আমদানি করা হয় নি? বড় ম্যানশনটার দিকে চেয়ে প্রশ্নটার জবাব খুঁজতে লাগল সে। অর্থবিজ্ঞানের পাশে আরও একটা বিজ্ঞান সে দেখতে পেল। বোধ হয় তাকে সমাজবিজ্ঞানই বলা যায়। জানালার গরাদে মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়াল অমিয়াংশু। বিনোদ বক্সির রোয়াকটা এখান থেকে দেখা যায় না বটে, তবুও যেন ওর মনে হ'ল, ম্যানশনটার উঁচু মাথা থেকে বিনোদ বক্সির রোয়াক পর্যন্ত মস্তবড় একটা গহ্বর তৈরি হয়েছে। তৈরি হ'তে সময় নিয়েছে দু' একটা শতাব্দী নয়, অনেকগুলো শতাব্দী। গরাদের ফাঁক দিয়ে মাথাটা গলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল সে। চেষ্টা করল দেখবার যে, গহ্বরটা অতলস্পর্শী কি না।

পাশের ঘর থেকে একটা কাঠের চেয়ার নিয়ে উপস্থিত হ'ল চন্দন। সে বলল, "অমিয়দা, তুমি এই চেয়ারটায় ব'সো। একটু বাদেই দিদি আসবে মাকে নিয়ে।" এই ব'লে চন্দনও এসে দাঁড়াল জানালার কাছে। জিজ্ঞাসা করল, "কি দেখছিলে অমিয়দা?"

"গর্ত।" ফস্ ক'রে ব'লে ফেলল অমিয়াংশু।

"গর্ত? কর্নেল বিশ্বাস রোডে তুমি গর্ত দেখলে কোথায়? আমাকে দেখাও তো। রাস্তার মোড়ে বিনোদবাবু থাকেন—তিনি কত বড় নেতা জানো? এখানে গর্ত কখনো থাকতেই পারে না।" জানালার দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল চন্দন। তারপর মুখ ঘুরিয়ে সে বলল, "দু' গাড়ি ভর্তি হ'য়ে শাড়ি আর গহনা এল। সাতদিন বাদে দাশুবাবুর মেয়ের বিয়ে। বড় বাড়িটার দোতলায় তিনি থাকেন। দু'টো ফ্ল্যাটই তাঁর। সাতখানা ঘর। বড় বড় ঘর—"

"দাশুবাবু কে?"

"মস্ত বড় চাকরি করেন। জানো বিয়ের রাত্রে শুধু দু'হাজার

টাকার ইলেকট্রিকের আলো পুড়বে? বিনোদবাবুর রোয়াকে ব'সে কাল ভুলুদা হিসেব করছিল। আমাদের রোয়াকে অন্য পাড়া থেকেও ছেলেরা সব আসে। বেকবাগানের রামুদা বলল যে, একশো পাঁচ রকমের রান্না হবে। কি কি রান্না হবে তার লিস্ট ছাপতে দেওয়া হয়েছে গণেশ অ্যাভিন্যুর সেই মস্তবড় ছাপাখানায়। রামুদা সেই ছাপাখানাতেই কাজ করে। নিজে চোখে সেই লিস্ট সে দেখে এসেছে। জামাইকে দাশুবাবু মোটর গাড়িও দিচ্ছেন। বিনোদবাবু বললেন, এই বাজারে এমন জামাই পাওয়া খুবই কষ্ট। আই-এ-এস পরীক্ষা না কি সব পাস করেছে।" এই ব'লে চন্দন অমিয়াংশুর আরও কাছে স'রে এসে নিচু স্বরে ঘোষণা করল, "এপাড়ার সবাইকে নেমন্তন্ন করেছেন দাশুবাবু, রোয়াকে যারা বসে তাদেরও। আমরাই শুধু বাদ পড়েছি।"

এইসময় ললিতার গলা শুনতে পেল অমিয়াংশু। চন্দনকে সে পাশের ঘর থেকে ডাকছিল। অমিয়াংশু বলল, "ভাই চন্দন, দিদি তোমায় ডাকছে।"

"তাই তো ভুলেই গিয়েছিলাম।" চন্দন আলনার ওপর থেকে একটা শাড়ি তুলে নিয়ে বলল, "দিদির শাড়ি প'রে মা আসবেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে। জানো অমিয়দা, এই শাড়িটা দিদিকে কে দিয়েছে? রাহুলদা। বাবা কিংবা মা কেউ জানেন না। দিদি শুধু আমাকে বলেছে। আমি আসছি।" চন্দন লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অমিয়াংশু এবার নোটবইখানা ছুঁড়ে ফেলে রাখল টেবিলের ওপর। প্রথম দিকের তিন চারটে পাতা উল্টে যেতেই অমিয়াংশু দেখল, রাহুল গুপ্তের নামটা দূর থেকেও পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে।

নতুন জগতের প্রবেশ-পথে নয়, ভেতরেই ঢুকে পড়েছে অমিয়াংশু সেন। প্রধান চরিত্রগুলো একে একে এগিয়ে আসছে

সামনে। দিল্লী কিংবা কলকাতার চওড়া রাস্তাগুলোর পাশে সারাজীবন ধ'রে অপেক্ষা করলেও এই সব চরিত্রের সঙ্গে তার দেখা হ'তো না। গলির মধ্যে যে বড় গল্পের মশলা থাকতে পারে তাই বা সে জানবে কি ক'রে? অমিয়াংশু ধৈর্য হারাতে লাগল। সব কিছু সে আজকের মধ্যেই জেনে ফেলতে চায়। গ্যাবার্ডিনের কোট-প্যান্ট প'রে সুবোধবাবুর বাড়িতে ঢুকে পড়া তার উচিত হয় নি। একটা ছেঁড়া পাজামার ওপর আধময়লা পাঞ্জাবি চাপিয়ে উসকোখুসকো চুল নিয়ে ভাঙা বেতের চেয়ারে বসতে পারলে আরাম পেত সে। এমন আরাম সে দিল্লীর লোকসভার গ্যালারী কিংবা গদিতে বসলেও পেত না। পকেট থেকে সোনার সিগারেট কেস বা'র ক'রে কাঠের চেয়ারে ব'সে বিলেতী সিগারেটের ধোঁয়া টানতে লাগল অমিয়াংশু সেন।

পাশের ঘরে এরই মধ্যে একটা ঝড় ব'য়ে গেছে। স্নেহলতা ভাবতে পারেন নি যে, ললিতা এমন একটা অদ্ভুত অনুরোধ ক'রে বসবে। অমিয়াংশু সেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চায় ললিতা। একদিন আগে খবরটা জানা থাকলে তিনি কাপড়চোপড় সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে রাখতে পারতেন। ভাঁজ-করা শাড়ি তোশকের তলায় ফেলে রেখে ইস্ত্রি করবার সুযোগ পেতেন স্নেহলতা। সবসুদ্ধ তিনখানা শাড়ি তাঁর। তাই প'রে তাঁকে রান্না করতে হয়, ঘরদোর ঝাঁট দিতে হয়, প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মী পুজোর পাঁচালি পড়তে হয়। তিনখানা শাড়ির ওপর নির্ভর ক'রে কোনরকমে বেঁচে থাকা যায়, সামাজিকতা রক্ষা করা যায় না। এযাবৎকাল শুধু জীবন ছাড়া অন্য কিছু আর তাঁকে রক্ষা করতে হয়ও নি। আজ ললিতা তাঁকে সত্যিই বিপদে ফেলেছে। তিনি খুবই বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

স্নেহলতা বললেন, "আজ থাক, ললিতা। সেনসাহেবের সঙ্গে অন্য একদিন আলাপ করব।"

ললিতা জোর দিয়ে বলল, "তা হয় না, মা। আমি তাঁকে ব'লে এসেছি। তা ছাড়া বাবা তো তাঁর অধীনেই কাজ করেন।"

হাসি পেল স্নেহলতার। পনেরো বছর আগের কথা মনে পড়ল তাঁর। পার্ক ষ্ট্রীটের পোস্ট অফিসে কাজ করতেন তখন ললিতার বাবা।

বেনিয়াপুকুরের দিকে কোথায় একটা বস্তির মধ্যে বাস করতেন তিনি। সঙ্গে দু' জন ডাক-পিওনও থাকত। হঠাৎ একদিন তিনি পাড়াগাঁ থেকে স্নেহলতা আর ললিতাকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। কর্নেল বিশ্বাস রোডের ঘর দু'খানা তিনি আগেই ভাড়া ক'রে গিয়েছিলেন। কর্নেল বিশ্বাস রোডে তখন গোটা কয়েক পুরনো বাড়ি ছিল। ভাড়াটে যাঁরা থাকতেন তাঁদের আর্থিক অবস্থা সুবোধবাবুর চেয়ে ভাল ছিল না। দু'একটি পরিবারের সঙ্গে স্নেহলতার আলাপ পরিচয়ও হ'ল। মাসী-পিসী সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলতে সময় লেগেছিল খুবই কম। সেদিন তিনি বাইরে বেরুতে লজ্জা পেতেন না। অতি সাধারণ অল্প দামের শাড়ি প'রে স্নেহলতা পুরো রাস্তাটাই ঘুরে এসেছেন। কারো চেয়ে নিজেকে ছোট ব'লে ভাবতে পারেন নি তিনি। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হ'ল। জানালার ফাঁক দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, পুরনো বাড়ি সব লোপ পেয়ে যাচ্ছে। বড় বড় বাড়ি উঠছে। পাঁচ নম্বর বাড়িটা তিনতলা হ'ল। তার পরেই দেখলেন ছ' নম্বরের চারতলা। একটা প্রাণান্তকর প্রতিযোগিতা শুধু উঁচুর দিকেই ভেসে উঠল না, চওড়ার দিকেও বড় হ'তে লাগল। দশ নম্বর বাড়িতে পাঁচটা ফ্ল্যাট তৈরী হয়েছে ব'লে এগারো নম্বরের ফ্ল্যাটের সংখ্যা হ'ল সাতটা। কর্নেল বিশ্বাস রোডের ওপর স্নেহলতা শুধু প্রতিযোগিতাই

দেখলেন না, লোভের আগুনও দেখলেন। চতুর্দিকের ঐশ্বর্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে তাঁকে লুকিয়ে থাকতে হ'ল এই ঘর ছু'খানার মধ্যে। জানালার ধারে দাঁড়াতেও এখন সঙ্কোচ হয়। একটা সুন্দর কবিতা সৃষ্টি হ'তে হ'তে কোথায় কেমন ক'রে যেন কবিতার ছন্দ গেল ভেঙে। ছু'টি সন্তানের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতেও লজ্জা করে এখন। সুবোধবাবু কম মাইনে পান ব'লে স্নেহলতা কোনদিনও লজ্জা পান নি। শুধু আশপাশের ঐশ্বর্যের এত কাছে বাস করতে হয় ব'লে রাস্তার দিকের জানালা তিনি বন্ধ ক'রে রাখেন।

কিন্তু ললিতা আজ আবার তাঁকে সেই পুরনো যন্ত্রণার নতুন শাড়িটা পরাতে চায়। কোন্ এক বন্ধুর কাছ থেকে শাড়িটা উপহার পেয়েছে ললিতা। মেয়ে, না ছেলে-বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেয়েছে তাও তিনি সাহস ক'রে ললিতাকে জিজ্ঞাসা করেন নি। জিজ্ঞাসা করলে হয়তো বা চন্দনের বাবা নীতি এবং ছুর্নীতির প্রশ্ন তুলে এই ছোট সংসারটাকে তোলপাড় ক'রে তুলবেন। জিজ্ঞাসা তিনি করেন নি বটে, কিন্তু স্নেহলতার বিশ্বাস, নতুন শাড়িখানা চন্দনের বাবার চোখে নিশ্চয়ই পড়েছে। একটা সন্দেহজনক ছুর্নীতির কাঁটা তাঁকে যে বিঁধছে না তাই বা তিনি বলবেন কি ক'রে? মাঝে মাঝে স্নেহলতার রাগ হয়। রাগ হয় সুবোধবাবুর ওপর। মানুষটা দিন দিন যেন বেশি গরিব হ'য়ে পড়ছে। যত বেশি গরিব হ'য়ে পড়ছেন তত বেশি নীতির প্রতি ঝোঁক বাড়ছে তাঁর। এযাবৎকাল ললিতার পড়ার খরচ যদি কোন বিত্তশালী যুবকের তহবিল থেকে সংগৃহীত হ'য়ে থাকে, তাতে দোষের কি আছে? চতুর্দিকের গাড়ি বাড়ি এবং রাশি রাশি গহনার মধ্যে তিনি ছুর্নীতি দেখতে পান না—কথাটা শেষ পর্যন্ত ভাবতে পারলেন না স্নেহলতা। ললিতা ব'লে বসল, "কী সুন্দর তোমায় মানিয়েছে, মা। রাহুলের পছন্দ আছে।"

"রাহুল ?" বিস্মিতভাবে স্নেহলতা জিজ্ঞাসা করলেন, "রাহুল কে ?"

"রাহুল গুপ্ত। আমার জন্মদিনে শাড়িখানা আমি ওর কাছ থেকে উপহার পেয়েছি। এত ভাল ছেলে—সব কথা তোমায় আমি খুলে বলব, মা। এখন নয়, অন্য একদিন। নিজে ছেঁড়া কাপড় পরবে—অথচ অন্য কেউ ছেঁড়া কাপড় পরলে তাকে নতুন কাপড় কিনে দেয় রাহুল।"

"বড়লোকের ছেলে বুঝি ?"

"খু—-ব। বাবা তার মস্তবড় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এখন পেনসন নিয়েছেন। রাহুলের কাছে শুনেছি, ওর ভাইবোনেরা সব লেখাপড়া শিখে বিরাট বিরাট চাকরী করছেন। সব বলব মা তোমায়। বাবার বিশ্বাস, আমি অন্যায় করছি—কিন্তু তুমি আমায় ভুল বুঝো না মা।"

"কোথায় থাকে রাহুল গুপ্ত ?"

"কলকাতায়। কিন্তু ঠিকানা আমি জানি না। কলেজের বন্ধুরাও কেউ ওর ঠিকানা জানে না। অদ্ভুত ছেলে রাহুল। কাউকে সে ঠিকানা বলবে না।"

"কেন ?"

"রাহুল বলে, ওদের ঐশ্বর্য দেখলে ছেলেরা সব ঈর্ষা করবে। মনে মনে ব্যথা পাবে তারা। গরিব দেশের মনস্তত্ত্ব রাহুলের বুঝতে আর বাকী নেই। এবার চলো মা, সেনসাহেব কি মনে করছেন জানি না।"

অমিয়াংশু ব'সে ব'সে সিগারেট খেতে পারে নি। ছোট ঘরখানার মধ্যে শুধু পায়চারি ক'রে চলেছে। টেবিল, চেয়ার, তক্তাপোশ, যা কিছু ও দেখছে সবই ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনুভব করছে

অমিয়াংশু। আজ সে সত্যিই ধোঁয়া টানছিল না, নতুন উপলব্ধির নির্যাসে বুক ওর ভ'রে উঠছে। ভাঙা চেয়ারের ফাঁকগুলোতে দুর্বলতা নেই, নতুন সামর্থ্যের সাক্ষীগুলো চোখে পড়ছে ওর। বোধ হয় ললিতা ব'লে একটি মেয়ে এবাড়িতে না থাকলে সামর্থ্যের সাক্ষীগুলো অমিয়াংশুর চোখে পড়ত না।

স্নেহলতার পায়ের ধুলো নিয়ে অমিয়াংশু বলল, "ছেলেবেলা থেকেই আমি মাতৃহীন। পায়ের ধুলো নেয়ার সুযোগ জীবনে আমার কমই এসেছে।"

"আপনি বসুন।" অনুরোধ করলেন স্নেহলতা।

"আমায় আবার আপনি বলছেন কেন?" প্রতিবাদ করতে করতে কাঠের চেয়ারটায় ব'সে পড়ল অমিয়াংশু। তক্তাপোশের ওপর বসলেন স্নেহলতা, তাঁর দু' পাশে বসল চন্দন আর ললিতা। সুবোধবাবুর ছোট ঘরখানায় আনন্দের হাওয়া বইছে। স্নেহলতা কল্পনাও করতে পারেন নি যে, সুবোধবাবুর ওপরে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের মধ্যে কেউ কোনদিন এখানে পায়ের ধুলো দেবেন। আজ তিনি কি দেখলেন? সেনসাহেব প্যাণ্ট কোট প'রেও নিচু হ'য়ে পায়ে হাত ঠেকালেন তাঁর। এমন একটা হঠাৎ পরিবর্তনের জন্যে নিজের মনকে প্রস্তুত করতে সময় পান নি স্নেহলতা। আনন্দ আর আশঙ্কায় মুহূর্তগুলো দীর্ঘ মনে হ'তে লাগল।

গলায় বাঁধা 'টাই'টা নাড়াচাড়া করতে করতে অমিয়াংশু জিজ্ঞাসা করল, "চন্দন এমন ভালমানুষ সেজে চুপ ক'রে ব'সে রইলে কেন? কেকের বাক্সগুলো খালি ক'রে দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল চন্দন। ধমকানির সুরে ললিতা জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় চললি?"

"খিদে পেয়েছে দিদি।"

"পাবেই তো—" হাসতে হাসতে অমিয়াংশু বলল, "এমন দিনে

কার না খিদে পায় বলুন ? মিস মিত্রের পাসের খবরটা আজ আমরা সবাই শুনেছি।”

স্নেহলতা উঠলেন। তিনি বললেন, “এদের সঙ্গে ব’সে আপনি গল্প করুন। চায়ের জলটা আমি চাপিয়ে দিয়ে আসি।”

“চা না হয় একটু পরেই খাব আমি। সুবোধবাবু হয়তো এক্ষুনি এসে পড়বেন।” অমিয়াংশু ভাবল, চা খাওয়া শেষ হ’য়ে গেলে ওকেও উঠে পড়তে হবে। এত তাড়াতাড়ি সে সুবোধবাবুর বাড়িটা ত্যাগ করতে চায় না। ললিতার সান্নিধ্য ভাল লাগছে ওর। তা ছাড়া এখনো সে নোটবইখানার মধ্যে ঢুকতে পারে নি। অর্থবিছা সে নিজে কিছু কম জানে না। এম-এ পাস করেছে অর্থবিছা নিয়েই। কিন্তু রাহুল গুপ্তের নাম সে কোথাও পায় নি। কে এই রাহুল গুপ্ত ? সুবোধবাবুর মুখেও তো এর নাম শোনে নি অমিয়াংশু। নামটা শুধু আধুনিক নয়, গুরুত্বপূর্ণও। এতক্ষণ সে এই নামটা ইষ্টমন্ত্রের মত মনে মনে জপ করেছে। শুধু নোট-বইখানা নয়, শাড়িটাও রাহুল গুপ্তের দেওয়া। অনুপস্থিত রাহুল গুপ্তের কাছে অমিয়াংশু যেন এরই মধ্যে হেরে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওর সেই একশো টাকার অঙ্কটার কথা মনে পড়ল। ললিতার ‘ফী’ দেওয়ার জন্যে টাকাটা সে সুবোধবাবুকে ধার দিয়েছিল। টেক্‌নিকেলি ধার বটে, কিন্তু আসলে ওটা ধার নয়। অমিয়াংশু ফিরে পেতে চায় না টাকা। একশো টাকার সর্ব স্বত্ব ললিতা কর্তৃক সংরক্ষিত। তবুও ধার ব’লেই সুবোধবাবুকে টাকাটা দিতে হয়েছে। নইলে টাকার মধ্যে তিনি দুর্নীতির জলছবি দেখতে পেতেন। সেদিন পার্ক ষ্ট্রীটে ট্যাক্সিতে ব’সে মনে মনে কম হাসে নি অমিয়াংশু। যে যত বেশি গরিব সে তত বড় নীতিজ্ঞ। পৃথিবীর গরিব লোকেরাই শুধু জীবনের ফুটো-কলসীতে নীতির জল ঢেলে মরছে। সুবোধবাবু সেদিন বাক্সগুলো নিলেন না ব’লে অমিয়াংশুর

কিছু ক্ষতি হয় নি। বাক্সগুলো সে ভিখিরীদের দান ক'রে দিয়েছিল। কষ্ট না ক'রেই পুণ্যের কেষ্ট মিলেছে ওর।

স্নেহলতা জিজ্ঞাসা করলেন, "দিল্লীতে কে কে আছেন?"

জবাব দিল অমিয়াংশু, "আমার ছু' দাদা, আর বউদিরা। বড় বউদির কাছেই আমি মানুষ হয়েছি।" গত একশো বছরের ইতিহাস আলোচনা করবার সুযোগ পেল অমিয়াংশু। একটু থেমে সে বলতে লাগল, "ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানী উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এসে দাঁড়ালুম মহারানী ভিক্টোরিয়ার আশ্রয়ে। আমার পিতামহ সহ-অবস্থান নীতিতে বিশ্বাস করতেন। ইংরেজের পাশে আমরাও বাস করতে লাগলুম। বিদ্রোহ আমরা কেউ করি নি ব'লে বাস করবার সঙ্গে সঙ্গে বড় হ'তে লাগলুম। বাংলাদেশের সীমা অতিক্রম করলেন বাবা। প্রায় ত্রিশ বছর আগে তিনি দিল্লীতে গিয়ে পৌঁছলেন। ক্রমে ক্রমে সেখানে তিনি বাড়ি তৈরি করলেন। আমার ছু' দাদাকে বসিয়ে দিয়ে গেলেন সরকারী দপ্তরে। তাঁদেরও উন্নতি হ'তে লাগল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে বাবা হার্টফেল ক'রে মারা যান। এযাবৎকাল সেন বংশের কেউ শোক কিংবা ছুঃখ পেয়ে মারা যান নি। মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে আমাদের বংশে শুধু সুখের ট্র্যাডিশনই গ'ড়ে উঠেছে। পথ ভুল ক'রেও ছুঃখ এখানে ঢুকতে সাহস পায় নি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে দেখলুম, সুখের পরিমাণ আরও বাড়ল। আমার ছু'টি দাদাই ছ' মাসের মধ্যে তিনবার প্রমোশন পেলেন।"

"শুনুন—" উসখুস করতে করতে ললিতা জিজ্ঞাসা করল, "তা হ'লে স্বাধীন ভারতবর্ষে লাভ হ'ল কাদের?"

"গত একশো বছর ধ'রে যাদের হচ্ছিল তাদেরই।" জবাব দিল অমিয়াংশু। স্নেহলতা ললিতার প্রশ্নটা পছন্দ করলেন না। তাই তিনি আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে বললেন,

"বউদিদের ছেড়ে এখানে একা একা বাস করতে আপনার কষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। তা ছাড়া সেখানে তো নিজেদের বাড়িও রয়েছে বললেন।"

"মস্তবড় বাড়ি। আমার অংশে পাঁচখানা ঘর। বড়দার ছেলেপিলে নেই। কালক্রমে তাঁর পাঁচখানাও আমার হবে। আমার অংশটা সবচেয়ে ভাল। পাঁচখানা ঘরেই আমি তালা লাগিয়ে এসেছি। কবে যে তালাগুলো গিয়ে আমি খুলব, একমাত্র ভগবানই জানেন।"

"কেন, আপনার বউদিরা জানেন না?" হাসতে হাসতে প্রশ্ন করল ললিতা।

অমিয়াংশুও হাসলো একটু। তারপর বলল, "সব দায়িত্ব তাঁরা আমার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছেন। আমি যাঁকে পছন্দ ক'রে নিয়ে যাব, তাঁরা তাঁকেই আদর ক'রে গ্রহণ করবেন।"

মাঝখান থেকে চন্দন এবার জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, "অমিয়দা, তুমি তা হ'লে পোস্ট অফিসে চাকরি করো কেন? তুমি তো বড়লোক।"

"যে কোন মুহূর্তে ছেড়ে দিতে পারি।" পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে অমিয়াংশু বলতে লাগল, "বড়দার কাছ থেকে চিঠি পেলুম। তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিতে বলেছেন।"

"কেন?" ভয় পাওয়ার কোন কারণ ছিল না, তবু যেন ভয় পেয়েই প্রশ্ন করলেন স্নেহলতা, "কেন, কলকাতা কি আপনার ভাল লাগছে না? যখন আপনার একা একা লাগবে, এখানে চ'লে আসবেন।"

"বড়দা আমার জন্যে একটা পাঁচশো টাকার চাকরি জোগাড় করেছেন। পাস করবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মেজো ভাই বললেন, এক মাসই বা ব'সে থাকবি কেন, কাজ নিয়ে চ'লে যা কলকাতা।

আড়াইশো তিনশো যা পাস পয়লা তারিখে নিয়ে নিস। আমি জানতুম—” এই পর্যন্ত ব’লে থেমে গেল অমিয়াংশু। ব্যস্ত হ’য়ে উঠলেন স্নেহলতা। তাই তিনি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলেন, “কি জানতেন ?”

“জানতুম, আমার ছু’ দাদার মধ্যে আমাকে নিয়ে প্রতিযোগিতা চলবে। পাঁচশো টাকার চাকরিও আমার স্থায়ী হবে না। এর পরে মেজোভাই আবার আমায় বলবেন পাঁচশো টাকার চাকরিও ছেড়ে দে। তোর জন্মে সাতশো টাকার চাকরি ঠিক করেছি। দিল্লীর দরবারে আমার ছু’ দাদারই ভীষণ প্রতিপত্তি। একজন অর্থনীতিজ্ঞ, অন্যজন ইস্পাত বিশারদ। আগামী একশো বছর পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে শুধু অর্থনীতি আর ইস্পাত ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। আমি কি এখন উঠব ?”

“না—” কি যেন ভাবছিল ললিতা। ভাবতে ভাবতে চ’লে গিয়েছিল পেছনের শতাব্দীতে। সেখান থেকে ফিরে এসে ললিতা বলল, “না, না, আপনি বসুন। একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনাকে।”

“করুন।”

“অর্থবিদ্যার কথা আজকাল সবসময়েই শুনি। অর্থবিদ্যা নিয়ে আমি এম-এও পড়ব। কিন্তু সারা পৃথিবীতে সত্যিকারের অর্থ-নীতিজ্ঞ কই ? মার্ক্সকে বাদ দিলে তো আর আধখানা অর্থনীতিজ্ঞও আমাদের চোখে পড়ে না।”

সহসা চেয়ার থেকে উঠে পড়ল অমিয়াংশু। হাত বাড়িয়ে ব্যানার্জির অর্থবিদ্যার নোটবইখানা টেনে নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, “এমন উপসংহারে আপনি কি ক’রে পৌঁছলেন, মিস মিত্র ? মার্ক্স মানে তো কার্ল মার্ক্স ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস, মানব-প্রেমিক না হ’লে সত্যি-

কারের অর্থনীতিজ্ঞ হওয়া যায় না। হিউম্যানিজমের মহাসাগরে আগে ডুব দিয়েছেন কার্ল মার্ক্স, নইলে তিনি সত্যিকারের অর্থ-নীতিজ্ঞ হ'তে পারতেন না।"

"দিদি—" দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে চন্দন বলল, "দিদি, তোমাকে বোধ হয় কেউ ডাকছে।" বাইরের দিকের দরজাটা একটু ফাঁক করা ছিল। ললিতা উঠে গেল দরজার কাছে। তারপর দরজাটা পুরোপুরি খুলে দিয়ে ললিতা বলল, "তুমি? বাড়ি খুঁজে পেলে কি ক'রে?"

"কেন, নম্বর তো আমি জানতুমই। কলেজে গিয়েছিলুম। প্রিন্সিপালের কাছে শুনে এলুম তুমি পাস করেছ। ভাল নম্বর পেয়েই পাস করেছ, তিনি বললেন। তোমরা কি ব্যস্ত আছ?"

"মোটেই না। আর ব্যস্ত থাকলেই বা কি—তুমি আজ প্রথম এলে। হাতে ক'রে কি এনেছ?"

"ক'টা সন্দেশ নিয়ে এলুম। পার্ক স্ট্রীট কিংবা ফারপো থেকে বিলিতী খাবারও আনতে পারতুম। কিন্তু অত দূরে আজ আর যেতে পারলুম না। এই বুঝি তোমার ভাই?"

"হ্যাঁ।"

"তা হ'লে তোমার নামই চন্দন? ধরো—" চন্দনের হাতে সন্দেশের বাক্সটা তুলে দিয়ে রাহুল গুপ্ত ঢুকে পড়ল ঘরে। ললিতা স্নেহলতার দিকে চেয়ে বলল, "মা, এরই নাম রাহুল গুপ্ত।" তারপর অমিয়াংশুর দিকে চেয়ে ললিতাই আবার বলল, "ইনি হচ্ছেন মিস্টার অমিয়াংশু সেন। পোস্ট অফিসের অফিসার।"

বসবার মত জায়গা পাচ্ছিল না রাহুল। অমিয়াংশু এবার কাঠের চেয়ারটা রাহুলের দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজে স'রে এল তক্তাপোশের কাছে। মুহূর্তের মধ্যেই সে প্রমাণ ক'রে ফেলল যে, এবাড়ির সঙ্গে তার পরিচয় রাহুলের চেয়েও নিবিড়তর।

চেয়ারে ব'সে রাহুল গুপ্ত বলল, "আমার এক দাদা আছেন ডাক-বিভাগের বড় ইঞ্জিনীয়ার।"

"কোথায় আছেন তিনি ?" জিজ্ঞাসা করল অমিয়াংশু।

"বাংলাদেশে নেই।"

"তবে ?"

"রাজস্থানে।"

অমিয়াংশু পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সিগারেট খুঁজছিল। তারপর স্নেহলতার উপস্থিতির কথা মনে পড়তেই সোনার সিগারেট কেসটা হাতে নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, "পোস্ট অফিসের কাজ আমি ছেড়ে দিচ্ছি। বেশি মাইনের বড় চাকরি পেয়েছি।"

"কোন্ বিভাগে ?" জিজ্ঞাসা করল রাহুল।

"প্রধানমন্ত্রীর নিজের বিভাগে।" পাকা সোনার সিগারেট কেসটা স্বল্প অন্ধকার ঘরের মধ্যে চিকচিক করতে লাগল। রাহুল এতক্ষণ বোঝবার চেষ্টা করছিল যে, সিগারেট কেসের ধাতুটা সত্যি সত্যি সোনার কি না। সেই দিকে চেয়েই সে বলল, "আমার এক বোন ওই বিভাগেই চাকরি করে—ফরেন সার্ভিস। গোটা সাত বিদেশী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে। ইংরেজী সাহিত্যের এম-এ। আমার মায়ের কাছেই প্রথম সে সেক্সপিয়ার পড়তে শেখে।"

প্রত্যেকটা কথা অমিয়াংশুর গ্যাবার্ডিনের কোট ভেদ ক'রে মেদ মজ্জার স্তরগুলো কেটে কেটে একেবারে হাড়ের গায়ে খোঁচা মারছিল। রাহুলের কাছে হেরে যাচ্ছে সে। ছোট হ'য়ে যাচ্ছে প্রতি পলে পলে। বিলেতী সিগারেটের ধোঁয়া টানবার জন্যে ছটফট করতে লাগল অমিয়াংশু। এমন সময় স্নেহলতা বললেন, "তোমরা ব'সো। চা আর খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।" এই ব'লে

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। চন্দনের দিকে চেয়ে রাহুল বলল, "সন্দেশের বাক্সটা মায়ের কাছে দিয়ে এসো।"

তোলা উননে রান্না করেন স্নেহলতা। রান্নাঘর ব'লে আলাদা কোন ঘর নেই এই ফ্ল্যাটে। পেছনদিকের বারান্দায় তাই রান্নার ব্যবস্থা ক'রে নিতে হয়েছে। সকালের রান্না শেষ হওয়ার পরেই উননের আগুন নিবিয়ে দেন স্নেহলতা। আজও সেই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নি। কয়লা ধরিয়ে চা-এর জল গরম করতে গেলে অনাবশ্যক সময় নষ্ট হবে মনে ক'রে তিনি কাগজ জ্বালিয়ে আজ জল গরম করতে লাগলেন। জল গরম করতে করতে দু' একটা কথা তাঁর গভীর ভাবে ভাবতেও হ'ল। অমিয়াংশু আর রাহুল দু'টি ছেলেকেই তিনি দেখলেন। তাদের আলাপ আলোচনাও শুনলেন স্নেহলতা। প্রথম থেকেই কেমন এক ধরনের প্রতিযোগি-তার মনোভাব ভেসে উঠল ঘরের হাওয়ায়। ঐশ্বর্যের সঙ্গে ঐশ্বর্যের ঠোকাঠুকি হ'তে সময় লাগল না এক মিনিটও। তবে কি কর্নেল বিশ্বাস রোডের রোগ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে? একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে শুধু ঐশ্বর্যের সাক্ষীগুলোকে উঁচু ক'রে দেখাবার জন্যে। প্রীতি এবং আত্মীয়তার বন্ধনগুলোকে কেটে ফেলছে মানুষ। স্নেহলতা ভাবলেন, চন্দনের কোন দোষ নেই। বিনোদ বক্সির রোয়াকে সে যাবেই। পৃথিবীর কোন্ অংশে আজ রোয়াক নেই? সমাজ এবং রাষ্ট্রের চক্রান্ত আর সহযোগিতা আছে ব'লেই রোয়াকের সৃষ্টি হয়েছে। স্নেহলতার চোখে জল এল। চন্দন নষ্ট হবে। বিনোদ বক্সিদের খিদে আজ মেটবার নয়। কোটি কোটি চন্দনের কোটি কোটি মাথা আজ রাজভোগের মত সাজিয়ে রাখতে হবে রোয়াকের ওপর। আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন স্নেহলতা। ছাই উড়ছে। খবরের কাগজের ছাই। সারা দুনিয়ার জঞ্জাল পুড়িয়ে এক কেটলী জল গরম করলেন চন্দনের মা।

সন্ধে হ'য়ে এসেছে। কর্নেল বিশ্বাস রোডে একটু আধটু আলো থাকতেও সুবোধবাবুর বাড়িতে অন্ধকার ঢোকে সবচেয়ে আগে। চারদিকের উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর জন্যেই এমন হয়। প্রতিবাদ করবার কিছু নেই। বিক্ষোভ দেখিয়েই বা লাভ কি? সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন স্নেহলতা। তারপর চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে তিনি এসে উপস্থিত হলেন সামনের ঘরে। ললিতাকে বললেন তিনি, "খাবার সাজিয়ে রেখেছি। প্লেট দু'খানা নিয়ে আয় তো মা।"

একটু বাদেই খাবার এল। নিয়ে এল ললিতা। রাহুল এবং অমিয়াংশু দু'জনেই দেখতে পেল যে, খাবারের মধ্যে একটিও সন্দেশ নেই। কেক আর স্যাণ্ডউইচগুলো যেন রাহুল গুপ্তকে ঠাট্টা করছে। অমিয়াংশুর গলায় ঠাট্টার সুর প্রকাশ পেতে সময় লাগল না। টুকরো-কেকের একটা ছোট অংশ চিবতে চিবতে অমিয়াংশু বলল, "যে যা-ই বলুক, পিঠে-পায়েসের চেয়ে কেকের স্বাদ কিন্তু অনেক ভাল।"

"আমাদের বাবুর্চিও তাই বলে—" ঘুরে বসল রাহুল গুপ্ত, "আসলে পিঠে-পায়েস তৈরি করতে বাবুর্চিরা জানে না।" রাহুল নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে, কেক আর স্যাণ্ডউইচ সব অমিয়াংশু সেনই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে। ভদ্রলোকটির পোশাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে খাবারগুলো মানিয়ে গেছে ভাল। আলোচনার সুতো কেটে দিয়ে স্নেহলতা বললেন, "যা তো বাবা চন্দন, সন্দেশের বাক্সটাও নিয়ে আয়, ভুল আমারই হয়েছে। আজকের দিনে মিষ্টিমুখ করতে হয়।"

হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে অমিয়াংশু ব'লে উঠল, "এই যাঃ, আজ যে আমার চা-পার্টিতে নেমন্তন্ন ছিল। লেডী ভানু ব্যানার্জি কি ভাববেন জানি না। যাক, কাল তো তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবেই। মিস্টার গুপ্ত কি যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ, হু' পাঁচ মিনিট পরেই যাচ্ছি।" জবাব দিল রাহুল।

"না, না—আমি বলছিলাম কালকের কথা। আগামীকাল লেডী ভানু ব্যানার্জি বক্তৃতা দিচ্ছেন—"

"আমি প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা ছাড়া অন্য কারো বক্তৃতা শুনি না।" উঠে পড়ল রাহুল গুপ্ত।

অমিয়াংশু ললিতার দিকে চেয়ে বলতে লাগল, "আমরা প্রধান মন্ত্রীর এত কাছে বাস করি দিল্লীতে যে, তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্যে আমাদের মাঠে ময়দানে যেতে হয় না। আপনাকে তো আগেই বলেছি মিস মিত্র, ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানী উঠে যাওয়ার সময় থেকে আমরা শাসকদের খুব সন্নিকটেই বাস করছি। আমরা হচ্ছি গিয়ে ইতিহাসের অংশ।"

রাহুল গুপ্ত এক টানে এক পেয়ালা চা-ই খেয়ে ফেলল।

স্নেহলতা দেখলেন, ছেলেটির হাত কাঁপছে। ভেতরের উত্তেজনা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে ওর। একটু আগেই তিনি শুনলেন, রাহুলদের রান্নার জন্যে উঁচুদরের বাবুর্চি আছে। কিন্তু ওকে দেখে তাঁর মনে হ'ল, ছেলেটি বোধ হয় অনেকদিন থেকে পুষ্টিকর খাদ্য কিছু খায় না। রক্ত-স্বল্পতার জন্যে মুখের রং পর্যন্ত ফ্যাকাশে। স্নেহলতা বাক্স থেকে সন্দেশ বার ক'রে অমিয়াংশুকে বললেন, "একটা সন্দেশ অন্তত আপনাকে খেতে হবে।"

"দিন।" সন্দেশ চিবতে চিবতে অমিয়াংশু জিজ্ঞাসা করল, "তাহ'লে এম-এ পড়াই ঠিক করলেন, মিস মিত্র?"

"পড়ার ইচ্ছে তো ষোল আনা। কিন্তু বাবা—" হঠাৎ থেমে গেল ললিতা।

অমিয়াংশু ব'লে উঠল, "না, সুবোধবাবু আপত্তি করতে পারেন না। আপনাকে তিনি এম-এ পাস করাবেনই। খরচ যা হবে সবই তিনি দেবেন।"

ললিতা এবার রাহুল গুপ্তের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, "বাবার পক্ষে খরচ চালানো সম্ভব হবে কি না জানি না। তা ছাড়া—"

"না, না—আপনি ভর্তি হ'য়ে যান। অর্থবিদ্যা নিয়ে এম-এ পাস করতে পারলে অর্থের অভাব আর থাকবে না। সুবোধবাবু খরচ সব চালিয়ে যাবেন।" একটু থেমে অমিয়াংশুই আবার বলল, "সুবোধবাবুর হ'য়ে আমিই আপনাকে কথা দিতে পারি।" সহসা পকেট থেকে বেশ চওড়া ধরনের একটা পার্স বা'র ক'রে অমিয়াংশু ব'লে উঠল, "এই যাঃ, সিগারেট কেসটা বার করতে গিয়ে একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম। মিস্টার গুপ্তও কি বি-এ পাস করলেন? আপনার পরিচয় কিন্তু আমি এখনো পাই নি।"

জবাব দিল ললিতা, "আমরা এক সঙ্গেই পড়তুম। রাহুলেরও এবার বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। আমাদের কলেজের সবচেয়ে ভাল ছেলে—কিন্তু তৈরি হ'তে পারে নি ব'লে পরীক্ষা দেয় নি। রাহুলের বাবা মস্তবড় ইঞ্জিনীয়ার—এখন পেনসান নিয়েছেন।"

"রুরকী থেকে তিনি প্রথম হ'য়ে পাস করেছিলেন—" ঘোষণা করল রাহুল গুপ্ত।

অমিয়াংশু এবার দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, "আমি চললুম। সুবোধবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল না। কাল অবিশ্যি অফিসেই দেখা হবে। বড্ড বেশি ব্যস্ত আছি, নইলে মাঝে মাঝে এসে চা খেয়ে যেতুম—" দরজার ওপাশে গিয়েও অমিয়াংশু অপেক্ষা করতে লাগল। স্নেহলতা অনুরোধের সুরে বললেন, "সময় পেলেই আসবেন। আজ আমাদের কতবড় সৌভাগ্য—"

"ছি, ছি, এমন কথা বলবেন না। আসব। নিশ্চয়ই আসব। তবে মিস মিত্রের সময় নষ্ট হ'ল—" অমিয়াংশু চেয়ে রইল ললিতার দিকে।

ললিতা বলল, "এখন তো আর আমার পড়াশুনোর ঝক্কি নেই—"

"আসব। নিশ্চয়ই আসব। পরশুদিন বিকেলের দিকে আমি বোধ হয় ফ্রি থাকব। নমস্কার।" অমিয়াংশু নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

পুরনো বাড়ির সিঁড়িতে আওয়াজ উঠল। নতুন জুতোর লাথি খেয়ে গোটা বাড়িটা কেঁপে উঠল মুহূর্তের জন্যে। ভয় পেয়ে স্নেহলতা দৃষ্টি ফেললেন দেওয়ালের দিকে। চার দেওয়ালের পলস্তারা সব ভেতর থেকে আলগা হ'য়ে আছে। সোনাকুঠির গোকুল সরকার মকদ্দমা জিততে পারেন নি, নইলে এত বড় কলঙ্ক কর্নেল বিশ্বাস রোডে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। উঁচু আদালতের মকদ্দমাটা যেন গোকুল সরকার জিততে পারেন তেমন একটা প্রার্থনা বিচারক ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন ক'রে দিয়ে স্নেহলতা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন ভাবছিলেন। এমন সময় রাহুল গুপ্ত বলল, "অনেক কথা আমার বলবার ছিল। বলতে এসেছিলাম আপনাকেই। আজ আর হ'ল না। অন্য একদিন আসব।" এই ব'লে রাহুল গুপ্ত স্নেহলতার পায়ের ধুলো নিল। নিয়ে ললিতাকে সে বলল, "এম-এ ক্লাসে ভর্তি হওয়ার কোন অসুবিধে নেই।" ধীরে ধীরে, সন্ত্রস্ত পদক্ষেপে ঘরের মেঝেটা অতিক্রম করল রাহুল। স্নেহলতা অপেক্ষা করতে লাগলেন সিঁড়ির দিক থেকে কোন আওয়াজ আসে কিনা। এল না। রাহুল গুপ্ত যেন সমাধির নৈঃশব্দ্য ফেলে রেখে গেল এইখানে। ছেলেটির মধ্যে জীবনের অভাব দেখলেন স্নেহলতা। মনে হ'ল, শতাব্দীর সমুদয় লাঞ্ছনা বুঝি ওর জীবনের ওপর চেপে বসেছে। বিস্মিত বোধ করলেন তিনি। মনে মনে একরকম ঠিকও ক'রে ফেললেন, এই ছেলেটিই ললিতার বি-এ পড়ার খরচ চালিয়েছে। পরীক্ষার ফী-ও যুগিয়েছে রাহুল গুপ্ত।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন স্নেহলতা। ললিতা জিজ্ঞাসা করল, "কিছু বললে না তো মা?"

"কি বলব? দেখলুম তো সবই।"

আর কোন কথা হ'ল না। কোথা থেকে শ্রান্তির প্লাবন এসে ঢুকে পড়ল ঘরখানাতে। তক্তাপোশের ওপর এলিয়ে পড়ল ললিতা। স্নেহলতাও নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন। চন্দন পর্যন্ত বাইবে বেরুতে চাইল না। সে বলল, "আজ আর বিনোদ বস্তির রোয়াকে যাব না। তোমার পাশে শুয়ে পড়ি দিদি?"

সুবোধবাবুর বাড়ি ফিরতে আজ সন্ধে পার হ'য়ে গেল। পোস্ট অফিসের কাজ সহজে শেষ হ'তে চায় না। প্রত্যেক দিনই কাজের চাপ বেড়ে চলেছে। ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ যে নেই তা নয়। বিশ বছর কাজ করবার পর ফাঁকি দেওয়ার রাস্তাগুলো সবই তিনি দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু মাইনে এত কম পান যে, ফাঁকি দিতে ইচ্ছে করে না। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কত সহজেই না সুবোধবাবু আধঘণ্টা কি একঘণ্টা আগে বেরিয়ে পড়তে পারেন। বিশ ত্রিশটা ইন্‌সিওর চিঠি সিন্দুকের মধ্যে দু' একদিন ফেলে রাখলেও কারো কাছেই তাঁর জবাবদিহি করতে হবে না। হাজার রকমের অজুহাত তাঁর জানা আছে। কিন্তু মাইনে এত কম যে, অজুহাত দেওয়ার মজুরি পোষায় না। বেশি মাইনের অফিসারদের পোষায়। একঘণ্টা আগে বেরিয়ে এসে সুবোধবাবু কি করবেন? অফিসাররা টিকিট কেটে সিনেমায় গিয়ে বসবেন। দামী দামী বসবার জায়গা কলকাতায় তো কম নেই। সেই জন্যেই বোধ হয় সুবোধবাবু লোভ করেন না। কর্তব্য কাজে অবহেলা দেখাতে গেলে নৈতিক যুক্তি মনের মধ্যে খোঁচা মারতে থাকে। কী হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যেই না তিনি আবদ্ধ হ'য়ে আছেন! বিংশ

শতাব্দীর অর্ধেকটা পার হ'য়ে এলেন, তবু তিনি নীতি-দুর্নীতির কুসংস্কার থেকে মুক্তি পেলেন না।

অফিস থেকে বেরুতে তাই তাঁর দেরি হ'য়ে গেল। একখানা ইন্‌সিওর চিঠিও সিন্দুকে প'ড়ে রইল না। ডেস্‌প্যাচ খাতায় সব তুলে দিয়ে গেলেন। আগামীকাল বিলি হ'য়ে যাবে সব।

পার্কসার্কাসের ট্রামে চেপে বসলেন সুবোধবাবু। পুরো মাসের ভাড়ার কুপন তো তাঁর কেনাই আছে। শুধু বড় পোস্ট অফিসে পৌঁছবার এবং বাড়ি ফেরবার দু'খানা কুপন তিনি সঙ্গে নিয়ে আসেন। এই ধরা-বাঁধা রাস্তার বাইরে কোথাও যেতে হ'লে সুবোধবাবুকে হিসেব করতে হয়। হিসেবের অঙ্ক এত ছোট হ'য়ে ওঠে যে, পরের দিন বাজারে গিয়ে চার পয়সার নটেশাক তিনি আর কিনে উঠতে পারেন না। স্নেহলতার কাছে এসে বলেন, "রোজ রোজ কি কাঁচা জঙ্গল চিবতে ভাল লাগে?" ভাল লাগে না। লাগতে পারে না। ঘাস চিবিয়ে চিবিয়ে সুস্থ মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। খুব ভোরে উঠেই সুবোধবাবু চ'লে যান পার্কসার্কাসের বাজারে। বাজার করবার থলিটা ঝুলিয়ে নেন হাতে। থলিটা বেশ বড়। পাঁচ সাত টাকার সওদা অনায়াসেই থলির গহ্বরে ঢুকিয়ে ফেলা যায়। আট দশ আনার সওদা কেনবার জন্যে এত বড় থলি তিনি না কিনলেও পারতেন। তবুও তাঁকে বড় থলি কিনতে হয়েছে। সুবোধবাবুর ধারণা, কর্নেল বিশ্বাস রোডের সবগুলো ফ্ল্যাটের কেউ না কেউ তাঁর থলির দিকে চেয়ে থাকে। ছোট থলি দেখলে এরা নিশ্চয়ই সুবোধবাবুর দরিদ্রতার মধ্যে ঠাট্টার খোরাক পেত। তিনি জানেন, মানুষের নির্ধনত্ব ঠাট্টার বিষয় নয়। কিন্তু কর্নেল বিশ্বাস রোডের বড়-লোকদের তিনি বিশ্বাস করেন না। তাই তিনি নিজের দারিদ্র্য লুকিয়ে রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। পনেরো বছর আগে

এমন ধরনের লুকোচুরি করবার প্রয়োজন ছিল না তাঁর। পার্ক-সার্কাসের বাজারে ঢুকেও সুবোধবাবুকে লুকোচুরির আশ্রয় নিতে হয়। বিনোদ বক্সির চাকরটাকে ভয় পান তিনি। লোকটা হাতের মুঠোয় টাকা রাখে। পোনামাছের ল্যাজের মত ওর হাতের মুঠোর ফাঁক দিয়ে নোটগুলো বেরিয়ে পড়ে। মেছোদের সঙ্গে দরদস্তুর করে না। দু' চারদিন নটেশাক কেনবার সময় লোকটা তাঁকে দেখে ফেলেছে। সুবোধবাবুর মনে হয়েছে, লোকটা বোধ হয় মনে মনে হাসছে। তাই তিনি বাজারে যান খুব ভোরে। কোনো চেনা লোক চোখে পড়বার আগে প্রতি-দিনকার নটেশাক কেনা শেষ করেন তিনি। দারিদ্র্যের লজ্জা শুধু নিজের সংসারেই সীমাবদ্ধ নেই, জীবনের সর্বক্ষেত্রে লজ্জার কাঁটা সুবোধবাবুকে বেঁধে। বিনোদ বক্সির দৃষ্টি থেকে গোপন থাকে না কিছুই। বোধ হয় সুবোধবাবুর কোন দোষ নেই। প্রতি মুহূর্তে চিত্তভ্রংশ হচ্ছে তাঁর। নৈতিক মৃত্যু ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব হ'য়ে উঠছে। এমন মৃত্যুর জন্যে নিজে তিনি দায়ী নন। বোধ হয় সমাজব্যবস্থাকে দায়ী করা চলে। বিনোদ বক্সিদের দোষ তিনি দেবেন না। এঁদের নিষ্ঠুর মানসিকতা গ'ড়ে তুলেছে সমাজব্যবস্থাই। ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশে ব'সে সুবোধবাবু পৃথিবীর সবরকম ব্যবস্থার মূলে আগুন লাগাতে চাইলেন। আধ-পোড়া সিগারেটের অংশটুকু ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরলেন তিনি। তারপর মনে পড়ল যে, নয়া রাষ্ট্রের আইন অনুসারে এখানে ব'সে ধূমপান করা চলবে না। দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে .অতঃপর তিনি কান খোঁচাতে লাগলেন।

একটু রাতই হ'য়ে গেল বাড়ি ফিরতে। শুধু অফিসের কর্তব্য শেষ করবার জন্যেই যে তিনি আজ দেরি ক'রে বাড়ি ফিরছেন তা নয়। ললিতা বি-এ পাস করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

হওয়ার আলোচনা তো তিনি নিজের কানেই শুনে এসেছেন। মেয়েকে এম-এ পড়াবার মত আর্থিক সামর্থ্য তাঁর নেই। বি-এ পড়াবার মত সামর্থ্যও সুবোধবাবুর ছিল না। ললিতা তবুও বি-এ পাস করল। পরের কাছ থেকে সাহায্য না পেলে এমন ঘটনা ঘটতে পারত না। সবই তিনি বোঝেন, অথচ প্রত্যক্ষ স্বীকৃতির মধ্যে দুর্নীতির প্রমাণ পান তিনি। ঘটনা সব গিলে যাচ্ছেন সুবোধবাবু, অথচ হজম করতে পারছেন না। ললিতাকে সামনে দেখতে পেলে সহসা তিনি দুর্বল হ'য়ে পড়েন। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। সুবোধবাবু জানেন, ললিতা এম-এ পড়বে। আরো দুটো বছর চোখ বুজে কাটিয়ে দিতে হবে তাঁকে। সব কিছু জেনেশুনেও তাঁকে বলতে হবে, তিনি কিছুই জানেন না, কিছুই শোনেন নি। তাঁর পক্ষে রাত ক'রে বাড়ি ফেরাই ভাল। দু'টো বছর লুকিয়ে থাকতে পারলে বেঁচে যেতেন তিনি। মেয়ের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াবার বিড়ম্বনা তাঁর কাটতো। কিন্তু তেমন সুযোগ তিনি পাবেন না। অতএব রাত ক'রে বাড়ি ফেরবার কৌশল অবলম্বন করাই ভাল। পোস্ট অফিসে ব'সে বরাদ্দ কাজের চেয়েও বেশি কাজ করলেন তিনি। সুবোধবাবু জানেন, ওপর-ওয়ালারা তাতে বিন্দুমাত্রও সন্তুষ্ট হবেন না। আট আনা মাইনেও তাঁর বাড়বে না। তা হোক। স্নেহলতা বুঝবেন, স্বামী তাঁর পরিশ্রান্ত। এতবড় কর্তব্যপরায়ণ মানুষটির কাছে স্নেহলতা এম-এ পড়ার আলোচনা তুলতে আর সাহস পাবেন না। ট্রাম থেকে নেমে সুবোধবাবু তারক দত্ত রোড পর্যন্ত হেঁটে এলেন। মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। সামনের দিকে মুখ তুলে চাইতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। এ কি দৃশ্য দেখছেন সুবোধবাবু?

মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। এগিয়ে যেতে হ'ল। বিনোদ বক্সির রোয়াকের সামনে ভিড় জমেছে। ছেলেরা

সব ডাক্তার বিকাশ ঘোষকে ঘিরে ধরেছে। রোয়াকে দাঁড়িয়ে বিনোদ বক্সি আমোদ উপভোগ করছিলেন। ছেলেরা সব হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিকাশ ডাক্তারের দিকে। দিয়ে বলছে, "আমাদের জ্বর এসেছে। দেখুন তো ডাক্তারবাবু।" ঝাউতলা রোডের মুন্সীদের ছোট ছেলেটা গায়ের গেঞ্জি ওপর দিকে টেনে তুলে বলতে লাগল, "আমার ব্যারাম বোধ হয় বুকে। ও ডাক্তারবাবু, রবারের নলটা একবার বা'র করুন না। কলকাতার সবচেয়ে বড় ডাক্তার তো আপনিই—"

হি-হি ক'রে হাসতে লাগল ছেলের দল। ব্যথা পেলেন সুবোধবাবু। তিনি যেন দেখতে পেলেন, সারা পৃথিবী জুড়ে অসহায় মানুষদের নিয়ে ঠাট্টার হুল্লোড় চলেছে। মানুষের অসহায়তা কি ঠাট্টার বস্তু? রোয়াকের সংখ্যা বাড়তে লাগল। ভাগ্যবানদের বাড়ির সামনে বড় বড় রোয়াক। রোয়াকের জন্ম একদিনে হয় নি। কয়েকটা শতাব্দীর পাপের সিমেণ্ট দিয়ে রোয়াকগুলোকে তৈরি করতে হয়েছে। দোষ ছেলেদের নয়। দোষ সব বিনোদ বক্সির। বহু শতাব্দীর সঞ্চিত পাপের প্রতিক্রিয়া তিনি দেখতে পেলেন রোয়াকের চারদিকে। কচি কচি ছেলেগুলো প্রতিক্রিয়ার প্রতীক। প্রতীকের মধ্যে অসন্তোষ এবং প্রতিবাদের চিহ্ন স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। তাঁর পশ্চাদ্‌দৃষ্টির কোথাও আর বিন্দুমাত্র কুয়াশা রইল না। তিনি এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন বিনোদ বক্সির রোয়াকের সামনে। বিকাশ ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে চোখ তাঁর ভিজে উঠল। ভিড়ের মাঝখানে ঢুকে পড়লেন সুবোধবাবু। বললেন তিনি, "ছি, ছি—ডাক্তারবাবুর পথ 'ছেড়ে দাও।"

পথ পেলেন ডাক্তার বিকাশ ঘোষ। জীবনসংগ্রামে পরাজিত মানুষ মাথা নিচু ক'রে বেরিয়ে গেল সরু পথ দিয়ে। •

রোয়াক থেকে নেমে এলেন বিনোদ বক্সি। বললেন তিনি, "নমস্কার, সুবোধবাবু।"

"নমস্কার।" দাঁড়াবার আর ইচ্ছে ছিল না সুবোধ মিত্রের।

বিনোদ বক্সি তাঁর পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "আজ আমি নিজেই গিয়েছিলুম বিকাশ ডাক্তারের চেম্বারে। ছ'মাসের ভাড়া বাকী পড়েছে। একটা পয়সাও আদায় হ'ল না। আপনি বোধ হয় জানেন না যে, ও-বাড়িটা আমি কিনে নিয়েছি।"

"জানি।" এই ব'লে সুবোধবাবু পাশ কাটাবার চেষ্টা করলেন।

"একটু দাঁড়ান—" বিনোদ বক্সির সুরে আদেশের স্পর্ধা।

আধ-পোড়া সিগারেটটা খুঁজতে খুঁজতে সুবোধবাবু বললেন, "স্বাধীন ভারতবর্ষে আইন-আদালতের সুবিধে অনেক বেড়েছে। আর আপনি নিজেই তো আইন পরিষদের সভ্য—বিকাশ ডাক্তারকে উঠিয়ে দিতে আর ক'দিনই বা লাগবে। আইন সব আপনাদের দিকেই।"

ধাক্কা খেলেন বিনোদ বক্সি। তিনি রাজনীতিজ্ঞ। গায়ের চামড়া মোটা না হ'লে কেউ রাজনীতি-খেলায় যোগ দিতে আসে না। তাই তিনি এবার সদাশয় ব্যক্তির মত হাসতে হাসতে বললেন, "আপনার তো অভিযোগ করবার কোন কারণ নেই। আপনি কি আমায় ভোট দিয়েছিলেন?"

"না—" আধ-পোড়া সিগারেটটা ধরাতে দু'টো কাঠি খরচ করলেন সুবোধবাবু, "সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে খুব কম লোকই আপনাদের ভোট দিয়েছে।"

খবরটা বিনোদ বক্সিরও অজানা ছিল না। তবুও তিনি হাল্কা রসিকতার সুরে বললেন, "সরকারী কর্মচারীদের মনস্তত্ত্ব বোঝা মুশকিল। শুনেছি ইংরেজ-শাসনের শেষের দিকে অনেক খয়ের খাঁ-ও নাকি কংগ্রেসকে সাহায্য করত।"

"আজ্ঞে, আপনি ঠিকই শুনেছেন। যে-কোন শাসন খতম হওয়ার এটাই তো পূর্বাভাস।"

"বটে ?"

"আমার তো সেই রকমই ধারণা। নমস্কার।"

সুবোধবাবু চ'লেই যাচ্ছিলেন। বিনোদ বক্সি দু'পা এগিয়ে গিয়ে আবার তাঁকে ডাকলেন। "এই দেখুন, আসল কথাটাই আপনাকে বলা হয় নি। আজ আমি আপনার ওখানেই গিয়েছিলুম। পাড়ায় থাকেন, অথচ—" একটু হেসে বিনোদ বক্সিই আবার বললেন, "আপনার মেয়ে ললিতার সঙ্গে এই গলির মধ্যেই দেখা হ'য়ে গেল। দেখলুম সাহেবী পোশাক-পরা একজন ভদ্রলোক রয়েছেন। তাঁরই সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল ললিতা। এপাড়ায় আগে কখনো দেখি নি—নাম শুনলুম অমিয়াংশু সেন।"

"হ্যাঁ, আমাদের অফিসার, কিন্তু—" একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে সুবোধবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি আমাদের সব খবরই রাখেন ?"

"রাখতে হয় সুবোধবাবু। এ অঞ্চলের আমি এম-এল-এ কিনা। চোখ বুঁজে থাকি কি ক'রে ? রোয়াকের ছেলেরাও সেনসাহেবকে দেখেছে। আচ্ছা, আচ্ছা নমস্কার। পরে আবার দেখা হবে।"

বিনোদ বক্সির কথা শেষ হওয়ার আগে সুবোধবাবু ঢুকে পড়লেন কর্নেল বিশ্বাস রোডে। বাড়ি পৌঁছতে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। দেহ-মনের ওপরে তাঁরও যেন শ্রান্তির বোঝা চেপেছে। হঠাৎ তিনি ভাবলেন, মানবসমাজের বড় অংশটাও বোধ হয় তাঁরই মত নিরাশার গহ্বর ছাড়া সামনে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এ কেমন ক'রে হ'ল ? কেন হ'ল ? মানবসমাজের ইতিহাস তাঁর জানা নেই। তবুও ইতিহাসের অস্পষ্ট গলিটার দিকেই দৃষ্টি ফেললেন

সুবোধবাবু। তিনি দেখলেন, কোন্ এক শতাব্দীর মুখে এসে মানুষের সবটুকু প্রগতি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। মানবশিশু বোধ হয় আজও তাই সাবালক হ'তে পারল না। ইতিহাস না প'ড়ে ভালই করেছেন সুবোধবাবু। পড়লে জটিলতা আরও বাড়ত। সত্য মিথ্যা খুঁজে বা'র করতে পারতেন না। বাড়ির সামনে এসে পোঁছে গেলেন সুবোধবাবু। একতলার ডানদিকের ফ্ল্যাটে উকীল-বাবু থাকেন। এখনো বোধ হয় তিনি বাড়ি ফেরেন নি। কোন ঘরেই আলো নেই। আয় কম ব'লেই খরচের দিকে সতর্ক নজর রাখতে হয় তাঁকে। সন্ধের পর ছেলে দু'টি রান্নাঘরে চ'লে আসে বইখাতা নিয়ে। একই আলোর তলায় ব'সে উকীলবাবুর স্ত্রী ভাত সেদ্ধ করেন, ছেলেরাও পরের দিনের পাঠ তৈরি করে। অন্য ঘরের আলো জ্বালতে হয় না। এত কম খরচায় স্নেহলতাও পারেন নি দু'টো বড় কাজ শেষ করতে। শেষ করা তো দূরের কথা, শুরুই বা করলেন কই?

"কে? ও, সুবোধবাবু—আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম।" দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন উকীলবাবু।

"অন্ধকার দেখে ভেবেছিলুম আপনি বোধ হয় ফেরেন নি। কি খবর, বলুন।"

"খবর ভাল নয়। হাইকোর্টে গোকুল সরকার আপীল করে-ছিল। এবার বোধ হয় সে জিতবে।"

"জিতবে? কি ক'রে জিতবে?" সুবোধবাবু দেখলেন সিঁড়ির তলার অন্ধকার ঘনতর হ'ল।

"জিতবে আদালতের আইন অনুসারেই—" উকীলবাবু একটু ভেবে নিয়ে পুনরায় বললেন, "সঙ্ঘবদ্ধ না হ'লে আমরা কোনদিনই জিততে পারব না। আমাদের হাতে আর কোন অস্ত্র নেই।"

"তবে আমরা স্বাধীন হলুম কেন ?"

"কবে হলুম ? কখন্ হলুম ? প্রমাণ করুন। পরোক্ষ প্রমাণ আমি বিশ্বাস করব না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই—" উকীলবাবু যেন প্রমাণ খোঁজবার জন্যে রাস্তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। রাস্তার আলো এসে পড়ল তাঁর মুখের ওপর। সুবোধবাবু দেখলেন, কানের দু' পাশ দিয়ে তাঁর স্রোতের মত ঘাম বেরুচ্ছে। ভোরবেলার ঘাম যেন এখনো তাজা রয়েছে। এ ঘাম বোধ হয় শুকবে না, শুকতে পারে না, ভাবলেন সুবোধবাবু। তারপর তিনি বললেন, "তা হ'লে তো মুশকিলেই পড়তে হবে—"

"হ্যাঁ। এখন থেকেই বাড়িঘর খুঁজতে থাকুন। পাঁচ-দশটা মোহর থাকলে ব্যারিস্টার রাখতে পারতুম। যাঁকে রেখেছি তাঁর অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। অ্যাডভোকেট তিনি। শুনলুম, আইন দেখবার আগে জজসাহেব তাঁর মুখ দেখেন—"

"মুখে কি আছে তাঁর ?"

"কিছুই নেই। প্রোটিন, ভাইটামিন, কিংবা আয়োডিনের গন্ধ পর্যন্ত নেই। কি বলব মশাই, নতুন আইনের খবর রাখেন না, পুরনোগুলো তো ভুলেই গেছেন। চোখে ভাল দেখতে পান না, কানেও কম শোনেন। আপনার মত সেদিন আমিও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললুম যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। নতুন নতুন আইন হয়েছে। সব শুনে তিনি আমায় কি বললেন, জানেন ?"

"না।"

"বললেন যে, মশাই ডাক্তারের কাছে যান। আপনার নিশ্চয়ই ডিলিরিয়াম। সুবোধবাবু, এখন থেকেই বাড়ি খুঁজতে থাকুন। পরে বলবেন না যেন যে সময়মত আপনাদের জানাই নি কেন।" একটু থেমে উকীলবাবুই আবার বললেন, "আপনি তো সমুদ্র সাঁতরে পার হ'য়ে এলেন। হাতের কাছেই ডাঙা। শুনলুম,

ললিতা বি-এ পাস করেছে। দেখতেও মেয়েটা ভাল। চাকরি পেয়ে যাবে। আমার মশাই, দু'টো হ'ল, দু'টোই ছেলে।"

"ভাবছি, ললিতার বিয়ে দিয়ে দেব।" প্রথম সিঁড়িতে উঠে পড়লেন সুবোধ মিত্র। উকীলবাবু এগিয়ে এসে বলতে লাগলেন, "আপনি কেরাণী, না উন্মাদ? বিয়ে দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এমন সর্বনাশের কথা আজকাল কেউ ভাবতে পারে না কি? মশাই, বিয়ে দিলে আপনার কি সুবিধে হবে? বি-এ পাস মেয়ে মাইনে যা পাবে সবই নিয়ে নেবে স্বামী। উল্টো, ট্রামের পয়সা খরচ ক'রে মাঝে মাঝে যেতে হবে মেয়েকে দেখতে স্বামীর বাড়ি। না, না, এমন কাজ করবেন না। চললেন?"

"আর কিছু বলবেন?" সিঁড়ির ওপরে উঠে গিয়েছিলেন সুবোধবাবু।

"তা হ'লে সময় থাকতে বাড়িঘরের খোঁজ করুন। আইন আদালতের ওপর আর নির্ভর করা চলবে না।" এই ব'লে উকীলবাবু ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

সিঁড়িতে আলো নেই। কোনদিনই ছিল না। অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে রইলেন সুবোধ মিত্র। জীবনযাপনের ক্লান্তি ক্রমশই ঘনতর হচ্ছে। মাসিক হাজার টাকা মাইনে পেলেই কি ক্লান্তি তাঁর কাটতো? অফিসের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট বোসসাহেব তো লম্বা মাইনেই পান। কখনো-সখনো তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় সুবোধবাবুর। অফিস ছুটির পরে বোসসাহেবও বাড়ি ফিরে যেতে চান না। কোন কোন দিন রাত আটটার পরেও ব'সে থাকবার ইচ্ছা হয় তাঁর। সঙ্গ দেওয়ার জন্যে আটকে থাকতে হয় সুবোধবাবুকেও। তিনি লক্ষ্য করেছেন, কাজের প্রতি মনোযোগ নেই বোসসাহেবের। ক্লান্তি দূর করবার জন্যে পা ছড়িয়ে ব'সে

থাকেন তিনি। সেদিন সুবোধবাবু তাঁকে বলেছিলেন, "প্রায় আটটা বাজে সার।"

"মাত্র আটটা?" যেন চমকে উঠলেন বোসসাহেব।

"বাকী কাজ সার কালই না হয় শেষ করবেন।"

"তুমি বুঝতে পার নি সুবোধ। কাজ না করবার ক্লান্তি আমায় পেয়ে বসেছে। কেন কাজ করব? কার জন্যে করব? কাজের প্রতি ভালবাসা নেই আমার।"

বোসসাহেবের কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়। ভালবাসার অভাবটা মস্ত অভাব। একটু আগেই তো সুবোধবাবু শুনলেন, আইন আদালতের ওপর আর নির্ভর করা চলবে না। প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে উকীলবাবুর চোখে। তিনি জানতে চাইলেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল কবে। প্রশ্নটা মৌলিক। জীবনের মধ্যে এর জবাব খুঁজতে হবে। নির্ভরতার সন্তুষ্টি যদি না আসে তা হ'লে বুঝতে হবে, স্বাধীনতা-বলাকাও রোয়াকের বাইরে ডানা মেলতে পারে নি। ব্যাপ্তির অভাবে ব্যর্থ হ'ল সব। দল যত বড়ই হোক, ইতিহাসের গতিকে পেছন দিকে ঠেলে নেওয়া যায় না। প্রতিক্রিয়াশীলতার বাঁধন ভাঙবেই। এই ভেবে সুবোধবাবু দরজায় টোকা মারলেন। তারপর ক্লান্ত সুরে ডাকতে লাগলেন তিনি, "চন্দন, চন্দন—দরজাটা খোল্ বাবা।"

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে ললিতা। অর্থবিদ্যা নিয়েই এম-এ পড়তে আরম্ভ করল। মাস দুই যাওয়া-আসা করবার পরে জ্ঞান অর্জনের প্রতি ওর আর উৎসাহ রইল না। ডিগ্রীটা সংগ্রহ করতে পারলেই চারতলা অট্টালিকার ধারে-কাছেও আর সে আসবে না। ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকলেই যেন দম আটকে আসে। বাড়িটার মধ্যে বিস্তৃতি নেই—সব কিছুই যেন চাপা। জানলা দরজা এবং ঘরের গঠন থেকে মনে হয়, কাউকে এখানে ধ'রে রাখবার জন্যে ডাকা হয় না। আহ্বানের মধ্যে আলিঙ্গনের আত্মীয়তা নেই। সিনেমা-হাউসের মত ছেলেমেয়েরা এখানে আসে কয়েক ঘণ্টার জন্যে। আমোদের মেয়াদ ফুরলেই আবার তাদের বেরিয়ে যেতে হয়। টিকিট না কাটলে এইটুকু আমোদও এরা উপভোগ করতে পারত না। ললিতাকেও টিকিট কাটতে হয়েছে। কাটছে গত দু' মাস থেকেই।

টিকিটের টাকা যে সে রাহুলের কাছ থেকে পাচ্ছে তা আর কারো অজানা নেই। স্নেহলতা জানেন। সুবোধবাবু জেনেও যেন জানেন না। অমিয়াংশু তো সেদিন টাকার চেয়েও বড় ব্যাপার দেখতে পেয়েছে। রাহুল শুধু ললিতাকে টাকা দেয় না, ভালবাসাও দেয়। অমিয়াংশু খুবই বিপদে পড়েছে। বড় চাকরি নিয়ে সে দিল্লীতে গিয়ে বসতে পারছে না। অথচ পোস্ট অফিসের চাকরিটাও খুব ছোট মনে হচ্ছে। রাহুলকে দেখবার পরে নিজেকে এত বেশি ছোট মনে হচ্ছে যে, অমিয়াংশু ছুটি নিয়ে ব'সে রইল হোটেলে। এমনকি চিঠি ফেলবার জন্যেও পোস্ট অফিসে গেল না। রাস্তার ধারে লাল রং-এর ডাক-বাক্সটা সেদিন চোখে পড়তেই সে উল্টো দিকে ঘুরে দাঁড়াল। হাঁটতে লাগল

পার্ক স্ট্রীটের দিকে। শেষ পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলো এসে কর্নেল বিশ্বাস রোডে। পকেটের চিঠি ডাক-বাক্সে ফেলা হ'ল না। বড়বৌদি কি ভাবছেন কে জানে। চাকরিতে এখনো সে ইস্তফা দেয় নি ব'লে বড়বৌদি তাকে সন্দেহ করছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন যে, চাকরি ছাড়া অন্য কোনো রকম ব্যাপারের সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়েছে কি না। বৌদিরা সবাই অমিয়াংশুর জন্যে চিন্তিত। বড়বৌদির চিঠিখানা সে বার কয়েক পড়েছে। তিনি অমিয়াংশুকে সতর্ক ক'রে লিখেছেন : ঠাকুরপো, যদি কাউকে তুমি ভালবেসে থাকো আমরা তাতে খুশীই হবো। কিন্তু আমাদের পারিবারিক মর্যাদা যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেদিকে তোমায় দৃষ্টি রেখে ভালবাসতে হবে। আমাদের চেয়ে বড় কিংবা সমান ঘরের মেয়ে যদি হয় আমরা কেউ আপত্তি করব না।

জবাবটা তক্ষুনি লিখে ফেলেছিল অমিয়াংশু। ডাক-বাক্সে ফেলা হয় নি। চিঠিখানা পকেটে নিয়ে আজ দু'দিন থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। বৌদির প্রশ্নের স্পষ্ট কোন জবাব সে লেখে নি। শুধু লিখেছে : প্রতীক্ষায় থাকো।

বৌদিদের প্রতীক্ষায় রেখে অমিয়াংশু চ'লে এল কর্নেল বিশ্বাস রোডে। তারকদত্ত রোডের মোড়ে এসে পৌঁছতেই চন্দন ডাকল, "অমিয়দা—"

রোয়াকের দিকে বাধ্য হ'য়েই এগিয়ে গেল অমিয়াংশু। এত বড় একটা ছেলের দলকে উপেক্ষা করতে পারল না। উপেক্ষা করতে চাইল না সে। সুবোধবাবুর বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে হ'লে এদের সঙ্গে খাতির রাখতে হবে। খাতির ছাড়া কোথাও তো সে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করতে পারে না। সে কেন, কেউই পারে না। দিল্লীর রাজপথ আর তারক দত্ত রোডের মধ্যে তফাৎ নেই। সেখানকার রোয়াকে মন্ত্রী এবং এম-পিদের ভিড়।

এখানে শুধু বিনোদ বক্সি। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চন্দন বলল, "অমিয়দা, বিনোদবাবু এক্ষুনি আসবেন। ততক্ষণ তুমি ন্যাপাদার সঙ্গে আলাপ করো। ন্যাপাদা হচ্ছে গিয়ে সার্কাস রেঞ্জের লীডার। দু'খানা বেবী ট্যাক্সির লাইসেন্স পেয়েছে।"

ফিক ক'রে হেসে উঠল ন্যাপাদা। হাসতে হাসতে সে বলল, "শুনলুম, আপনি নাকি বিনোদদার রোয়াকটাকে গেরাস্থির মধ্যে আনতে চান না।" চন্দনের দিকে সহসা মুখ ঘুরিয়ে ন্যাপাদা জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁরে, তোর দিদি এখনো ফেরে নি?"

"ফিরেছে।" জবাব দিল চন্দন।

"কই দেখলুম না তো?"

"আজ দুপুরবেলাই ফিরে এসেছে।"

"আচ্ছা," ন্যাপাদা এবার অমিয়াংশুকে বলল, "যান, এবার আপনি বুক ফুলিয়ে চ'লে যান।"

পেছন থেকে হারু মুন্সী বলল, "ন্যাপাদা শুধু লাইসেন্স পায় না, দেয়ও।"

অমিয়াংশু এবার সত্যি সত্যি চ'লে যাচ্ছিল। ধমকানির সুরে ন্যাপাদা ব'লে উঠল, "এ কি রকম ব্যাভার মশাই? কিছু না দিয়েই চ'লে যাচ্ছেন যে?"

"কি চাই?" জিজ্ঞাসা করল অমিয়াংশু।

"সেলামী।" এই ব'লে ন্যাপাদা খপ্ ক'রে অমিয়াংশুর হাতটা চেপে ধ'রে বলল, "দিন। প্রায় এক কোয়ার্টার ফুঁকে দিয়েছেন—" অমিয়াংশুর হাত থেকে পোড়া সিগারেটটা বা'র ক'রে নিয়ে ন্যাপাদা বলল, "এই নে হারু, বিনোদদা আসবার আগে ফুঁকে নে। প্যাকেটটা বা'র করুন না মশাই—"

অমিয়াংশু কোটের পকেটে হাত ঢোকাবার আগে ন্যাপাদা তার নিজের হাত ঢুকিয়ে দিয়ে টেনে বা'র করল সোনার সিগারেট কেস।

হাসতে হাসতে বলল, "দাদা, ডুবে ডুবে শুধু একাই জল খাবেন? আমাদেরও পেসাদ দিন। ছ'টো নিলুম—" অমিয়াংশুর হাতে সিগারেট কেস ফিরিয়ে দিল ন্যাপাদা। তারপর ধীরে ধীরে অমিয়াংশু হেঁটে চ'লে এল চন্দনদের বাড়ি। অমিয়াংশু শুনতে পেল রোয়াকের ছেলেরা সব হো হো ক'রে হেসে উঠল। সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে অমিয়াংশু কান পেতে রাখল। ওর যেন মনে হ'ল, ওদের সঙ্গে সঙ্গে চন্দনও আজ হাসছে। জীবনের একটা অন্ধকার দিক বুঝি ওর সামনে ক্রমে ক্রমে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল অমিয়াংশু। চেনা জগতটার রূপ পাল্টাচ্ছে। রোয়াকের ছেলেগুলোই শুধু পরাঙ্গপুষ্ট জীব নয়, সে নিজেও তাই। একশো বছরের সুযোগ-সুবিধের রস টেনে টেনে সেন-পরিবার আজ এত সমৃদ্ধশালী হ'য়ে উঠেছে। বৌদির লেখা চিঠিখানা পকেট থেকে বা'র করল অমিয়াংশু। ছিঁড়ে ফেলল অবলীলাক্রমে। আজ আর ললিতার সঙ্গে দেখা করল না সে। বেরিয়ে এল বাইরে। চেষ্টা করল, বুক ফুলিয়ে রোয়াকের পাশ দিয়ে হেঁটে চ'লে যায়। পারল না। বুকের মধ্যে ছুর্বলতার বাষ্প। শেষ পর্যন্ত সে চ'লে গেল আহেরীপুকুরের দিকে, কর্নেল বিশ্বাস রোডের উল্টো মুখ দিয়ে।

আজ ক'দিন থেকে ললিতার মনে নানা রকমের প্রশ্ন জেগেছে। রাহুলকে কেন্দ্র ক'রে প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে অবিরত। রাহুলের কাছ থেকে অর্থসাহায্য না পেলে ওর বি-এ পড়া হ'তো না, পাস করাও হ'তো না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে তাও তো রাহুলের জন্যেই। ছু' মাস অতিবাহিত হওয়ার পরে ললিতা এখন ভাবছে রাহুলের কাছ থেকে টাকার সাহায্য আর না নেওয়াই উচিত। এতদিন যা স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল, এখন তা অস্বাভাবিক ঠেকছে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে ললিতা।

এসে অবধি শুয়ে রয়েছে সে। ভাবছে। আই-এ পড়বার সময় থেকেই রাহুলের সঙ্গে পরিচয় হয়। লেখাপড়ায় ভাল ছেলে ছিল সে। গোড়ার দিকে রাহুলের সুখ্যাতি অধ্যাপকদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। ওকে বাদ দিয়ে কলেজের সভাসমিতি চলতো না। বিতর্ক-সভায় রাহুলকে কেউ হারাতে পারত না। সাহিত্য-সভায় রাহুল স্ব-রচিত প্রবন্ধ পাঠ করত। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছেলেমেয়েরা ওর চারদিকে ব্যূহ রচনা করল। ক্রমে ক্রমে ললিতা ওকে ব্যূহ থেকে বা'র ক'রে নিয়ে এল। রাহুলকে ভালবাসল ললিতা। জনাকীর্ণ জীবনের নির্জনতম অংশটা খুঁজে বা'র করল ওরা। দু'জনের মনেই সৃষ্টি হ'ল ভালবাসার জগৎ। সেখানকার নির্জনতায় ডুবে রইল দু'জনেই। আই-এ পাস করবার পরে ললিতা একদিন বলল, "বি-এ বোধ হয় আর পড়া হ'ল না।"

"কেন?" জানতে চেয়েছিল রাহুল।

"বাবা যা মাইনে পান তা থেকে বি-এ পড়ার খরচ আর চলবে না। তা ছাড়া চন্দনকেও মানুষ ক'রে তুলতে হবে।"

"বি-এ তোমার পড়তেই হবে।" সামর্থ্যের প্রতিজ্ঞা ভেসে উঠল রাহুলের সুরে, "বাবার কাছ থেকে আমি যা হাত খরচ পাই তা থেকে তোমার বি-এ পড়ার খরচ কুলিয়ে যাবে।"

দ্বিধা করছিল ললিতা। এমন সময় রাহুল ঘোষণা করল, "এতে অন্যায় কিছু নেই। তোমায় আমি ভালবাসি, ললিতা। অতএব ন্যায়-অন্যায়ের সমস্যা সব মিটে গেল।"

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগে পর্যন্ত সত্যিই সমস্যা কিছু ছিল না। হাত পেতে ওর কাছ থেকে টাকা নিতে গিয়ে প্রতি-বারই ললিতা ভেবেছে, এই তো স্বাভাবিক। যাকে ভালবাসা যায় তার টাকায় কোন পাপ নেই। কিন্তু আজ ক'দিন থেকে ললিতার মনে হচ্ছে, স্বাভাবিকতার মাটিতে চিড় ধরেছে। মাটির

ওপর নির্ভয়ে দাঁড়ানো চলছে না। রাহুল গুপ্তের একটা লুকনো জগৎ সে এখনো দেখতে পায় নি।

গত দু' বছরের মধ্যে দেখা সম্ভবও হয় নি। ট্রামে, বাসে, কলেজের করিডোর কিংবা চা-এর দোকান ছাড়া ওরা দু'জন দাঁড়াবার কিংবা বসবার জায়গা পায় নি। ভালবাসা কথাটার অভিধানগত অর্থের বাইরে দু'টো জীবন ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেল কই? পাওয়ার জন্যে দু' একবার চেষ্টা করেছে ললিতা। কিন্তু রাহুলের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায় নি।

সন্ধে হ'য়ে এল। শুয়ে থাকতে আর ভাল লাগছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েও সবগুলো ক্লাশ সে করে নি আজ। মনের অশান্তি ললিতাকে বিচলিত ক'রে তুলেছে। বাড়ি ফেরবার মুখে হঠাৎ ওর মনে হয়েছে, নতুন লোকের সাহচর্য পেলে খানিকটা সুস্থ বোধ করত সে। হয়তো বাড়ি গিয়ে দেখবে অমিয়াংশু ব'সে রয়েছে। মানুষটি অদ্ভুত ধরনের। এক একবার মনে হয় অত্যন্ত ছেলেমানুষ। সংসারের ভালমন্দ এখনো দেখতে শেখে নি। গত দু' মাসের মধ্যে দু' তিনবার দেখা হয়েছে। প্রত্যেকবারই ললিতা ভেবেছে, অমিয়াংশুর সঙ্গে যেন অনেকদিনের পরিচয়। রাহুলের চেয়েও পুরনো বন্ধু সে। অমিয়াংশুর সঙ্গে সঙ্গে ললিতা বুঝি এরই মধ্যে দিল্লী থেকেও ঘুরে এল। দাদা-বৌদিদের এবং পৈতৃক বাড়িটাও দেখে এল যেন। কী সুন্দর বাড়ি-ঘর! শিক্ষার আলোয় যেন পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষ জ্বলজ্বল করছে। অভাব-অভিযোগের একবিন্দু অন্ধকার সে দেখতে পেল না। বিছানায় উঠে বসল ললিতা। কল্পনার উত্তাপে ঘেমেও উঠল। অমিয়াংশুর পাঁচখানা ঘর পর্যন্ত দেখে এল বুঝি! উদ্বৃত্ত ছাড়া আর তো কিছুই দেখতে পেল না। অমিয়াংশুর কথা মিথ্যে নয়। গত একশো বছর ধ'রে শুধু সুযোগ-সুবিধের ইট-সুরকি জ'মে উঠছে। ঘুরে ঘুরে ঘরগুলো

দেখতে লাগল ললিতা। পাতা উল্টে পড়তে লাগল ভারতবর্ষের ইতিহাস। রাহুলের অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছে কই? পাওয়া সম্ভবও নয়। কাছে এসেও রাহুল দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। টাকা দেওয়ার সময়েও সতর্ক থাকে যেন ছোঁয়াছুয়ি না হয়। অমিয়াংশু ঠিক উল্টো। দূরে থাকলেও মনে হয় কাছে এসেছে। টাকা দেয় না অমিয়াংশু, ললিতা তবু ভাবে, অমিয়াংশু ওকে লাখ টাকা দিয়ে ফেলেছে। নির্ভর করবার মত শক্ত মাটির স্পর্শ পায় ললিতা। উঠে পড়ল সে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালো একটু। অর্থ-বিদ্যার নোটবইখানা আজ আর ওর চোখে পড়ল না। বাংলা অভিধানটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। ভালবাসা কথাটার অর্থ কি? রাহুলের দেওয়া শাড়িটা তো ওর পরাই ছিল। বুকের ওপর হাত রাখল ললিতা। কথাটার অর্থ তবু হাতে ঠেকল না ওর।

সন্ধের দিকেই সুবোধবাবু আজ বাড়ি ফিরে এলেন। অফিসের জামা কাপড় বদলে প্রতিদিনকার মত আজও তিনি শুয়ে পড়লেন। খোঁজ নিলেন একবার চন্দন বাড়ি ফিরেছে কি না। স্নেহলতা বললেন, "এক্ষুনি ফিরে আসবে। বিনোদ বক্সির ওখানেই সে আছে।"

"হুঃ—খোঁজ নিয়ে লাভও নেই। কিছুই তো পাওয়া যাবে না।" সুবোধবাবু আধ-পোড়া সিগারেট একটা পেলেন। কাৎ হ'য়ে শুয়ে সিগারেট টানতে টানতে তিনি বললেন, "মানুষ সব সমাজ থেকে আলগা হ'য়ে গেছে। কাটা ঘাসের মত রোয়াকের ওপর প'ড়ে আছে—এখন শুকতে যতদিন সময় লাগে। ললিতা কই? সামনের ঘরটা তো অন্ধকার দেখলুম।"

"ললিতা আজ দুপুর বেলায়ই ফিরে এসেছে।" বললেন স্নেহলতা।

"কেন ?"

"বোধ হয় ক্লাশ ছিল না।"

সুবোধবাবু কি যেন ভাবলেন খানিকক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "অমিয়াংশু আসে না আজকাল ?"

"ক'দিন আগে একবার এসেছিল। পোস্ট অফিসের চাকরি কি সে ছেড়ে দিয়েছে ?"

"না, এখনো ছাড়ে নি। এক মাসের ছুটি নিয়েছে অমিয়াংশু। আমার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় নি। অমিয়াংশুকে কিরকম মনে হয় তোমার ?"

"আমার ?" ধাক্কা খেলেন স্নেহলতা, "তুমি বোধ হয় জিজ্ঞাসা করছ, ললিতার কিরকম মনে হয়। কিন্তু—" থেমে গেলেন স্নেহলতা। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পরে সুবোধবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হ'ল ? কথাটা শেষ করলে না তো ?"

"আমি রাহুল গুপ্তের কথা ভাবছি।"

"রাহুল গুপ্ত ? সে কে ?" উঠে বসলেন সুবোধবাবু, "এ শুধু দুর্নীতি নয় স্নেহ, এ পাপ—পরের টাকায় ললিতা বি-এ পাস করল—"

"বি-এ পাস করবার আগে তো কখনো তুমি এতটা বিচলিত হ'য়ে পড়ো নি ? পাপ যদি সত্যিই হ'য়ে থাকে তবে তো তা অনেকদিন থেকেই হচ্ছিল ? পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া কি পাপ নয় ?"

ও-পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন সুবোধবাবু। মুখ লুকতে হ'ল। আজ ক'দিন থেকে রোয়াকের ছেলেরাও তাঁকে দেখে হাসতে আরম্ভ করেছে। কেউ কিছু মন্তব্য প্রকাশ করে না বটে, কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন, ছেলেরা তাঁকে বিদ্রূপ করছে। তা সত্ত্বেও সুবোধবাবু মাথা উঁচু ক'রে ঢুকে পড়েন কর্নেল বিশ্বাস রোডে। অথচ স্ত্রীর

সামনে আজ তিনি মুখ তুলতে পারছেন না। নৈতিক সামর্থ্যের খুঁটিটা ভেঙে পড়ল। ভেঙে দিলেন স্নেহলতা। তিনি বলতে লাগলেন, "নীতি দুর্নীতির কথা বিচার করতে হ'লে আয়ের পরিমাণ বাড়াতে হয়। অভাবের সংসারে পাপ-পুণ্যের আলোচনা না হওয়াই ভাল।"

সুবোধবাবু জবাব দিলেন না। দেয়ালের সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে রাখলেন। ঠেকিয়ে রাখতে আরাম লাগছিল। ঘরে পাখা নেই। গতকাল তাপের মাত্রা একশো পাঁচ ডিগ্রী হয়েছিল। আজও নিশ্চয় সেই রকমই আছে। দেয়ালের ঠাণ্ডা মুখে লাগতে ভাল লাগছিল সুবোধবাবুর। গরম কিছু কম বোধ হচ্ছে। স্নেহলতা বুঝতে পারলেন তা। মনে মনে তিনি সুবোধবাবুকে তারিফ করেন খুব। একশো পাঁচ ডিগ্রীর উত্তাপ মাথায় নিয়েও ভদ্রলোক পাপ-পুণ্যের কথা ভাবতে পারেন!

সুবোধবাবু পাপ-পুণ্যের কথা আর ভাবছিলেন না। মনে মনে দুঃখ বোধ করছিলেন। পৃথিবীর কোনো রোয়াকের সঙ্গে স্নেহলতার যোগাযোগ নেই। অথচ একটু আগে তিনি যা বললেন তা তো রোয়াকের কথার মতই শোনালো। তবে কি চন্দনের মাকেও ওই বিষাক্ত বৃত্তটা গ্রাস ক'রে ফেলেছে?

আলোচনার পুরো অংশটাই ললিতা শুনেছে। দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল সে। ঘরে ঢুকে ললিতা এবার বলল, "বাবা, কাল একবার বিনোদবাবুর সঙ্গে দেখা করব ভাবছি। তুমি সঙ্গে গেলে ভাল হয়।"

"বিনোদ বক্সির কাছে তোর কি কাজ পড়ল?" ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলেন সুবোধবাবু।

"ভাবছি এম-এ আর পড়ব না। চাকরির চেষ্টা করব। বিনোদ-বাবুর একটা সার্টিফিকেট চাই।"

ভেতরে ভেতরে বেশিমাত্রায় ঘেমে উঠলেন সুবোধবাবু। দুর্নীতির দুঃখ ছাড়া অন্য একটা দুঃখও তাঁর ছিল। বি-এ-পাস ললিতা যে তাঁর চেয়ে বেশি মাইনের চাকরি পাবে তা তিনি জানতেন। মাসকাবারে সুবোধবাবু মাইনের পুরো টাকাটা তুলে দেন স্নেহলতার হাতে। নেওয়ার সময় টাকার অঙ্ক গুনে রাখেন তিনি। ললিতার মাইনের টাকাও গুনবেন স্নেহলতা। দৃশ্যটা কল্পনা করতে কোনদিনই ভাল লাগত না তাঁর। মেয়ের কাছে হেরে যাচ্ছেন ভেবে তিনি চেয়েছিলেন আই-এ পরীক্ষার পরে ললিতার বিয়ে দিয়ে দেবেন। কল্পনায় কতবার যে তিনি ললিতার বিয়ে দিয়েছেন ভেবে হাসি পেল সুবোধবাবুর। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, "চেষ্টা করলে আমার চেয়ে বড় চাকরিই পাবি। আমি ত্রিশ টাকায় জীবন সুরু করেছি। তুই করবি একশো ত্রিশে। বিনোদ বক্সি নিজে যদি চেষ্টা করেন তা হ'লে দু'শো ত্রিশে স্টার্ট পাওয়াও সহজ হবে।" ললিতা যেন সত্যি সত্যি দুশো ত্রিশে স্টার্ট পেয়ে গেছে ভেবে সুবোধবাবু ছটফট করতে লাগলেন। অপমানিত বোধ করতে লাগলেন তিনি। নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললেন। হাতের মুঠোর ফাঁক দিয়ে সিগারেটে টান মারলেন বার দুই। তারপর তিনিই আবার বললেন, "না, না, এক্ষুনি তোর চাকরির জোয়াল ঘাড়ে বাঁধবার দরকার নেই। বাবা তোর এখনও শক্ত সবল মানুষ। এম-এ পরীক্ষাটা ভাল ক'রে দে। অর্থবিদ্যার একটা ডিগ্রী থাকলে—" কথাটা শেষ না ক'রে তিনি দৃষ্টি ফেললেন স্নেহলতার দিকে। সুবোধবাবুর মনে হ'ল, স্নেহলতা হাসছে। ভেতরে ভেতরে আমোদ উপভোগ করছে। তবে কি রোয়াকের ছেলেদের মত স্নেহলতাও তাঁকে বিদ্রূপ করে? নিঃসন্দেহ হ'তে পারলেন না তিনি। স্নেহলতাকেও রোগে ধরেছে। অভাবের সংসারে পাপ-

পুণ্যের আলোচনা না হওয়াই উচিত—এমন কথা যখন সে বলতে পারল তখন আর তাকে বিশ্বাস করা চলে না। অভাবের সংসার ব'লেই তো পাপ-পুণ্যের বিচার-বোধ প্রখর হওয়া উচিত। ললিতাকে লক্ষ্য ক'রে সুবোধবাবু বললেন, "ভয় নেই, লেখাপড়া চালিয়ে যা। যাচ্ছিস? একটু দাঁড়া ললিতা, আসছে মাসের মাইনেটা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিস। ট্রাম আর টিফিনের জন্মে তোর কত ক'রে লাগে? টিফিন খাস কোথায়?"

জবাব দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না, ললিতা তবু ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "ক্যানটিনে।"

"ক্যানটিনে? সে কোথায়? ট্রামে চেপে যেতে আসতে হয় না কি? যাওয়া-আসার জন্মে ভাড়া লাগে কত?" হাঁপাতে লাগলেন সুবোধবাবু।

"ইউনিভারসিটির ভেতরেই ক্যানটিন আছে বাবা।"

"ওঃ—বেশ বেশ, আসছে মাসে টিফিন, ট্রাম আর মাইনের টাকা সব চেয়ে নিস। বুঝলি?"

ললিতা বোধ হয় বুঝতে পারল না। তাই সে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। বাধা দিলেন স্নেহলতা, দিয়ে বললেন, "তোর বাবা ঠিকই বলেছেন। মাসের প্রথম দিকে একটু মনে করিয়ে দিস মা। পোস্ট অফিসের কাজে সব চেয়ে দায়িত্ব বেশি। পরের টাকা নাড়া-চাড়া করতে হয় ওঁকে। উনি ভুলে যেতে পারেন—মানে, তোর মাইনে, টিফিন আর ট্রামের জন্মে টাকাটা চেয়ে নিস। যাচ্ছিস? একটু দাঁড়া—" এবার স্নেহলতা নিজেই উঠে পড়লেন। ললিতার পেছনে পেছনে ঘরের বাইরে গিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, "ললিতা, বিনোদ বক্সি শুধু এম-এল-এ নন, ধনী লোকও। সেই জন্যে তাঁকে শক্ত কাজের দায়িত্ব নিতে হয় না। তোর বাবা শুধু গরিব নন, কেরানীও। ইনসিওর চিঠির মধ্যে কি থাকে জানিস মা? টাকা,

পরের টাকা। ভারতবর্ষের যে-কোনো মন্ত্রীর চেয়েও তোর বাবার দায়িত্ব অনেক বেশি। অ-নে-ক—” গলা ভিজে এল স্নেহলতার।

মর্যাদার ময়ূর-সিংহাসন তৈরি করা থাকে না, তৈরি ক'রে নিতে হয়।

পরের দিন ললিতার সঙ্গে রাহুলের দেখা করবার কথা ছিল। ললিতা বলেছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যানটিনে সে ওর জন্যে অপেক্ষা করবে। অপেক্ষা করছিল সে বেলা একটা থেকে। বই-খাতা আজ আর সে সঙ্গে নিয়ে আসে নি। মনে মনে সে ঠিক ক'রে রেখেছিল রাহুলকে নিয়ে বেড়াতে বেরুবে। গঙ্গার ধারে কিংবা লেক অঞ্চলের দিকে কোথাও গিয়ে ব'সে গল্প করবে। একটু নিরিবিলি জায়গা পেলে মন্দ হয় না। ক'দিন থেকে নির্জন পরিবেশের প্রতি লোভ বেড়েছে ললিতার। গত ফাল্গুনে উনিশ বছর পার হ'ল সে। অভাব-অভিযোগের সমুদ্রে ও যেন একখণ্ড হিমশৈলের মত এতকাল ভেসে বেড়াচ্ছিল। সমুদ্রের জল এবার গরম হচ্ছে। ভাসমান হিমশৈলটি গলতে আরম্ভ করেছে। অমিয়াংশু আসবার পর থেকে উত্তাপের স্পর্শ পাচ্ছে ললিতা। সেই জন্যেই ওর ভয় এসেছে মনে। রাহুলের দিকে ঝুঁকে বসতে না পারলে ললিতা ভরসা পাচ্ছে না। রাহুলকে এবার শক্ত হ'তে হবে। অমিয়াংশু শুধু শক্তিশালী নয়, লোভীও। রাহুলের লোভ অমিয়াংশুর চেয়ে দ্বিগুণ হওয়া চাই। রাহুল বি-এ পরীক্ষা দিক বা না দিক ললিতার তাতে ভাবনা নেই কিছু। রাহুল মানুষ হোক, পুরুষ মানুষ—আদিম অরণ্যের রহস্য এবং বলিষ্ঠতা নিয়ে সে এসে দাঁড়াক ললিতার গা ঘেঁষে; অপেক্ষা করুক, অনুভব করুক; দারিদ্র্যের দুর্বলতা ওর ঘুচিয়ে দিক রাহুল। অমিয়াংশুর উপস্থিতি ললিতার মনে বিপ্লব এনেছে। বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ ললিতা

অনুভব করছে সারাদেহের মধ্যে। অর্থবিজ্ঞান পুড়ল। রাত্রে স্বপ্ন দেখল, বিশ্ববিদ্যালয় আর কর্নেল বিশ্বাস রোডের বুকের ওপর ঘাস গজিয়েছে। কাঁচা জঙ্গলের গন্ধ পেয়েছে ললিতা। স্বাদ পেয়েছে স্বাস্থ্যের।

ক্যানটিনে ছেলেমেয়েদের ভিড়। একটা কোনার দিকে ললিতা ব'সে ছিল একা। টিফিন খাওয়ার দরকার ছিল না। এক পেয়ালা চা সামনে নিয়ে ভিড় দেখছিল সে। ললিতার যারা সহপাঠী তারা এখনো কেউ আসে নি। সহপাঠীদের সবাইকে ও চেনেও না। দু'চারজন তো কলেজে রাহুলের সঙ্গেই পড়ত। তাদের মধ্যে শঙ্কর আর প্রণবের সঙ্গে রাহুলের খাতির হয়েছিল। কিন্তু বন্ধুত্ব হয় নি। ললিতা একদিন কথাপ্রসঙ্গে রাহুলকে প্রশ্ন করেছিল, "তোমার কোনো বন্ধু নেই কেন?"

"কলকাতা একটা ইট-সুরকির রাজ্য, এখানে কেউ কারো বন্ধু নয়।" জবাব দিয়েছিল রাহুল গুপ্ত। জবাবের মধ্যে সত্যিই কোন অর্থ ছিল কিনা ললিতা তখন ভেবে দেখে নি। আজকাল ভাবতে চেষ্টা করছে। রাহুল এখন শুধু একটা আইডিয়া মাত্র নয়, রক্ত-মাংসের মানুষ ব'লে ওকে কল্পনা করছে ললিতা। বোঝবার চেষ্টা করছে রাহুলের চোখে একটা ভয়ের ছায়া সব সময়েই ভেসে বেড়ায় কেন। যারা ভাগ্যবান, যারা বিত্তশালী, তাদের ও সহ্য করতে পারে না। সব রকম সৌভাগ্যের সঙ্গে ওর যেন চিরকালের শত্রুতা। এই জন্যেই শঙ্কর কিংবা অন্য কারো সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয় নি। ওরা বড়লোকের ছেলে। কোনো কিছু বড়-র পাশে সে দাঁড়াতে ভয় পায়। রাহুল সেদিন বলেছিল, "তোমাদের কর্নেল বিশ্বাস রোডের বাড়িটা আমার খুব পছন্দ।" বাড়িটা ছোট এবং ভাঙা ব'লেই বোধ হয় রাহুলের পছন্দ। ক্যানটিনে ঢুকে অবধি এসব কথাই ভাবছিল ললিতা। কী অদ্ভুত প্রকৃতির ছেলে রাহুল গুপ্ত!

নিজেরা বড়লোক ব'লেই কি সে ভাঙা বাড়ি পছন্দ করে? শুধু তাই নয়। শঙ্কর কিংবা প্রণবদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে যদি ললিতা দু'দশ মিনিট গল্প করে তাতেও রাহুল গুপ্ত ভয় পায়। শঙ্করের বাবা নতুন দোতলা বাড়ি করেছেন। গৃহপ্রবেশের দিন শঙ্কর নেমন্তন্ন করেছিল ললিতাকে। ললিতা যায় নি। রাহুলের আপত্তি ছিল ব'লেই যায় নি। রাহুল বলেছিল, "আমাদেরও তিনতলা বাড়ি প্রায় শেষ হ'য়ে এল। গৃহপ্রবেশের দিন তোমাকে আমি নিয়ে যাব।" তারপরে একটা বছর পার হয়ে গেছে। আজও ললিতা গৃহপ্রবেশ-উৎসবের নেমন্তন্ন পায় নি। বোধ হয় মাস দুই আগে ললিতা জিজ্ঞাসা করেছিল, "তোমাদের তিনতলা বাড়িটা কি শেষ হয় নি?"

"হয়েছে।"

"কই, আমায় তো ডাকলে না?"

"যেদিন যাবে সেদিন সেখানে পাকাপাকিভাবেই প্রবেশ করবে। ডাকতে হবে না। অমিয়াংশু সেন তোমায় পাঁচখানা ঘরের লোভ দেখিয়েছেন, আমরা তোমায় পুরো তিনতলা বাড়িটাই ছেড়ে দেব।" রাহুলের কথা শুনে অবাক হ'য়ে গিয়েছিল ললিতা। রক্তমাংসের মানুষ নয় রাহুল গুপ্ত, ওর গোটা অস্তিত্বটাই একটা আইডিয়া। বিংশ শতাব্দীর বস্তুকেন্দ্রিক সভ্যতাকে বোধ হয় উপহাস করছে সে। টাকা পয়সার অভাব নেই ওর। রাহুলের কাছেই শুনেছে ললিতা, পরিবারটা ওদের মস্তবড় একটা কারখানার মত। আধুনিক শিক্ষার 'ট্রেডমার্ক' লাগানো আছে প্রতিটি ছেলেমেয়ের কপালে। শিক্ষা এবং সম্পদের একবিন্দু অভাব নেই। অভাব থাকলে ললিতার পড়ার খরচ চালাতে পারত না রাহুল। তিনতলা বাড়িটা ছেড়ে দেওয়ার মানসিকতা জন্ম নিত কি ক'রে? এত বেশি আছে ব'লেই রাহুল গুপ্ত ছেঁড়া কাপড়

প'রে কলেজে আসত। উপহাস করত কলকাতার সাজপোশাক-পরা বস্তু-উন্মাদ আধুনিক সভ্যতাকে। কিন্তু মায়ের ধারণা তা নয়। তিনি মনে করেন, রাহুল কষ্ট পাচ্ছে। আধুনিক সভ্যতার যূপকাষ্ঠে রাহুল গুপ্ত ঘাড় ঠেকিয়ে রেখেছে। বলি হওয়ার আগের মুহূর্তটা বিলম্বিত হচ্ছে ব'লেই মা-ও যেন ওর সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট পাচ্ছেন খুব। তা হ'লে কি রাহুল গুপ্ত সত্যিই মানুষ নয়?

চা-এর পেয়ালা সামনে নিয়ে ব'সে ছিল ললিতা। প্রায় এক ঘণ্টা হ'য়ে গেছে, আর এখানে বসা চলে না। রাহুল বোধ হয় আজ আর এল না। আসা উচিত ছিল ওর। ললিতা আজ সাহচর্য চায়। শুধু অর্থবিজ্ঞান নয়, সব রকম বিজ্ঞান-বিবর্জিত হ'য়ে ললিতা চেয়েছিল কোনো একটা নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বসতে। রাহুল পাশে না থাকলে নির্জনতার কোনো অর্থ থাকে না। দিনটা আজ নষ্টই হ'য়ে গেল। অমিয়াংশুকে পেলেও বেড়াতে যাওয়া যেত। সে তো অফিস থেকে ছুটি নিয়ে হোটেলে ব'সে সময় কাটাচ্ছে। হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে অমিয়াংশুর ঠিকানা-লেখা কাগজটা খুঁজতে লাগল ললিতা। ভাল হোটেলেই থাকে অমিয়াংশু। এস্‌প্লানেড থেকে পশ্চিম দিকে একটু হেঁটে যেতে হবে। তারপর ডান দিকের একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেই হোটেলের সাইনবোর্ড চোখে পড়বে। ঠিকানা-লেখা কাগজখানার ওপরে অমিয়াংশু নকশা এঁকে দিয়েছে। ললিতা ওর ঠিকানা জানতে চায় নি। হোটেলে যাওয়ার কথাও কল্পনা করে নি। তবু সেদিন অমিয়াংশু ঠিকানা লিখল, ছবি আঁকল। এস্‌প্লানেড থেকে হেঁটে গেলে হোটেলে পৌঁছতে ক' মিনিট লাগে তাও লিখে দিয়ে গেল সে। যাওয়ার সময় ললিতাকে ব'লে গিয়েছিল, "যদি কখনো দরকার হয় চ'লে এসো। মাসখানেক হোটেল থেকে বেরুব না।"

"কিন্তু আমার তো দরকার নেই—"

"এখন নেই, এক মাসের মধ্যে হ'তে পারে।" এই ব'লে কাগজের টুকরোটা ললিতার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে অমিয়াংশু নেমে গিয়েছিল একতলায়। সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে ললিতা সেদিন ভেবেছিল, রাহুল তো আজ পর্যন্ত ওর হাতের মুঠোতে কোন কিছু গুঁজে দিতে পারে নি। প্রতিমাসে টাকা দেয় রাহুল। দেয় দূর থেকে—মুঠো কিংবা মন তাতে কোনোদিনই ভরে নি ললিতার।

হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে ঠিকানা-লেখা কাগজটা বা'র করল সে। এই সময় অমিয়াংশু নিশ্চয়ই হোটেলে থাকবে। বেলা দুটো মাত্র। ললিতা বেরিয়ে এল ক্যানটিন থেকে। দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল সে। তাড়াতাড়ি ট্রামে এখন চেপে বসতে পারলেই হয়। অমিয়াংশু যেন হঠাৎ ওকে টানতে লাগল। মনে মনে এমন কথাও ভাবল ললিতা যে, ফটকের মুখে রাহুলের সঙ্গে যেন দেখা না হ'য়ে যায়।

দেখা হ'ল জয়ন্তর সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরটাও পেরিয়ে যেতে পারল না ললিতা। জয়ন্ত ডেকে উঠল, "হ্যালো ললিতা—" মনের একাগ্রতা নষ্ট হ'ল ওর। জয়ন্তকে এড়ানো গেল না। একই কলেজের ছাত্র ছিল জয়ন্ত চ্যাটার্জি। এক বছর আই-এ পড়বার পরে সে চ'লে যায় উড়োজাহাজ চালানো শিখতে। পাইলট হয়েছে জয়ন্ত। পাইলটের পোশাক পরেছে। ঘাড়ের ওপর থেকে একটা ব্যাগ ঝুলছে ওর। জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করল, "চিনতে পারছ না?"

"কেন পারব না? কবে ফিরলে কলকাতায়?"

"কাল। রাহুল কোথায়? কি পড়ছে সে?"

"এম-এ পড়বার কথা ছিল—"

"ও বুঝেছি—" জয়ন্ত হাঁটতে লাগল ফটকের দিকে, "পাগলা

বোধ হয় পরীক্ষা দেয় নি। কারো সঙ্গেই দেখা হ'ল না—শঙ্কর, প্রণব ওরা সব কোথায় ?"

"ওরা নিশ্চয়ই ক্লাশ করছে। তুমি চাকরি করছ নাকি জয়ন্ত ?"

"হ্যাঁ। এই সবে চাকরি পেলুম। শুরুতে হাজার টাকা—"

বাধা দিয়ে ললিতা বলল, "হবেই তো। এসব কাজে রিস্ক বড্ড বেশি।"

"তা হোক। দেশ দেখব, পৃথিবী দেখব। নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হবে।"

"হ্যাঁ, তুমি তো তাই-ই চেয়েছিলে। বড় হ'তে চেয়েছিলে। বড় চাকরি তো পেয়েই গেছ। হাজার দুই টাকা মাইনে হ'তে কতদিন লাগবে জয়ন্ত ?"

"অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মাইনে বাড়বে।"

"অত ওপরে উঠে কাজ করতে তোমার ভয় করে না ?" অদ্ভুত রকমের একটা প্রশ্ন ক'রে বসল ললিতা। হেসে ফেলল জয়ন্ত। হাসতে হাসতে সে জবাব দিল, "ওপরে না উঠলে উড়োজাহাজ তো চালানো যায় না। এখন কোথায় চললে তুমি ? চলো-না চৌরঙ্গীর দিকে যাই। ফারপো কিংবা ফেরাজিনীতে ব'সে চা খাওয়া যাক।"

"আমার একটু কাজ আছে।"

"তাহ'লে ?" পেছন দিকে দৃষ্টি ফেলল জয়ন্ত। একটা ক্লাশ ছুটি হয়েছে। ছেলেমেয়েরা দলে দলে বেরিয়ে আসছিল ফটক দিয়ে। ললিতা বুঝল, জয়ন্তও সঙ্গ চাইছে। শঙ্কর কিংবা প্রণবের সঙ্গে চা খেতে ওর ভাল লাগবে না। ললিতা তাই বলল, "আমাদের কলেজের সেই যশোধারাকে চিনতে না ?"

"খুব। কলেজের মধ্যে সেই তো ছিল সবচেয়ে স্মার্ট। খুব ভাল করেই চিনি ওকে।"

"যশোধারা ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে এম-এ পড়ছে। একটু আগেই ওকে ক্যানটিনে আমি দেখেছি।"

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল জয়ন্ত। বলল সে, "আবার দেখা হবে। তোমাদের ক্যানটিনে একবার উঁকি দিয়ে আসি। বাই, বাই—" এই ব'লে জয়ন্ত চ্যাটার্জি পুনরায় ঢুকে পড়ল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে।

রাহুলকে দেখতে পেয়েছিল ললিতা। কলুটোলার মোড় থেকে সে হেঁটে আসছিল ফটকের দিকে। জয়ন্তর সঙ্গে যেন ওর দেখা না হয় সেইজন্যে ললিতা আলোচনার মাঝখানে চ'লে যাওয়ার জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছিল।

রাহুলকে দেখে ললিতা আজ সত্যিই লজ্জা পেল। দাড়ি কামায় নি। চুলে তেল মাখে নি অনেকদিন। ছেঁড়া ধুতি আজ সে বর্জন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের মধ্যে অনেকেই ট্রাউজার পরে ব'লে রাহুলও আজ ট্রাউজার প'রে এসেছে। অর্ডার দিয়ে তৈরি করাবার সময় পায় নি। রেডি-মেড ট্রাউজার। দু' চার দোকান ঘুরে ঘুরে নিজের মাপের সঙ্গে মাপ মিলিয়ে ট্রাউজারটা সে অনায়াসেই কিনতে পারত। তেমন চেষ্টাও সে করে নি। রাহুলকে দেখে হাসি পেল ললিতার। গোড়ালির ছ' ইঞ্চি ওপরে এসে ট্রাউজারের প্রান্ত আর নিচের দিকে নামতে পারে নি। কোমরের মাপ ঠিক নেই। চামড়ার বেল্ট বাঁধলে বাড়তি কাপড়টা কোনো রকমে গুছিয়ে গাছিয়ে রাখতে পারত। এখন শুধু বার বার ক'রে তলার দিকে নেমে পড়ছে। হাত দিয়ে তাই চেপে ধ'রে রাখতে হচ্ছে ওকে। এবার আর হাসি নয়, রাহুলকে দেখে রাগ হ'ল ললিতার। চেনা ছেলেরা যেন ওকে দেখতে না পায় সেই জন্যে ললিতা বলল, "চলো, আমরা একেবারে উল্টো দিকে কোথাও চলে যাই। নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বসি।"

"নিরিবিলি জায়গা কোথায় ?" জানতে চাইল রাহুল।

"খুঁজে বার করো—" ললিতা যেন ধমকে উঠল।

"শুনেছি, বালিগঞ্জের দিকে নিরিবিলি জায়গা আছে। শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখি নি।"

"দেখা উচিত ছিল। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেউ কাউকে ভালবাসতে পারে না কি ?"

"কিন্তু—" রাহুল চেয়ে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকের দিকে, "কিন্তু পৃথিবীর কোথাও এখন নিরিবিলি জায়গা পাওয়া যায় না।"

"কে বলেছে পাওয়া যায় না ? কেন পাওয়া যায় না ?" তেড়ে উঠল ললিতা।

"বোধ হয় পৃথিবীর বনজঙ্গল, নালাডোবা, মাঠ, বাগান সব ভরাট হ'য়ে যাচ্ছে। গাদা গাদা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গ্রাস থেকে এক ইঞ্চি নিরিবিলি জায়গাও রক্ষা পাবে না ললিতা।"

"তা হ'লে চলো—" সামনে দিয়ে একটা খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল, "এই ট্যাক্সি—" গাড়ির দরজা খুলে ললিতা উঠে বসল ট্যাক্সিতে। উঠল রাহুলও। চৌরঙ্গীর দিকে গাড়ি চালাবার হুকুম দিয়ে ললিতা বলল, "ভাগ্যিস ট্যাক্সিটা পেয়ে গেছি !"

"হ্যাঁ, নির্জনতা পেলুম আমরা।" পাওয়ার সৌভাগ্যে রাহুল গুপ্ত ট্যাক্সির কোনায় হেলান দিয়ে বসল। কিন্তু ললিতা জানে, আর এক মিনিট দেরি করলে জয়ন্তর সঙ্গে দেখা হ'য়ে যেত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটক দিয়ে জয়ন্তকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল ললিতা। দেখেছিল, জয়ন্তর সঙ্গে যশোধারাও আছে।

চৌরঙ্গীর মুখে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল ওরা। উঠে বসল বালিগঞ্জের ট্রামে। গড়িয়াহাটের মোড়ে পৌঁছে নেমেও পড়ল আবার। রাহুল বলল, "চলো, লেকের দিকে যাই। হিন্দুস্থান

পার্কের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলো। গোটা চার সমান্তরাল রাস্তা পেরিয়ে যেতে পারলে নির্জনতা পাওয়া যেতে পারে।”

নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল ওরা। রাহুলের সান্নিধ্য এখন আর ললিতার ভাল লাগছিল না। রাহুল আজ না এলেই পারত। এসপ্লানেডের ট্রামে চেপে বসতে পারলে দুপুরের কোলাহল কানে আসত না ওর। অমিয়াংশুর হোটেলে নতুন নির্জনতার স্বাদ পেত ললিতা।

হঠাৎ একসময়ে রাহুল জিজ্ঞাসা করল, “সেনসাহেব আসেন না আজকাল?”

“আসেন।”

“সবসুদ্ধ ক’বার এসেছেন?”

“গুনে রাখি নি।” ললিতা লক্ষ্য করল রাহুলের মুখে ভয়ের চিহ্ন।

হিন্দুস্থান পার্ক পার হ’য়ে এল ওরা। এ রাস্তায় লোকের ভিড় কিছু নেই। ট্রাম-বাস তো নেই-ই। জানলা দরজা বন্ধ ক’রে বাড়ির মেয়েরাও ঘুমচ্ছেন। শুধু দু’ একজন ফল বিক্রিওয়ালা মাঝে মাঝে চীৎকার ক’রে উঠছে। নির্জনতার কিছু অভাব ছিল না। তবুও ললিতা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। রাহুলের মনও চঞ্চল। তাই সে বলল, “চলো ফিরে যাই। কোথাও ব’সে এক পেয়ালা চা খাওয়া যাক। খুঁজলে মানুষ বোধ হয় নিজের মনেও নিরিবিলি জায়গার সন্ধান পেতে পারে। বাইরের জগৎটা ভুয়া। সেখানে কিছুই পাওয়া যায় না, ললিতা।”

ফেরবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল ললিতা। ডানদিকের একফালি ফাঁকা জমির ওপর বেঞ্চি পেতে ব’সে ছিলেন অধ্যাপক ব্যানার্জি। কলেজে তিনি অর্থবিদ্যা পড়ান। অধ্যাপক ব্যানার্জি ওদের দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা সব এদিকেই থাকো না কি? রাহুল তো পরীক্ষা দিলে না। তুমি কি সাবজেক্ট নিলে ললিতা?”

"অর্থবিদ্যা।"

"বেশ। এম-এ পরীক্ষার সময়েও আমার বইখানা কাজে লাগবে।"

"আপনার নোটবই না পড়লে বি-এ পরীক্ষায় ফেল করতুম স্যার। ছ'টা প্রশ্ন আপনার বই থেকে 'কমন' পড়েছিল।"

"এবার নতুন সংস্করণ বেরুচ্ছে। অষ্টাবিংশতি সংস্করণ। পুরনো সংস্করণ আর চলবে না—" মৃদু হেসে অধ্যাপক ব্যানার্জি বললেন, "যুদ্ধের সময় জমিটুকু কিনে রেখেছিলাম, ওপাশের ওই ডোবাটা সুদ্ধ।"

"বাড়ি উঠবে বুঝি?" জিজ্ঞাসা করল ললিতা।

"হ্যাঁ।"

"কত বড় বাড়ি সার?"

"তিনতলা—" প্ল্যান আঁকা কাগজখানা ললিতার সামনে খুলে ধ'রে অধ্যাপক ব্যানার্জি বলতে লাগলেন, "এক এক তলায় দুটো ক'রে ফ্ল্যাট। মোট সংখ্যা ছয়। আমি নিজে থাকব একতলায়।"

অধ্যাপকের কথা শুনে ললিতা খুব উৎসাহিত হ'য়ে উঠল। তিনতলার একটা ফ্ল্যাট যেন হাত দিয়ে ছুঁয়ে ফেলেছে এমন ভাব দেখিয়ে সে বলল, "আমার বাবা একটা ফ্ল্যাটের খোঁজ করছেন। আপনি তো ভাড়াই দেবেন—"

হো হো ক'রে হেসে উঠলেন অধ্যাপক ব্যানার্জি। হাসি থামবার পরে তিনি বললেন, "ফ্ল্যাট আর একটাও খালি নেই। সব ভাড়া হ'য়ে গেছে।"

"কি ক'রে হ'ল সার? ভিত কাটা শুরু হয় নি, সবে তো ও-পাশের ডোবাটায় মাটি ফেলা আরম্ভ হয়েছে।"

"ভিত কাটা যখন শুরু হবে তখন তো এক বছরের পুরো টাকাই ভাড়াটেদের কাছ থেকে আদায় হ'য়ে যাবে। এখন ওঁরা প্ল্যান

দেখে আগাম টাকা দিয়ে গেছেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই ললিতা। অর্থবিদ্যার আইন অনুসারেই সব ঘটছে।" অধ্যাপক ব্যানার্জি তিনতলা বাড়ির নকশাটার দিকে চেয়ে পুনরায় বললেন, "আমাদের কলেজের একটি ছেলে বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। তাকে দিয়েই নকশাটা করিয়ে নিলুম। পয়সা লাগে নি, অবিশ্যি আজকাল তো নকশার মধ্যে শিল্প থাকে না। চোখ বুঁজে ইটের উপর ইট সাজিয়ে গেলেই হ'ল—"

"আপনার কথা মিথ্যে নয়," রাহুল আর চুপ ক'রে থাকতে পারছিল না, "কিন্তু দু'চারটে নকশার মধ্যে শিল্পও থাকে। আমাদেরও তিনতলা বাড়ি শেষ হয়েছে। বাবার আঁকা নকশা। একদিন আপনাকে দেখাতে নিয়ে যাব সার। এখন আমরা চলি।"

ধাক্কা খেলেন অধ্যাপক ব্যানার্জি। ছাত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল নকশার মধ্যে তাঁরও একটু শিল্প থাকা উচিত ছিল। পাঞ্জাবী আর মাদ্রাজী ভাড়াটেদের কাছ থেকে তাতে বেশি ভাড়া আদায় হ'তো না বটে, কিন্তু রাহুলের কাছে হেরে যেতেন না তিনি। হেরে যখন গেলেনই তখন আর এ নিয়ে আলোচনা করবার দরকার নেই। অধ্যাপক ব্যানার্জি ললিতার দিকে চেয়ে বললেন, "মাস ছয়েক পরে আবার এসো। একতলাটা তখনও শেষ হবে না বটে—" অধ্যাপক ব্যানার্জি এবার ডোবাটার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, "ওখানেই কাজ আরম্ভ হবে আগে। আলাদা দু'খানা ঘর তুলছি ডোবার ওপর। টিউটোরিয়াল ক্লাশ খুলব।" এই ব'লে তিনি পুনরায় নকশা-আঁকা কাগজটা খুলে ফেললেন। ললিতার চোখের সামনে তুলে ধ'রে বললেন তিনি, "ঘর দু'খানার সামনে থাকবে একটা চাতাল। চলতি ভাষায় আমরা যাকে বলি রক। ছেলেরা মাঝে-সাঝে ওখানে ব'সে বিশ্রাম করবে, টিফিনও খেতে পারবে—

তুমিও এসো রাহুল। যারা অল্প পয়সা দিয়ে বেশি ক'রে অর্থবিদ্যা শিখতে চায় তাদের কথা ভেবেই ডোবার ওপর ঘর দু'খানা তুলে ফেলছি। আমাদের দেশ যে কত গরিব—"

অধ্যাপক ব্যানার্জি বক্তব্য তাঁর শেষ করতে পারলেন না। এই সময় হঠাৎ ললিতা ভয় পেয়ে স'রে এল রাহুলের দিকে। ওর গায়ের সঙ্গে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে ব'লে উঠল, "সার, ওই দেখুন মস্ত বড় একটা ব্যাঙ—আমার পায়ের ওপর কেমন কিলবিল ক'রে উঠল!"

ব্যাঙটাও ভয় পেয়েছে। নিরাপদ গন্তব্যে পৌছবার পথ পাচ্ছিল না সে। ললিতা দেখতে পেল, কুলীরা ওকে পেছন থেকে তাড়া করেছে। যারা ডোবার মধ্যে মাটি ফেলছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ নতুন ইটের টুকরোগুলো ছুঁড়েও মারছিল ওর দিকে।

ব্যাঙটার দিকে চেয়ে রাহুল ঘোষণা করল, "আশ্রয় হারিয়েছে বেচারী। ললিতা, চলো, এবার আমরা যাই। নমস্কার সার—"

"যাচ্ছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ডোবাটা প্রায় ভরাট হ'য়ে এল!" এই ব'লে রাহুল হাত তুলে নমস্কার করল। অধ্যাপক ব্যানার্জি হাত তুলতে পারলেন না। নকশাটার দিকে চেয়ে তিনি শুধু ভাবলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র একমাস আগে ডোবাটা তিনি কিনে রেখেছিলেন। দাম দিতে হয়েছিল মাত্র দু'হাজার। আর আজকে এর বাজার-দর দশ হাজারের কম নয়। রাহুল গুপ্তর মাথা খারাপ। নইলে সে ব্যাঙটার জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত না। অর্থবিদ্যার প্রায় সবটুকুই তো বিজ্ঞান, এর মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবার মত ফাঁক কই? ছেলেটা যদি এবার পরীক্ষা দেয়, তাহ'লে সে অনার্স পাবে না। এই ভেবে অধ্যাপক ব্যানার্জি শক্ত কাগজের নকশাটা সহসা গুটিয়ে ফেললেন। তাড়া করলেন ব্যাঙটাকে।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

অমিয়াংশুর টাকাটা আজও ফিরিয়ে দিতে পারেন নি সুবোধবাবু। দেওয়ার ইচ্ছে খুব প্রবল। গত ক' মাস থেকে মনে মনে এবং কাগজের ওপর অঙ্ক ক'ষে যাচ্ছেন তিনি। প্রতিমাসে যদি কুড়িটাকা ক'রে ফেরত দেওয়া যায় তা হ'লে সংসারে কি কি জিনিসের অভাব পড়বে? প্রতিমাসে কি কি জিনিস কেনেন তার একটা লিস্ট তিনি লিখে ফেললেন মনিঅর্ডার ফর্মের কুপনের ওপর। অনেকগুলো নতুন মনিঅর্ডার ফর্ম তাঁর হাতের কাছেই পড়ে ছিল। একটা কুপনে কুলিয়ে উঠতে পারলেন না। গোটা দুই ফর্ম নষ্ট করতে হ'ল। তারপর লালকালি দিয়ে অনাবশ্যক জিনিসগুলো কেটে ফেলতে লাগলেন তিনি। কুড়ি টাকা বাঁচাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত সুবোধবাবু আয়-ব্যয়ের একটা বাজেট তৈরি ক'রে ফেললেন। ভাল ক'রে পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন, সরকারী বাজেটের মত তাঁর বাজেটও হাস্যকর হ'য়ে উঠেছে। ধার শোধ করবার জন্যে তিনি চন্দনকে এক বছর ঘরে বসিয়ে রাখছেন। ইস্কুলের মাইনেটা বাঁচিয়ে ফেললেন তিনি। সুবোধবাবু নিজের মনেই হেসে উঠলেন। মাসে মাসে কুড়ি টাকা দেওয়া চলবে না। দশ টাকার কিস্তি তিনি অবশ্যই দিতে পারবেন। এই সম্বন্ধে এত বেশী নিশ্চিত হ'য়ে রইলেন যে, অনেকদিন পর্যন্ত সুবোধবাবু কাগজ কলম নিয়ে অঙ্ক কষতেও বসলেন না। কিস্তি না দিয়েও মনের আনন্দে ক'টা মাস তিনি কাটিয়ে দিলেন। দশটা টাকা এত কম যে, কিস্তি না দিয়েও তাঁর মনে হয়েছিল, প্রতি মাসে অমিয়াংশুকে টাকা তিনি নিয়মিত ফেরত দিয়ে যাচ্ছেন। তারপর হঠাৎ সেদিন অমিয়াংশুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সুবোধবাবু সঠিকভাবে বুঝতে পারলেন একটা পয়সাও ওকে ফেরত

দেওয়া হয় নি। নতুন পরিকল্পনায় আবার বাজেট তৈরি হ'তে লাগল।

এত পরিশ্রম করবার কি দরকার? সুবোধবাবু নিশ্চয়ই জানেন, বাজেট তৈরি ক'রে লাভ নেই। দশ টাকা তো দূরের কথা, পাঁচটা টাকাও তিনি বাঁচাতে পারবেন না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিজ্ঞও পারবেন না তাঁর সংসারে পাঁচটা টাকার উদ্বৃত্ত দেখাতে। তবে কেন সুবোধবাবু টাকা ফেরত দেওয়ার জন্যে এত বেশী ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন? অফিসে এসে আজ তিনি শুধু হিসেব ক'রেই চলেছেন। ললিতার জন্যে একটা পয়সাও খরচ করতে হয় না। যদি হ'তো, তা হ'লে তিনি অতি সহজেই উদ্বৃত্ত দেখাতে পারতেন। ললিতার জন্যে কোন খরচ নেই ব'লেই এখন তাঁর রাগ হ'তে লাগল। হিসেব-লেখা কাগজখানা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেললেন সুবোধবাবু। যেমন ক'রেই হোক আসছে মাসের প্রথম সপ্তাহে অমিয়াংশুকে দশটা টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। দিতে সুরু করলে একদিন শোধও হ'য়ে যাবে। এটা তাঁর সাধারণ ধার নয়। ঋণের মধ্যে নীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন রয়েছে। চন্দনের জন্যে অমিয়াংশু টাকাটা ধার দিত না। ললিতার দরকার ব'লেই দিয়েছে। দরকার না থাকলেও ললিতাকে টাকা দেবে অমিয়াংশু। এই কথাটাই গত ক'মাস থেকে সুবোধবাবু ভেবে মরছেন। অমিয়াংশুর টাকার মধ্যে দুর্নীতির প্রমাণ রয়েছে। অমিয়াংশুর সঙ্গে যদি ললিতার বিয়ে হ'তো তা হ'লে অবিশ্যি এসব প্রশ্ন উঠতই না। সেদিন দুপুরের দিকে হঠাৎ সে এসে উপস্থিত হয়েছিল পোস্ট অফিসে। ছুটির মেয়াদ এখনো ফুরয় নি ওর। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই সময়ে কি মনে ক'রে অমিয়?"

"একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এলাম?"

"জরুরী না কি?" ভয় পেয়েছিলেন সুবোধবাবু। ভেবেছিলেন,

সে হয়তো তাগাদা দিতে এসেছে। অমিয়াংশু জিজ্ঞাসা করেছিল, "আপনি কি জাত মানেন?"

"মানি।"

"ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী মানেন না।" এই ব'লে অমিয়াংশু সেন চ'লে গিয়েছিল সেদিন। সুবোধবাবুর অনুরোধ সত্ত্বেও এক মুহূর্তও বসে নি সে। অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন সুবোধ মিত্র। অমিয়াংশু সেনের মধ্যে আশ্চর্যজনক পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে ছিলেন তিনি। বেশভূষার মধ্যে এলোমেলো ভাব। গ্যাবার্ডিন কাপড়ের কোট প্যান্ট পর্যন্ত অপরিষ্কার। অমিয়াংশু কি তবে ললিতাকে ভালবাসে? নইলে জাতের প্রশ্ন তুলল কেন সে?

ইনসিওর চিঠিগুলো আজ আর বিলি করবার দরকার নেই। পঞ্চাশখানা চিঠি তো বিলি করবার ব্যবস্থা তিনি ক'রেই দিয়েছেন। বাকী যা ছিল সব নিয়ে ফেলে রাখলেন সিন্দুকের মধ্যে। পাখার তলায় ব'সে সুবোধবাবু অমিয়াংশুর কথাই ভাবতে লাগলেন। জাতের কথা সেদিন সে তুলেছিল কেন? সুবোধবাবু 'মিত্র' ব'লেই তো সে তুলতে বাধ্য হয়েছিল। অমিয়াংশু সত্যিই কি ললিতাকে বিয়ে করবে? আনন্দের আতিশয্যে খুক খুক ক'রে কেশে উঠলেন সুবোধবাবু। মনের আনন্দ যেন তিনি আর চেপে রাখতে পারছিলেন না। আশপাশের দু' একজন সহকর্মীর দিকে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলেন কতক্ষণ। খবরটা তাঁদের দেওয়া যায় কি? কি ক'রে যে মনের আনন্দ প্রকাশ করতে হয় তার উপায় খুঁজতে লাগলেন তিনি। বিগত বিশ বছরের মধ্যেও কোন কিছুই তাঁকে প্রকাশ করতে হয় নি—আনন্দ তো নয়ই।

চেয়ারের গায়ে এলিয়ে পড়লেন সুবোধবাবু। কি দরকার তাঁর জাত মানবার? সারাজীবন ধ'রে কত কিছুই তো মেনে এলেন, তাতে কার কি সুবিধে হ'ল? এখন যদি তিনি জাত না

মানেন তা হ'লে ললিতার বিয়েতে পয়সা লাগবে না। বিয়ের খরচ বাবদ অমিয়াংশু নিজেই হয়তো মোটা টাকা তুলে দিয়ে যাবে তাঁর হাতে। তা ছাড়া ঋণের টাকার দুর্নীতি নিয়ে আর তাঁকে ভাবতেও হবে না। তবে কি অর্থনীতির সঙ্গে নীতি-দুর্নীতির সম্বন্ধ রয়েছে? উঠে বসলেন সুবোধবাবু। আজ আর অফিসের কাজে মন বসছে না। অমিয়াংশুর হোটেলে গিয়ে গল্প করবার ইচ্ছা হ'ল তাঁর। নোট-বইতে অমিয়াংশুর ঠিকানাটা লেখাও আছে। আজকালকার শিক্ষিত ছেলেদের মুখ থেকে গল্প শুনতেও ভাল লাগে। তিনি নিজেও তো ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর নাম জানেন। বলতে গেলে সুবোধবাবু তাঁরই প্রজা। অথচ প্রধান মন্ত্রী যে জাতিভেদ মানেন না তেমন খবর অমিয়াংশু রাখে, তিনি রাখেন না। আজকালকার ছেলেরা কেতাবী-জ্ঞানের বাইরের জ্ঞানও রাখে। মনে মনে তাদের প্রশংসা করতে করতে একটা পুরো সিগারেট প্রায় শেষ ক'রে ফেললেন সুবোধবাবু। পাঁচটা বাজবার আগে তাঁর হুঁশ ফিরে এল। এবার বেরিয়ে পড়তে হয়। স্নেহলতার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। ভারতবর্ষের মন্ত্রী-সান্ত্রীরা যা-ই বলুন না কেন স্নেহলতার কথা উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। সুবোধবাবু অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন। অমিয়াংশুর হোটেলে অন্য একদিন যাবেন, আজ নয়।

প্রতিদিনকার মত আজও তিনি ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানীর দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে পড়লেন। পথ যেন আর শেষ হ'তে চায় না। সুবোধবাবুর মনে হ'ল, ট্রামগাড়িটা আজ যেন খুব ধীরে ধীরে চলছে। দাঁড়িয়ে পড়ছে যেখানে সেখানে। মনে মনে বিরক্ত বোধ করতে লাগলেন তিনি।

তারক দত্ত রোডের মোড়ে এসে সুবোধবাবু দেখলেন, প্রতি-দিনকার মত আজও রোয়াকের ওপরে ছেলেদের সভা বসেছে। বিনোদ বক্সি নেই। সেইজন্যেই ছোট্ট বড় সবাই মিলে ধূমপান

করছে। রোয়াকের সামনে ধোঁয়ার পরিমাণ প্রচুর। তিনি ঢুকে পড়লেন কর্নেল বিশ্বাস রোডে। কেউ কিছু ঠাট্টা ইয়ার্কি করল না বটে, কিন্তু সুবোধবাবু বুঝতে পারলেন, ছেলেগুলো সব হাসছে। চাপা হাসি। সমস্ত দেহ-মনে হাসির ওজন অনুভব করলেন তিনি। এর চেয়ে দু' দশটা কথার খোঁচা গায়ে লাগলেও আরাম পেতেন সুবোধবাবু।

ডাক্তার বিকাশ ঘোষের চেম্বারের সামনে এসে আবার তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেয়ালের গা থেকে নামের ফলকটা খুলে নিচ্ছিলেন ডাক্তার ঘোষ নিজেই। কোনো যন্ত্রপাতির দরকার হ'ল না। তিনি দেখলেন হাত দিয়ে টান মারতেই কাঠের ফলকটা বেরিয়ে এল। আস্ত এল না, মাঝখান থেকে দুটো ভাগ হ'য়ে গেল।

সুবোধবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি, ডাক্তার ঘোষ ?"

"চেম্বারটা তুলে দিলুম।" জবাব দিলেন বিকাশ ডাক্তার। কাঠের ফলকটার মত সুবোধবাবুও যেন দু' টুকরো হ'য়ে গেলেন !

ডাক্তার ঘোষ বললেন, "ভাড়ার টাকা বিনোদ বক্সিকে দিয়ে গেলাম। একটা পয়সাও বাকী নেই।"

"তবে যাচ্ছেন কেন ?" প্রশ্ন করলেন সুবোধবাবু।

"এমনিই—" ডাক্তার ঘোষের মুখের ওপরে বিষাদের ছায়া।

"না, না, লেগে থাকুন। অসুখবিসুখ হ'লে আমরা আপনাকেই ডাকব—" সুবোধবাবু লক্ষ্য করলেন, ডাক্তার বিকাশ ঘোষ চেয়ে রয়েছেন বিনোদ বক্সির রোয়াকের দিকে। ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেছে। আর কিছু বলতে পারলেন না সুবোধবাবু। মাথা নিচু ক'রে চ'লে এলেন বাড়ি পর্যন্ত। জীবনের পঞ্চাশটা বছর দীর্ঘ মনে হয় নি, মাত্র দু' তিনটে মুহূর্তের ব্যবধান আজ খুবই দীর্ঘ মনে হ'ল তাঁর।

স্নেহলতা সামনের ঘরেই ছিলেন। ললিতার টেবিলটা বড্ড বেশি অগোছাল হ'য়ে ছিল। বই আর খাতাপত্র গুছিয়ে রাখছিলেন স্নেহলতা। ক'দিন থেকে তিনি লক্ষ্য করছিলেন, ললিতার আর লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ নেই। দু' একদিন ললিতা এমন কথাও বলেছে যে, চাকরি করার জন্যে বি-এ ডিগ্রীটাই যথেষ্ট। আরও একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন স্নেহলতা। রাহুল গুপ্তের কথা জানতে চাইলে ললিতা জবাব দিতে চায় না। এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে কি অমিয়াংশুর প্রতি আগ্রহ বেড়েছে ললিতার?

অর্থবিদ্যার নোটবইখানার মধ্যে জবাব একটা পাওয়া যাবে মনে করলেন স্নেহলতা। টিকিট লাগানো একটা খাম তাঁর চোখে পড়ল। চিঠিখানা ললিতার কাছেই এসেছে। স্বামীর সঙ্গে বাস করতে আসবার পরে কর্নেল বিশ্বাস রোডের ঠিকানায় কোন চিঠি আসতে তিনি দেখেন নি। চিঠি লিখে খবর নেওয়ার মত কোন আত্মীয়-স্বজন তাঁর ছিলও না। ছেলেমেয়ে ইস্কুল কলেজে চ'লে যাওয়ার পরে কোন কোন দিন স্নেহলতা ঘুমতে পারতেন না। দুপুরবেলাটা বড্ড বেশি লম্বা মনে হ'ত। বিছানা থেকে উঠে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন জানলার ধারে। মানবসমাজের সান্নিধ্য চাইতেন। দুপুরবেলা কর্নেল বিশ্বাস রোড দিয়ে দু' চারজন মানব যাওয়া-আসা করত বটে, কিন্তু সামাজিক নৈকট্য তাতে অনুভব করতেন না তিনি। মনের শূন্যতা থেকেই যেত। হঠাৎ একদিন তিনি দেখলেন, ডাকবিলি করবার জন্যে একজন পিওন ঢুকে পড়ল সামনের এই গলিটায়। মুহূর্তের জন্যে স্নেহলতার মনে হয়েছিল, তিনি আর একা নন। একঘেয়েমির বিরক্তি বুঝি কাটল। পিওনের হাতে সাহচর্যের চিঠি রয়েছে। চিঠিগুলো যে পরের তা তিনি জানতেন। তবুও স্নেহলতার মনে হয়েছিল চিঠিগুলোর সঙ্গে তাঁরও

সম্পর্ক রয়েছে। হয়তো বা পল্লীগ্রামের পাতানো পিসীমা এতকাল পরে কলকাতার খবর জানতে চেয়েছেন। বাড়ির সামনে দিয়ে পিওনটি চ'লে গেল। স্নেহলতা বুঝলেন, তাঁর নামে কোন চিঠি আসে নি।

নোটবই থেকে খামখানা বা'র করলেন তিনি। উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন। ললিতা নতুন সমাজের মেয়ে। ওদের সামনে আদান-প্রদানের রাস্তা খোলা রয়েছে। সারাজীবনে তিনি যা পেলেন না, ললিতা না চাইতেই তা পেল। কিন্তু পেল কার কাছ থেকে? রাহুল কিংবা অমিয়াংশুর হাতের লেখা তিনি চেনেন না। ইচ্ছে করলেই চিঠিখানা খুলে দেখতে পারতেন স্নেহলতা। দেখবার জন্যে খুবই ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছিলেন। এ ব্যগ্রতা তাঁর শুধু নাম জানবার নয়, চিঠি পড়বারও। লোভের জালে জড়িয়ে পড়লেন তিনি। চিঠিখানা বা'র করতে গিয়েও পারলেন না। পাশের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন সুবোধবাবু।

আজ তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছেন। ঘরে ঢুকে সুবোধবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি জাত মানো স্নেহ?"

"মানি।"

"ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী মানেন না।" পকেট হাতড়ে সিগারেট বা'র করলেন সুবোধবাবু। স্নেহলতা বুঝলেন, কোন একটা জটিল প্রশ্ন নিয়ে মেতে রয়েছেন তিনি। ললিতার বাবা বড্ড বেশি অন্যমনস্ক। নইলে স্নেহলতার হাতে চিঠিখানা তিনি দেখতে পেতেন। সিগারেট ধরিয়ে সুবোধবাবু পুনরায় ঘোষণা করলেন, "ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী জাত মানেন না।"

"সম্রাট কিংবা মন্ত্রীদের পক্ষে কোন কিছু না মানাই স্বাভাবিক।"

"তাহ'লে?" সুবোধবাবুর সব কিছু যেন গুলিয়ে গেল, "তাহ'লে তো এ সম্বন্ধে আর কিছু ভাববার নেই। অমিয়াংশুকে ছেড়ে

দিতেই হয়। এত ভাল ছেলে সব সময়ে পাওয়াও যায় না।” ললিতার বিছানার ওপর জড়সড়োভাবে পা গুটিয়ে ব'সে পড়লেন সুবোধবাবু। স্নেহলতা জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি ললিতার বিয়ের কথা ভাবছ ?”

“এখন আর ভাবছি না। আমার বিশ্বাস, অমিয়াংশু ললিতাকে ভালবাসে।”

“আমার ধারণা রাহুলকে ভালবাসে ললিতা।”

“রাহুল ?” রেগে গেলেন সুবোধবাবু, “ওসব বাজে খবর আমি জানতে চাই না স্নেহ। আমি প্রমাণ চাই। অমিয়াংশু যে ললিতাকে ভালবাসে তার প্রমাণ আমি দিতে পারি। তা ছাড়া অমিয়াংশু মস্তবড় চাকরি পেয়েছে। আগে যেটা পেয়েছিল তার চেয়েও বড়। শুরুতে শ' সাতেক পাবে—দিল্লীতে শুনলুম ওর ছু' দাদার মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে গেছে। শেষ পর্যন্ত অমিয়র ভাগ্যে বোধ হয় হাজার টাকাই ঝুলছে। দেখো স্নেহ, ভারতবর্ষ সব দিক থেকে এত ছোট হ'য়ে রইল কেন, জানো ?”

“না।”

“আমরা জাত-বিভাগ মানি ব'লে।”

“তুমি বোধ হয় আজকাল নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ছ—” হাতের চিঠিখানা ওপর দিকে তুলে ধ'রে স্নেহলতাই বললেন, “রাহুলের সঙ্গে ললিতার অনেক দিনের পরিচয়। তা ছাড়া ললিতার বি-এ পড়ার খরচ তো রাহুলই দিয়েছে।”

কথা শুনে দ'মে গেলেন সুবোধবাবু। তাঁর আসল ছুর্বলতার প্রমাণটা যেন স্নেহলতা বড্ড বেশি স্পষ্ট ক'রে দেখাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুবোধবাবু বললেন, “নিজের পথ নিজেই বেছে নিক ললিতা। ওর কল্যাণ হোক, আমরা তো তাই-ই চাই। কিন্তু—” সুবোধবাবু আর কথা বললেন না।

ভাবতে লাগলেন, অমিয়াংশুর টাকাটা কি ক'রে শোধ দেবেন তিনি। বিয়ের প্রস্তাবটা যদি স্নেহলতা ছু' চারদিনের জন্যেও শুধু মুখের কথায় অনুমোদন করতেন, তাহ'লে সুবোধবাবু অন্তত সেই ক'টা দিনের জন্যে নিজেকে অপরাধী মনে করতেন না। ঋণটা শোধ না করবার সপক্ষে যুক্তি খুঁজে পেতেন। তবুও মনে মনে সুবোধবাবু নতুন একটা নৈতিক যুক্তি খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

স্নেহলতাও রাহুলের সপক্ষে যুক্তি খাড়া করবার চেষ্টা করছিলেন। রাহুলও ভিন্ন সমাজের লোক। কিন্তু ললিতার মতের বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাবই পাকা করা চলবে না। তা'ছাড়া, চিঠিখানা হাতে আসবার পরে তিনি একরকম নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন যে, রাহুলের সঙ্গে ললিতার এবার চিঠিপত্রে ভাব-বিনিময় চলছে। যে-সব কথা মুখের কথায় প্রকাশ করা যায় না, চিঠিপত্রে সে-সব কথা লিখে জানাতে হয়। একটু আগেই তো চন্দনের বাবা প্রমাণ চেয়েছিলেন। স্নেহলতা ভাবলেন, চিঠির বিষয়বস্তুটা এবার জেনে নেওয়া যাক। তিনি নিজে জানলেই, সুবোধবাবুরও জানা হ'য়ে যাবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেয়ের চিঠিখানা পড়তে হবে তাঁকে। অমিয়াংশুকে নিয়ে সুবোধবাবু যেন আর কোনদিন স্বপ্ন না দেখেন। ওর চিন্তা সুবোধবাবুর মন থেকে চিরকালের জন্যে দূর হওয়া দরকার।

স্নেহলতা জিজ্ঞাসা করলেন, "অমিয় কি তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে?"

প্রশ্ন শুনে সজাগ হ'য়ে উঠলেন সুবোধবাবু। এখনো তা'হলে আশা আছে। বোধ হয় স্নেহলতার অনুমোদন পাওয়া যেতে পারে। তিনি বললেন, "সোজাসুজি প্রস্তাব সে করে নি বটে, কিন্তু করতে চায়। আমার কাছ থেকে একটু ইঙ্গিত পেলেই করবে।"

"এছাড়া তোমার আর কোন প্রমাণ নেই?"

"না।"

"রাহুল যে ললিতাকে ভালবাসে তার প্রমাণ আমার হাতেই রয়েছে।"

স্নেহলতার হাতে চিঠিখানা দেখলেন সুবোধবাবু। জিজ্ঞাসা করলেন, "ও কার চিঠি ?"

"মনে হয় রাহুল লিখেছে ললিতাকে। এখনো দেখি নি।"

"অমিয়াংশুর চিঠি হওয়াও অসম্ভব নয়।"

"বাজি রাখবে নাকি ?" হেসে ফেললেন স্নেহলতা।

বাজি রাখবার জন্যে সুবোধবাবু সত্যি সত্যি ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। পকেট থেকে একটা আধুলি বা'র ক'রে তিনি বললেন, "আমি হেরে গেলে আধুলিটা তুমি পাবে। আর তুমি যদি হেরে যাও, তাহ'লে তোমায় কিছু দিতে হবে না। দেরি ক'রো না স্নেহ, ললিতা হয়তো এখুনি এসে পড়বে।" এই ব'লে সুবোধবাবু নিজেই স্নেহলতার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে নিলেন। তিনি আর ধৈর্য ধরতে পারছিলেন না। খোলা খাম থেকে চিঠিটা টান মেরে বা'র ক'রে নিয়ে তিনি বললেন, "ছাখো তো কার লেখা চিঠি ? তলায় নাম সই করেছে কে ?"

গম্ভীর হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন স্নেহলতা। মুহূর্তটা বিলম্বিত হচ্ছে। সুবোধবাবু ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি দেখলে ? কে লিখেছে ?"

"অমিয়াংশু।"

হাসতে হাসতে আধুলিটা স্নেহলতার হাতে গুঁজে দিয়ে সুবোধ বাবু ঘোষণা করলেন, "আমরা দু'জনেই জিতলুম।"

আজও ললিতা সকালের দিকেই বেরিয়ে পড়েছিল বাড়ি থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন এসে পৌঁছল তখন প্রায় সাড়ে

এগারোটা। ক্লাশে গেল না, এক পেয়ালা চা নিয়ে ব'সে রইল ক্যানটিনে। মাসের আজ তিন তারিখ। ললিতা জানতো রাহুল আসবে। টাকা নিয়ে আসবে। আর বোধ হয় রাহুলের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার দরকার হবে না। এম-এ পড়বার ইচ্ছে নেই ললিতার।

সাড়ে বারোটার সময় রাহুল এল। ওর দিকে এগিয়ে ব'সে ললিতা জিজ্ঞাসা করল, "টাকা এনেছ?"

"হ্যাঁ।" শাদা খামখানা রাহুল এগিয়ে ধরল ললিতার দিকে। খামের মধ্যে টাকা ছিল। ললিতা হাত তুলল না, শুধু জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কি এখন কোন কাজ আছে?"

"না। সন্ধে পর্যন্ত আড্ডা মারতে পারি।"

"সন্ধে পর্যন্ত কেন? রাতটাও আমি চাই।"

কথা শুনে রাহুল ভয় পেল। ক্যানটিনের চারদিকে চেয়ে দেখল একবার কোনো চেনা-ছেলের কানে গিয়ে ললিতার কথাটা পৌঁছল কিনা। আপাতত ললিতার জগতে রাহুল ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাই সে বলল, "মাইনের টাকাটা এখন পকেটে রেখে দাও। এমন কোথাও আমায় নিয়ে চলো যেখানে আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ থাকবে না।"

"তেমন জায়গা কলকাতায় নেই।"

"কেন, হোটেলে কি ঘরভাড়া পাওয়া যায় না? তাহলে চলো, ট্রেনে চেপে ডায়মণ্ডহারবার চ'লে যাই। সেখান থেকে সুন্দরবন। অরণ্যের নির্জনতায় শুধু একটা রাত আমরা কাটিয়ে আসব। কারো ক্ষতি আমরা করব না। কাউকে আঘাত দেব না। রাহুল—"

"ললিতা।"

"তুমি ভয় পেলে? না, না, বাঘ ভাল্লুক কেউ আসবে না আমাদের নির্জনতা নষ্ট করতে। তুমি যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি না পুরুষমানুষ ?"

"আমি মানুষ। নীতি মানি।" রাহুল চেয়ে রইল ললিতার দিকে। মুখ নিচু ক'রে কি যেন ভাবছিল ললিতা। আকাঙ্ক্ষার বাষ্প আর নেই। চারদিকের মুখোশ-পরা পৃথিবীটার প্রতি ঘৃণা জন্মাচ্ছে ললিতার। কি আছে এখানে ? এম-এ পাস করবার জন্যে কেন সে সংগ্রাম করবে ? উঞ্ছবৃত্তির ছাই-গাদার মধ্যে কোনো নীতি সে দেখতে পায় না। শক্তিহীনকে শাসন করবার জন্যেই শুধু নীতি-দুর্নীতির হাতুড়ি পিটতে হয়।

রাহুল উঠে পড়েছিল। ললিতা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছ ?"

"হ্যাঁ।"

"চলো-না, তোমাদের বাড়িটা আমি দেখে আসি ?"

"আজ নয়।"

দু'জনেই বেরিয়ে এল বাইরে। উপাচার্যের অফিসের পাশে দাঁড়িয়ে ললিতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, "তুমি নীতির প্রশ্ন তুললে কেন ?"

"অরণ্যের নির্জনতায়ও নীতি মানবার দরকার হয় ললিতা।"

"যদি আমি তোমার স্ত্রী হতুম ?"

"তাহ'লে নীতির প্রশ্ন উঠত না।"

"একটু দাঁড়াও, রাহুল।"

উপাচার্যের অফিসের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাহুল গুপ্ত। একটু পরেই ললিতা বলতে লাগল, "তোমার সঙ্গে তো আমার ভালবাসার সম্পর্ক। ভালবাসা বলতে তুমি কি বোঝ আমি জানি না। রাহুল, চলো আমরা বিয়ে ক'রে ফেলি। দু'দশ মিনিটের মধ্যে বিয়েটা শেষ ক'রে ফেলা যায় না ? ধরো উপাচার্যের সামনে

দাঁড়িয়ে যদি আমরা প্রতিজ্ঞা করি?…আমায় একটা অবলম্বন দাও, রাহুল।”

“টাকাটা রাখো—” খামখানা এগিয়ে ধরল রাহুল গুপ্ত। ধরবার জন্যে চেষ্টাও করল না ললিতা। সে বলল, “টাকার আর দরকার নেই।”

“কেন?”

“আমি আর এম-এ পড়ব না।”

“কি করবে?”

“বিয়েটা যখন দু'দশ মিনিটের মধ্যে হ'ল না, তখন চাকরি করব ভাবছি। ধন্যবাদ। তোমার সঙ্গে পরিচয় না হ'লে বি-এ পাসও করতে পারতুম না। আবার কবে আসছ রাহুল?”

“কাল, পরশু—”

“এবার থেকে কর্নেল বিশ্বাস রোডে পায়ের ধুলো দিয়ো। দেওয়া দরকার, নইলে অমিয়াংশুর পায়ের ধুলোয় ঘরখানা ভর্তি হ'য়ে যাবে।”

রাহুল আর অপেক্ষা করল না। ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। হাঁটতে লাগল কলেজ স্ট্রীটের দিকে। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ললিতা দেখতে লাগল ওকে। সমাজ-ইতিহাসের দু'একটা পুরনো পাতা ওলটাতে লাগল মনে মনে। সামন্ত যুগের ধনী বোহিমিয়ান নয় রাহুল গুপ্ত। বুর্জোয়া বোহিমিয়ানদের সঙ্গেই বা মিল কই ওর? রাহুল গুপ্তের পরিচয় আজও রহস্যাবৃত হয়ে রইল ললিতার চোখে।

দাদা বৌদির কড়া তাগিদ সত্ত্বেও অমিয়াংশু পোস্ট অফিসের চাকরিতে ইস্তফা দেয় নি। গতকাল বড়দার কাছ থেকে টেলিগ্রাম এসেছে। এক্ষুনি ওকে দিল্লী যেতে হবে। এক্ষুনি তো দূরের

কথা, আজও সে রওনা হওয়ার জন্যে তৈরি হয় নি। ছুটি নিয়ে হোটেলে শুয়ে আছে। তিন দিন আগে বিছানায় শুয়ে ললিতার কাছে চিঠি লিখেছে। সাধারণ চিঠি। ললিতারা কে কেমন আছে, রাহুলের সঙ্গে দেখা হয় কিনা, ও নিজে এখন দিল্লী যাচ্ছে না, ইত্যাদি। আসল কথাগুলো খুলে সে লিখতে পারে নি। লিখতে ভয় পেয়েছে অমিয়াংশু। ঝোপ বুঝে কোপ মারবার জন্যে তৈরি থাকাই ভাল। ললিতার মনের খবর আগে জেনে নিতে হবে। রাহুল গুপ্তের প্রতি ললিতার ভালবাসা গভীর কি না তাও সে বুঝতে পারে নি। তবে একটা কথা অমিয়াংশু বুঝতে পেরেছে। ললিতারা কেউ বড়লোকদের প্রীতির চোখে দেখে না। মূল্যবান বেশভূষা কাউকে পরতে দেখলে ওরা মনে মনে হাসে। পাঁচখানা ঘরের লোভ দেখিয়েও ললিতাকে সে এক পা-ও দিল্লীর দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে নি। বিছানায় শুয়েও অস্বস্তি বোধ করতে লাগল অমিয়াংশু সেন। ললিতাকে পাওয়ার জন্যে সাধনা করতে হবে না কি? দু' একটা ব্যাপারে সাধনা সে করছে। দামী জামাকাপড় সব তুলে রেখেছে। পাজামা প'রে গতকাল সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। চৌরঙ্গী দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চ'লেও এসেছিল পার্ক স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত। দাদা বৌদিরা দেখতে পেলে লজ্জায় ম'রে যেতেন। হয়তো বা তাঁরা ভেবে বসতেন অমিয়াংশু পাগল হ'য়ে গেছে।

বিছানায় উঠে বসল অমিয়াংশু। পাজামার তলার দিকটা একটু ছিঁড়ে ফেললে কেমন হয়? রাহুল গুপ্তের মত একজোড়া ছেঁড়া চটি সে পয়সা দিয়েও কিনতে রাজী আছে। এস্প্লানেডের হোটেল ছেড়ে দিয়ে হ্যারিসন রোডে গিয়ে থাকবে ব'লেও ভাবছে আজকাল। সেইজন্যে সে এখনো পোস্ট অফিসের কাজে ইস্তফা দেয় নি। বড় চাকরির চাকচিক্য ললিতারা সহ্য করতে পারবে

না। ললিতার জন্যে অমিয়াংশু ছোট হ'য়ে থাকতে চায়। মনের অস্বস্তি বাড়তে লাগল ওর। হঠাৎ এমন হাসিখুশীর সংসারটায় বিষাদের ছায়া পড়ল কি ক'রে ?

পাজামা প'রে অমিয়াংশু বেরিয়ে এসে দাঁড়াল হোটেলের বারান্দায়। এখান থেকে এস্‌প্লানেডের রাস্তাটা দেখা যায় না। দেখা যায় না বটে, কিন্তু অমিয়াংশু বুঝতে পারল ডালহাউসির দিক থেকে মস্তবড় একটা শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে এস্‌প্লানেডের রাস্তায়। হল্লা-চিৎকার কানে এল ওর। চেঁচাবার জন্যে পাগল হ'য়ে উঠল অমিয়াংশু। ভাগ্যহীনদের সঙ্গে মার্চ ক'রে এগিয়ে যাবে ও। কেন যাবে, কোথায় যাবে তার বিবরণ সে জানতে চায় না। মনের অস্বস্তি চিৎকারের মধ্যে দিয়ে মুক্তি পেলেই হ'ল। মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে এই পর্যন্ত সেন-পরিবারের একটা লোকও বিক্ষোভ দেখায় নি, চেঁচাবার প্রয়োজন বোধ করে নি তারা। অমিয়াংশু আর অপেক্ষা করতে পারল না। পাজামা প'রেই নেমে এল নিচে। গলিটা পার হ'য়ে এল এক নিশ্বাসে। শোভাযাত্রা পৌঁছে গেছে গলির মুখে। অমিয়াংশু প্রথম সারির মধ্যে ঢুকে পড়ল। সরকারী কর্মচারীদের শোভাযাত্রা। সদ্য-ইস্ত্রিকরা ধুতিপাঞ্জাবি আর ট্রাউজার-পরা কর্মচারীদের দেখতে পেল অমিয়াংশু। সামনের সারিতে দাঁড়িয়েও উত্তেজনা ওর নিস্তেজ হ'য়ে আসছিল। এরা সব প্রতিবাদ করতে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু অমিয়াংশুর মনে হ'ল এদের প্রতিবাদের গায়েও ধোপ-দুরস্ত পোশাক লাগানো। এরা শুধু মাইনে বাড়াতে চায়। দেড়শো বছরের পুরনো সামাজিক রোয়াকটাকে ভেঙেচুরে ধুলোর সঙ্গে উড়িয়ে দিতে চায় না। শৌখিন শোভাযাত্রার সামনে এসে দাঁড়াল অমিয়াংশু। চৌরঙ্গীর মোড়ে ট্রাম বাস গাড়ি সব-কিছু এসে আটকে গেছে। শোভাযাত্রা চলেছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের

দিকে। ধর্মতলার মুখে এসে অমিয়াংশু চেঁচিয়ে উঠল, "ইনক্লাব জিন্দাবাদ।" একবার চেঁচিয়েই শান্ত হ'ল না সে। দেহ-মনের পুরো সামর্থ্য দিয়ে ধ্বনির মাত্রা বাড়াতে লাগল। শুধু ভারতবর্ষের রোয়াকটাকে ভাঙলে চলবে না। পৃথিবী জুড়ে আজ যে-রোয়াকটা শক্তিশালীদের আড্ডার পীঠস্থান হ'য়ে উঠেছে তার ভিতসুদ্ধ ভেঙে ফেলতে হবে। মুহুর্মুহুঃ ধ্বনি তুলতে লাগল অমিয়াংশু সেন। ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে আর ধাক্কা দিয়ে পথ চলছে সে। পাজামার তলার দিকটা কখন যে ছিঁড়ে গেছে তাও সে খেয়াল করে নি। কাবুলী চটিও ক্ষতবিক্ষত হ'ল। এমন সময় ডান পাশের ট্রাম থেকে ওর নাম ধ'রে ডেকে উঠল ললিতা, "অমিয়, অমিয়াংশু—"

"কে?" ললিতাকে দেখতে পেয়ে অমিয়াংশু এবার স'রে দাঁড়াল শোভাযাত্রার পাশে। জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছ?"

ট্রামের পথ তখনো বন্ধ। ওখানে ব'সেই ললিতা বলল, "তোমার হোটেলেই যাচ্ছিলাম।"

"তাহ'লে নেমে এসো।"

"আজ থাক। তুমি তো এখন ব্যস্ত আছ।"

"ব্যস্ত?" কথাটা যেন গ্রীক ভাষার চেয়েও বেশি দুর্বোধ্য ব'লে মনে হ'ল অমিয়াংশুর, "আমার তো সময় আর কাটতে চায় না ললিতা। ব্যস্ত আমি কোনদিনই ছিলাম না। পৃথিবীর একটা লোকও ব্যস্ত নয়। কারো কিছু করবার নেই—ট্রাম ছেড়ে দিচ্ছে। নেমে পড়ো শিগগির—"

"এপাশে এসে দাঁড়াও। আমি নামছি।" ললিতা উঠে পড়ল।

দুটো ট্রামের ফাঁক দিয়ে রাস্তা পার হ'ল অমিয়াংশু। শোভা-যাত্রাটা কখন যে ধর্মতলার মোড় পেরিয়ে গেল তাও সে দেখতে

পেল না। হয়তো শোভাযাত্রার কথা ভুলেও গেছে সে। ললিতা এসে জিজ্ঞাসা করল, "ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যাবে না ?"

"সেখানে কেন যাব ?"

"বক্তৃতা শুনতে। একটু আগেই তো নেচে নেচে শ্লোগান দিচ্ছিলে।" এই ব'লে ললিতা একটু হাসলো।

মুহূর্তের মধ্যে অমিয়াংশুর মনে হ'ল সারা দুপুরটা আজ সে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেছে। দুঃস্বপ্ন।

চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়িয়ে অমিয়াংশু বলল, "বড্ড হাঁপিয়ে পড়েছি। চলো, কোথাও ব'সে চা খেয়ে নিই। তারপর সন্ধের শো-তে পিকচার দেখব।"

"জামাকাপড় বদলাবে না ?" রাস্তা পার হ'তে লাগল ললিতা। অমিয়াংশুও এল ওর পিছু পিছু। উত্তেজনা আর নেই। এত সহজে এবং এত তাড়াতাড়ি ললিতা যে ওর কাছে এসে দাঁড়াবে তেমন কথা অমিয়াংশু ভাবতে পারে নি। সারা দুপুরের স্বপ্ন বিকেল চারটের সময় সার্থক হয়েছে। মাত্র চারটে। হোটেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ললিতা জিজ্ঞাসা করল, "পাজামাটা ছিঁড়ল কি ক'রে ? মারপিট করেছ নাকি ?"

"ভিড়ের মধ্যে কখন যে ছিঁড়ে গেল—যাক, যাক। তুমি যখন শেষ পর্যন্ত এসেই পড়েছ তখন আর ক্ষতির কথা ভাবব না। ললিতা, এখন বলো কি ছবি দেখবে আজ ?"

"ছবি কেন ? তোমার হোটেলে ব'সে গল্প করা যায় না ?"

"যায়, খুব যায়। মস্তবড় ওয়েটিং-রুম আছে। নয় তো লাউঞ্জেও বসতে পারি।"

ফটক দিয়ে হোটেলে ঢুকল ওরা। অমিয়াংশু আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ললিতাকে। ওয়েটিং-রুমের সামনে এসে ললিতা জিজ্ঞাসা করল, "তোমার ঘরে কি অন্য কেউ থাকে ?"

"না তো।"

"আমি একটু নিরিবিলি জায়গাতে গিয়ে বসতে চাই অমিয়।"

"তা হ'লে—" অমিয়াংশুর গলা প্রায় শুকিয়ে এসেছে।

"তা হ'লে চলো তোমার ঘরে গিয়ে বসি। কোন্ দিকে যেতে হবে?"

"দোতলায়—" অমিয়াংশুকে যেন ঠেলতে ঠেলতে দোতলায় তুলতে লাগল ললিতা। পরিস্থিতি এত বেশি সরল হ'য়ে এল যে, অমিয়াংশুর সন্দেহ হ'ল, আবার সে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে না তো?

ঘরের দরজা খোলাই প'ড়ে ছিল। তালা লাগাবার সময় পায় নি ও। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ললিতা জিজ্ঞাসা করল, "ঘরে ঢুকছি ব'লে তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

"আমার কি অসুবিধে?"

"হোটেলের নিয়মকানুন আমার জানা নেই।" ঘরের মধ্যে ঢুকে ললিতাই আবার বলল, "দু' একটা নিয়ম ভাঙতে না পারলে মনের অশান্তি দূর হচ্ছে না অমিয়। তুমি এমন পাথরের মত শক্ত হ'য়ে গেলে কেন?"

"কি যে বলো!"

অমিয়াংশুর কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করল ললিতা। ঘরের কোণ থেকে চেয়ারটা সে এগিয়ে নিয়ে এল ললিতার দিকে। এনে বলল, "বোসো। খুব বড় হোটেল এটা নয়, আসবাবগুলো তাই খুবই সাধারণ।"

ললিতা বুঝতে পারল, অমিয়াংশু ভয় পেয়েছে। ও ভেবেছিল, ললিতা হয়তো বিছানার ওপর ব'সে পড়তে পারে। বুর্জোয়া-রুচির প্রমাণগুলো এক এক ক'রে ললিতার চোখে পড়তে লাগল।

টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে ললিতা জিজ্ঞাসা করল, "এই ফটোটা কার অমিয় ?"

"বাবার।" গৌরবান্বিত বোধ করল অমিয়াংশু সেন। হেসে হেসে বলতে লাগল সে, "যদিও মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে সেন-পরিবারেব প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে, কিন্তু সত্যিকারের প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন বাবা। দিল্লীর বাড়িটা তিনিই তৈরি ক'রে রেখে গেছেন।"

ইলেকট্রিক পাখার গতি বাড়িয়ে দিল ললিতাই। ঘুরে ঘুরে ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র সবই দেখতে লাগল সে। ড্রেসিং-টেবিলের সামনে গিয়ে ললিতা জিজ্ঞাসা করল, "এই বোধ হয় তোমার বৌদিদের ফ'টো ?"

"হ্যাঁ। বড় বৌদি এসেছেন স্যার কে. জি. গুপ্তের বংশ থেকে। বিখ্যাত কে. জি. গুপ্তের নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ ?" রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে লাগল অমিয়াংশু।

ললিতা বলল, "না তো। ব্রিটিশ আমলের শুধু একটা নামই আমি মনে রেখেছি। গুপ্ত কিংবা সেন বংশের তিনি কেউ নন।"

"তবে তিনি কে ললিতা ?"

"লর্ড মাউন্টব্যাটেন, স্বাধীনতার নাম ক'রে যিনি ভারতবর্ষকে তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন। আর এখন তো হাতেও কিছু রাখো নি তোমরা, পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলে সব। অমিয়, এক গ্লাস জল খাওয়াতে পার ?"

"নিশ্চয়। তুমি একটু ব'সো। আমি আসছি। ব'সে ব'সে খবরের কাগজটা পড়ো।" অমিয়াংশু একটা ইংরেজী দৈনিক তুলে ধরল ললিতার দিকে। কাগজটা হাতে না নিয়ে ললিতা বলল, "দরকার নেই। পরে আবার হাত ধোবার জন্যে স্নান-ঘরে ঢুকতে হবে।"

"ঘরের সঙ্গেই তো স্নান-ঘর—মানে—"

ললিতাকে হাসতে দেখে অমিয়াংশু তার বক্তব্য আর শেষ করতে পারল না। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চা আর কিছু খাবার তার ঘরে পাঠিয়ে দেওয়ার হুকুম দিয়ে লাউঞ্জে এসে ব'সে পড়ল অমিয়াংশু। সিগারেট ধরাল। ললিতা এত বেশি কাছে এগিয়ে এসেছে ব'লে অমিয়াংশু একটু দূরে স'রে যেতে চাইল। ভয় সে অবশ্যই পেয়েছে। ললিতার প্রতি আর যেন সে তেমন বেশি আকর্ষণ বোধ করছে না। সুবোধবাবুর মেয়ের বোধ হয় সম্ভ্রম-বোধ কম। নইলে সে অমিয়াংশুর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল কি ক'রে? তবে কি রাহুল গুপ্তকে ললিতা আর ভালবাসে না? বোধ হয় না। উৎসাহিত বোধ করল অমিয়াংশু সেন। ললিতা নিশ্চয়ই ওকে ভালবাসে। ভালবাসার রাজ্যে নীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন নেই। হোটেলের কামরায় এসে ঢুকে পড়ল ব'লে বিন্দুমাত্র সম্ভ্রম হারায় নি ললিতা। ভালবাসার জন্যে মানুষ কি না করে! ললিতা শুধু ওর ঘরে ঢুকেছে। আর ভয় নেই। দাদা বৌদিদের আভিজাত্য সে স্বীকার করে না। কে. জি. গুপ্তের নাম ললিতা শোনে নি। হয়তো এ যুগের কেউ-ই শোনে নি। সুবোধবাবু ক্লাশ 'থ্রী'র কেরানী। ললিতা তাঁর মেয়ে। ভালবাসার পক্ষে এইটুকু পরিচয়ই কি যথেষ্ট নয়?

লাউঞ্জে ব'সে অমিয়াংশু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মাত্র পঁচিশ বছর বয়স ওর! শরীরের সর্বত্র অস্বস্তির জ্বালা। উত্তপ্ত লাভা-স্রোতের গলদ জমছে। মনে মনে বলতে লাগল, যাকে ভালবাসা যায় তার সাত খুনও মাপ। অমিয়াংশু উঠে পড়ল। সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল ছুঁড়ে। ঠোঁটের ফাঁকে তাপ লাগছে। তামাকের তাপ লাগাবার জন্যে ঠোঁটের সৃষ্টি হয় নি।

ভগবানের কি বিস্ময়কর পরিকল্পনা! তিনি শুধু ভগবান নন, মানুষও। নিজের অনুভূতি থেকে সৃষ্টি করেছেন রক্তমাংসের আকাঙ্ক্ষা।

কামরায় ফিরে এল অমিয়াংশু। বেয়ারা চা আর খাবার দিয়ে গিয়েছিল। ললিতা খাবার কিছু খায় নি। চা-এর পেয়ালা হাতে নিয়ে বসেছিল। অমিয়াংশু জিজ্ঞাসা করল, "খাবারগুলো যে প'ড়ে রইল ?"

"ক্ষিদে নেই। ইউনিভারসিটির ক্যানটিনে আজ খেয়ে এসেছি। জানো, আমি আর এম-এ পড়ব না ?"

"তার মানে ?" অমিয়াংশু ঝুঁকে বসলো ললিতার দিকে।

"চাকরি করব। কোথাও একটা চাকরি জুটিয়ে দাও না অমিয়।" চা-এর পেয়ালাটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে ললিতাই বলতে লাগল, "তোমরা তো ইচ্ছে করলেই চাকরি একটা দিতে পারো। দরকার হয় তোমার দাদাদের কাছে চিঠি লেখো। আমি দিল্লী যেতেও রাজী আছি। লেখাপড়া যখন ছেড়ে দিলুম তখন যেখানেই হোক আমি চ'লে যেতে পারি। শুধু ঘরের বৌ হ'য়ে বাস করতে পারব না।"

"কিন্তু—" অমিয়াংশু পায়চারি করতে লাগল, "কিন্তু তোমার বাবা কি মত দেবেন ?"

"বাবার মত অনুসারে এযাবতকাল কোনো কিছুই হয় নি। তা ছাড়া টাকা আমাদের দরকার। টাকার অভাব বলেই চন্দনকে ভালভাবে মানুষ করা যাচ্ছে না। ছেলের ওপর বাবার নৈতিক শাসন পর্যন্ত ঢিলে হ'য়ে গেছে। কি আর করা যায় বলো—" ললিতা উঠে পড়ল। অমিয়াংশু জিজ্ঞাসা করল, "চললে না কি ?"

"সন্ধে হ'য়ে এল। আলোটা জ্বালিয়ে দিই। আমার অবিশ্যি অন্ধকারই ভাল লাগে।"

"তা হ'লে থাক না—"

"থাকবে? ভয় করবে না তোমার?"

"তোমায় আমি ভালবাসি ললিতা।" ফস ক'রে ব'লে ফেলল অমিয়াংশু।

সুইচ টিপে আলো জ্বালাতে যাচ্ছিল ললিতা। অমিয়াংশুর কথা শুনে সহসা থেমে গেল সে। ভাবতে লাগল। তারপর অমিয়াংশুর দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘাড়ের ওপর হাত রাখল ওর। দু' একটা মুহূর্ত কেটেও গেল। দু'জনেই বোধ হয় মনে মনে কথা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। শুধু 'ভালবাসি' বললেই তো সবটুকু বলা হয় না। আর, যা বললে অমিয়াংশুর সুবিধে হয় তেমন দু'চারটে কথা সংগ্রহ ক'রে ললিতা জিজ্ঞাসা করল, "কি চাও আমার কাছে?"

"তোমাকে ভালবাসতে চাই।"

"তা হ'লে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আসি। তুমি তো খুলে রেখে এসেছিলে। অমিয়?"

"ললিতা—"

"তুমি ভয় পেলে না কি? তোমার সারা শরীর কাঁপছে।" এই ব'লে ললিতা আলো জ্বালিয়ে দিল। তারপর আলনা থেকে বড় একটা টার্কিশ তোয়ালে নিয়ে অমিয়াংশুর ঘাড়ের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ললিতা বলল, "কী ভীষণ ঘেমে গেছ তুমি!"

অপেক্ষা করবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। এবার বাড়ি ফিরে যেতে হবে। মা হয়তো ভাবছেন। সংসারে মা ছাড়া আর তো কেউ এমন নিঃস্বার্থভাবে ললিতার জন্যে ভাবে না। নিচে নামতে নামতে ললিতা বলল, "কাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক থাকবে না। কর্নেল বিশ্বাস রোডে তুমি এসো অমিয়। যখন খুশী চ'লে এসো।"

এসপ্লানেডের মোড়ে এসে অমিয়াংশু জিজ্ঞাসা করল, "রাহুল গুপ্ত কি আজকাল ওখানে যায় না ?"

"খুব কম।"

"কেন ?"

"রাহুল তো রক্তমাংসের মানুষ নয়।"

"তবে ?"

প্রদেশপালের প্রাসাদের দিকে চেয়ে ললিতা জবাব দিল, "রাহুল বোধ হয় একটা আইডিয়া।"

"আমি ওর ঠিকানা জানি।" অমিয়াংশু পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, "ঠিকানা-লেখা কাগজটা এখন আমার সঙ্গে নেই। কাল আমি ওর ঠিকানাটা তোমার কাছে ডাকে পাঠিয়ে দেব। একদিন গিয়ে ওদের বাড়িটা দেখে এসো।"

পার্ক সার্কাসের ট্রামে উঠে পড়ল ললিতা। ট্রামটা চ'লেও গেল।

অমিয়াংশু তবু দাঁড়িয়ে রইল এসপ্লানেডের মোড়ে। ভাবতে লাগল, সুবোধবাবুর কাছ থেকে ধারের টাকাটা চেয়ে নেবে কি না।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

সেদিন সুবোধবাবু বাড়ি ফিরে এলেন বিকেল বেলা। অফিস ছুটি হওয়ার অনেক আগে। স্নেহলতা ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন, সুবোধবাবুর হয়তো অসুখ বিসুখ ক'রে থাকবে। অভাবের সংসারে দুর্নীতির চেয়েও বেশি ভয় অসুখের। স্নেহলতা জিজ্ঞাসা করলেন, "এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে? শরীর ভাল আছে তো?"

অফিসের কাপড় প'রেই সুবোধবাবু শুয়ে পড়লেন। ড্রইং-রুমের কোন ব্যবস্থা নেই ব'লে চৌকির ওপর বসতে হয়। মেরুদণ্ড খাড়া রেখে বেশিক্ষণ চৌকির ওপর ব'সে থাকা যায়ও না। শুয়ে পড়তে বাধ্য হন সুবোধবাবু। আজও নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নি। স্নেহলতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "শরীর ভাল আছে তো?"

"ভাল।"

"তবে এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে কেন?"

"এমনিই—" কাৎ হ'য়ে হাতের চেটোয় মাথা রেখে সুবোধবাবু বলতে লাগলেন, "বিনোদ বক্সির রোয়াকটা চন্দনকে গ্রাস করেছে। আজ দেখলুম, রোয়াকে ব'সে চন্দন সিগারেট খাচ্ছে।"

"ডেকে নিয়ে এলে না ছেলেটাকে?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন স্নেহলতা।

"কি হবে? শাস্তি দিতে হ'লে তো অস্ত্র চাই—"

"অস্ত্র?"

"হ্যাঁ। গুলি-গোলা কেনবার মত পয়সা নেই আমার। ঘরে একটা আলপিন থাকলেও খোঁচা মারতে পারতুম। যাক—" উঠে বসলেন সুবোধবাবু, "মেয়েটা রক্ষা পেয়েছে। বিনোদ

বস্তির রোয়াক ললিতাকে ছুঁতে পারে নি। এতদিন যখন পারে নি, আর পারবে না।” সুবোধবাবু নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। সিগারেটও ধরিয়ে ফেললেন একটা। একটু বাদেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “ললিতা কি আজকাল ইউনিভারসিটিতে যায় না? প্রায়ই তো দেখি ঘরে ব’সে আছে।”

“এম-এ পড়া ছেড়ে দিয়েছে। প্রায় দু’ মাস হ’য়ে গেল। কেন, তোমাকে তো একদিন বলেছিলাম?”

“ভুলে গেছি বোধ হয়।” একটু থেমে সুবোধবাবুই বলতে লাগলেন, “জানো স্নেহ, পোস্ট অফিসে আজকাল মেয়েরা চাকরিতে ঢুকছে?”

“আমি কি ক’রে জানব, আমি কি কোনদিন পোস্ট অফিস দেখেছি?”

“ও, তাই তো—তুমি কেন যাবে পোস্ট অফিসে। খাম পোস্টকার্ডও কেনবার তোমার দরকার হয় নি। তোমার জীবনই খুব সুখে কাটল স্নেহ।”

স্নেহলতা কোন মন্তব্য প্রকাশ করলেন না। স্বামীর মুখের দিকে তিনি চেয়ে ছিলেন। সুবোধবাবুর হাবভাব সব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। স্নেহলতা জানেন, চন্দনের বাবা এখনো আসল বক্তব্য প্রকাশ করেন নি। ধৈর্য ধরতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে তাঁর মনের কথা জানবার জন্যে।

সুবোধবাবু এবার গন্তব্যের দিকে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলেন। হঠাৎ এক সময়ে তিনি ব’লে ফেললেন, “হ্যাঁ, এই-ই ভাল হ’ল।”

“কি ভাল হ’ল? কার ভাল হ’ল?” জিজ্ঞাসা করলেন স্নেহলতা।

“ভাল হ’ল ললিতার। পরের পয়সায় এম-এ পড়বার দরকার কি? তা ছাড়া রাহুল গুপ্তকে আমরা চিনিও না।”

"অমিয়াংশুকেও বা আমরা চিনলুম কই?"

সুবোধবাবুর দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসার চিহ্ন। টাকা পয়সার ব্যাপারে অমিয়াংশুর নামটা উঠে পড়ল বুঝি। বিচলিত বোধ করলেন সুবোধবাবু। তবে কি তাঁর সেই পুরনো ঋণের খবরটা স্নেহলতার কানে গিয়ে পেঁাচেছে? অসম্ভব নয়। অমিয়াংশু সেন বড়লোক ব'লেই হয়তো কথাটা গোপন ক'রে রাখতে পারে নি। কিংবা সে বুঝতে পেরেছে ললিতা ওকে ভালবাসে না। এযাবতকাল সুবোধবাবু নিজের মনকে বুঝিয়ে ছিলেন যে, একশো টাকার ধারটা টেক্‌নিকেলি ধার ছাড়া আর কিছু না। সোনার গহনা বাঁধা রেখেও তিনি বাজার থেকে ধার পেতে পারতেন। সোনার গহনা কিছু নেই ব'লেই তো তিনি বাজারে বেরুতে পারেন নি। অফিসে ব'সেই ধার পেলেন। অমিয়াংশু যদি নিজের মনে কল্পনা ক'রে থাকে যে, টাকা নেওয়ার সময় সুবোধবাবু তাঁর মেয়ের ভালবাসা বাঁধা রাখছেন ওর কাছে, তা হ'লে ভুল হয়েছে সেন সাহেবের, সুবোধবাবুর নয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "অমিয়াংশুর কথা তুললে কেন? তার সঙ্গে তো আমাদের টাকা পয়সার সম্বন্ধ নেই।"

অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লেন সুবোধ মিত্র। ভেবেচিন্তে স্নেহলতা বললেন, "টাকা পয়সার সম্বন্ধ ছাড়া মানুষের সঙ্গে আজকাল আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। এ সব আলোচনা থাক। এবার ললিতার একটা ব্যবস্থা করো। বিয়ে দিয়ে দাও।"

"কার সঙ্গে দেব?" জিজ্ঞাসা করলেন সুবোধ মিত্র।

"রাহুল আর অমিয়াংশুকে বাদ দিয়ে যার সঙ্গে হয় দিয়ে দাও।"

"উপযুক্ত পাত্র খুঁজে বা'র করা খুবই মুশকিল।" সুবোধবাবু যেন ঘরে ব'সেই পাত্র খুঁজতে লাগলেন। স্নেহলতা বুঝতে

পারলেন চন্দনের বাবা সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার পথ খুঁজছেন। স্নেহলতা একরকম মরিয়া হ'য়েই বললেন, "হয় মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করো, নয় তো ওর এম-এ পড়বার টাকা দাও। বিনোদ বক্সি ললিতাকে চাকরি দেবে ব'লে লোভ দেখিয়েছে। তাকে ইংরেজী পড়াবার ভার নিয়েছে ললিতা।"

"ভার নিয়েছে? কবে থেকে নিয়েছে?" সুবোধবাবুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি আর ব'সে থাকতে পারলেন না। মন এবং দেহ দু' জায়গাতেই আঘাত পেলেন তিনি। প্রচণ্ড আঘাত। আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, "কবে থেকে পড়াচ্ছে ললিতা?"

"দু' মাস হ'য়ে গেছে।"

"কই, আমি তো কিছু জানি না!" ছটফট করতে করতে সুবোধবাবুই জিজ্ঞাসা করলেন, "কত টাকা মাইনে পায় সে?"

"আমি তা জানি না। বলো তো জিজ্ঞাসা করতে পারি।"

"ললিতা কই? ডাকো ওকে—" সুবোধবাবু নিজেই ডাকতে লাগলেন, "ললিতা, ললিতা—"

জবাব তিনি পেলেন না। ললিতা বাড়ি ছিল না। স্নেহলতা জানতেন, ললিতা আজকাল রাত ক'রে বাড়ি ফেরে। প্রথম প্রথম সপ্তাহে দু'দিন ক'রে পড়াতে হ'তো। এখন তো পুরো সপ্তাহটাই বিনোদ বক্সি পড়া শিখছে ললিতার কাছে। স্নেহলতা বাধা দেন নি। চেষ্টা করলেও পারতেন না। দু'বেলা দুটো ভাত পাওয়া ছাড়া মেয়েটা তাঁদের কাছ থেকে আর কি পেয়েছে? গতমাসে ললিতা পঞ্চাশটা টাকাও দিতে চেয়েছিল। স্নেহলতা নেন নি। ললিতা বলেছিল, এটা ধারের টাকা নয়। তার উপার্জনের একটা অংশ সে দিতে চাচ্ছে। স্নেহলতা তবুও হাত পেতে একটা টাকাও নিতে পারেন নি। তিনি জানতেন, বিনোদ বক্সিকে

সুবোধবাবু পছন্দ করেন না। বরং ঘৃণাই করেন। সেইজন্যেই কি স্নেহলতা ললিতার কাছ থেকে টাকা নেন নি? শুধু সেই জন্যে নয়। তাঁর সেদিন মনে হয়েছিল, ললিতা টাকা দিচ্ছে এ বাড়িতে সে থাকে এবং খায় ব'লে। থাকা এবং খাওয়ার সম্পর্ক-টুকুও যদি টাকার বিনিময়ে চুকিয়ে দিতে হয় তা হ'লে মেয়ের ওপর আর কি তাঁদের দখল রইল? আজ তিনি বুঝতে পারছেন টাকা না নিলেও দখলের কৌশল পুরোপুরি সার্থক হয় নি। ললিতাকে ধ'রে রাখবার নৈতিক সামর্থ্য তাঁদের নেই। অতএব তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব তিনি পেশ করেছিলেন সুবোধবাবুর কাছে। স্নেহলতা জানতেন, বিয়ে হ'য়ে গেলে মেয়ের সামনে মুখ উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারতেন তাঁরা। দূরের মানুষ ব'লে বিনোদ বক্সির অপরাধ চোখে পড়ে চন্দনের বাবার। কিন্তু নিজেদের অপরাধের কথা একবারও স্মরণ করেন না তিনি।

ললিতার সাড়া না পেয়ে সুবোধবাবু ভীষণভাবে উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। কি যে করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। মাথা ঠুকে ম'রে যাওয়ার ইচ্ছে যে তাঁর হয় নি তাও নয়। কিন্তু পলস্তারা-খসা দেওয়ালের দিকে চেয়ে মাথা ঠুকে মরবার আকাঙ্ক্ষাও আর রইল না তাঁর। সোনা-কুঠির গোকুল সরকারকে ধন্যবাদ। শুধু পলস্তারা নয়, ইটের বুক থেকেও রক্ত চুষে খেয়ে ফেলেছে সে। অতএব দেওয়ালের গায়ে মাথা ঠোকবার বাতুলতা বুঝতে পেরে সুবোধবাবু পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে ফেললেন। স্নেহলতা জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাচ্ছ?"

"বিনোদ বক্সির ওখানে "

"কেন?"

"ললিতাকে ডেকে নিয়ে আসব।"

"পড়ানো হ'য়ে গেলে সে নিজেই আসবে।"

দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে সুবোধবাবু বললেন, "বিনোদ বক্সির কাজে ললিতা জবাব দিক। আমি ওকে চাকরি যোগাড় ক'রে দেব। ভাবছ আমি ওর কলেজের মাইনে দিতে পারি নি ব'লে চাকরি দিতে পারব না?"

"তোমার সামর্থ্যের ওপর আমার বিশ্বাস ষোল আনা। কিন্তু ললিতার বিশ্বাস যদি না থাকে, তা হ'লে ওকে দোষ দেবে কি ক'রে? দাঁড়াও—"

স্নেহলতাও এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে।

প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়ে সুবোধবাবু যেন গর্জন ক'রে বলতে লাগলেন, "কালই আমি ওকে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যাব পোস্ট অফিসে। দেখো, চাকরি হয় কি না। সুপারিনটেনডেন্ট বোস-সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হ'য়ে গেছে।"

"কবে কথা হয়েছে?" জিজ্ঞাসা করলেন চন্দনের মা।

আরও কয়েকটা সিঁড়ি নিচে নেমে গিয়ে সুবোধবাবু জবাব দিলেন, "ছ'মাস আগে।"

"এতদিন তবে বলো নি কেন?"

"আমি ওর বাপ, কখন কি বলতে হবে সে আমি জানি। সব দায়িত্ব আমার। স্নেহ, চিরকাল আমি গরিব ছিলুম—ছোট ছিলুম না। তোমরা সবাই মিলে আজ আমাকে ছোট ক'রে দিয়েছ।" সিঁড়ির রেলিং-এর ওপর ভর দিয়ে দু'এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন সুবোধবাবু। পুরনো পচা কাঠ, ভর দিতে গিয়ে রেলিং-এর একটা টুকরো খ'সে প'ড়েও গেল মাটিতে। না পড়লে যেন সুবোধবাবুর সম্বিৎ ফিরে আসত না। বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে তিনি থেমে থেমে ঘোষণা করতে লাগলেন, "আজকাল পোস্ট অফিসেও মেয়েরা চাকরি পাচ্ছে। ললিতাও পাবে। কাল একটা দরখাস্ত লিখে আমার সঙ্গে যেন দিয়ে দেয়।...সুরুতেই

ললিতা যা মাইনে পাবে···বি-এ পাস কিনা।” কপালের ঘাম মুছতে মুছতে তিনি বেরিয়ে এলেন কর্নেল বিশ্বাস রোডে।

সামনের দিকে না গিয়ে সুবোধবাবুর উচিত ছিল পেছন দিকের পথ ধরা। আহেরীপুকুর পেরিয়ে স্টোর রোডে এসে পৌঁছতে পারলে খানিকটা নির্জনতা পেতেন তিনি। রাগ-বিদ্বেষ ক’মে যেত তাঁর। কিন্তু তা তিনি করলেন না। একেবারে সোজা এসে উপস্থিত হলেন বিনোদ বক্সির রোয়াকের সামনে। প্রতিদিনকার মত আজও এখানে ছেলেদের ভিড় দেখলেন তিনি। কাউকেই তিনি চেনেন না। তা ছাড়া রোয়াকের ধারে কাছে কোথাও আলো নেই ব’লে কারো মুখই তিনি ভাল ক’রে দেখতে পেলেন না। তবুও তিনি ভিড়ের দিকে চেয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, “বিনোদ-বাবু কি বাড়ি আছেন ?”

জবাব দিল চন্দন। রোয়াকের ওপর থেকে সে নেমে এল নিচে। সুবোধবাবুর সামনে এসে চন্দন বলল, “একটু আগেই বিনোদবাবু গাড়ি চেপে বেড়াতে বেরলেন। সঙ্গে দিদিও গেছে। তোমার কি দরকার বাবা ? গ্যাপাদাকে ব’লে যাও—”

কথা শেষ হওয়ার আগে হারু মুন্সী বলল, “আজ্ঞে হ্যাঁ। গ্যাপাদা হচ্ছে গিয়ে বিনোদ-দার ডান হাত। মাইরী গ্যাপাদা, একটা খাকী ব্র্যাণ্ড এবার ছাড়ো।”

পেছন থেকে ভজা ঘোষ জিজ্ঞাসা করল, “হ্যাঁরে চন্দন, তোর বাবাকে বুঝি সেই কথাটা জিজ্ঞেস করিস নি ? দেখুন মশাই, পার্ক সার্কাসের পিওনরা বড্ড বেশি বজ্জাতি করছে। চিঠিপত্র মাঝে মাঝে বিলি করে না। বলি, হ্যাঁ গ্যাপাদা, নালিশটা তোমার খুলে বলো না। ইনি তো পোস্ট অফিসেই কাজ করেন।”

ভাঙা এবং কর্কশ স্বরে গ্যাপাদা নালিশ করল, “হ্যাঁ মশাই, ভজা ঠিকই বলেছে। চিঠিপত্র ঠিক মত পাচ্ছি না।”

"চিঠিপত্র কি গো, প্রেমপত্র বলো। ন্যাপাদা আবার লজ্জা পাচ্ছে—"

অদ্ভুতভাবে মুখ দিয়ে আওয়াজ ক'রে ভজা ঘোষই বলল, "সে মশাই কেষ্টনগরের সরপুরিয়া—হায় হায় হায়, মিস পিকো ভড়—শেষ পত্র কবে যেন পেয়েছ তুমি ন্যাপাদা ?"

ন্যাপাদা জবাব দেওয়ার আগে জবাব দিলেন সুবোধ মিত্র। চন্দনের গালে ঠাস ক'রে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "বাড়ি চল্। পিঠের চামড়া আজ দেখিস—"

রোয়াক থেকে নেমে এল ন্যাপাদা। সুবোধবাবুর মুখের কাছে নিজের মুখটা এগিয়ে ধ'রে সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কে মশাই ? কোন্ রাষ্ট্রের ডিক্‌টেটার ?"

"আমি ডিকটেটার নই, চন্দনের বাবা।"

"তা তো মালুম হচ্ছে না—"

ন্যাপাদার কথা শুনে রোয়াকের ছেলেরা সব হো হো ক'রে হেসে উঠল। হাসি আর থামতে চায় না। নিমেষের মধ্যে সুবোধবাবু দুর্বল হ'য়ে পড়লেন। হাত-পায়ের গ্রন্থিগুলো যেন আলগা হ'য়ে গেল। আর কিছুই করবার ক্ষমতা রইল না তাঁর। এমনকি চন্দনকে শাসন করবার সাহস পর্যন্ত তিনি হারিয়ে ফেললেন। এমন একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকাও যায় না। এমন সময় চন্দনই তাঁর পালাবার পথ তৈরি ক'রে দিল। সে নিজের গালে হাত বুলতে বুলতে বলল, "চলো বাবা বাড়ি যাই। মেরেছ, বেশ করেছ। আর আমি রোয়াকে আসব না, সিগারেটও খাব না।" একটা আধপোড়া সিগারেট পকেট থেকে বা'র ক'রে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল চন্দন।

নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'ল। সুবোধবাবু বুঝতে পারলেন তিনি আর একা নন। চন্দন এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পাশে। সাহস বাড়তে

লাগল তাঁর। একেবারে নিঃশব্দে এখান থেকে চ'লে যাওয়া উচিত হবে না। একটা কিছু বলা দরকার। সুবোধবাবু তাই চন্দনের ঘাড়ে হাত রেখে শক্ত হ'য়ে দাঁড়ালেন। তারপর রোয়াকের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা না ভদ্রলোকের ছেলে ?"

"সেই প্রশ্ন তো আমরাও আপনাকে করতে পারি মোশাই ?" বলল ন্যাপাদা। রোয়াকের ওপরে আবার হাসির হুল্লোড় প'ড়ে গেল। সুবোধবাবু এবার চন্দনের ঘাড়ে হাত রেখে ফিরে চললেন বাড়ির দিকে। যেতে যেতে মনে হ'ল, ন্যাপাদার প্রশ্নটা অবান্তর নয়। হ্যাঁ, এমন প্রশ্ন সে অবশ্যই করতে পারে। সংসারের শিথিলতার জন্যে তিনি নিজেও দায়ী। হয়তো বা পূর্বপুরুষদেরও দায়ী করা চলে। কি একটা অভাব-বোধ যেন সুবোধবাবুকে ক্রমে ক্রমে সজাগ ক'রে তুলছে। দৃষ্টির প্রসারতা বাড়তে লাগল তাঁর। খুঁজতে লাগলেন ফাঁক কোথায়, অভাব কোথায়। আজীবন ধ'রে থাকবার মত শক্ত কিছু একটা না পেলে জীবনেরও যেন অর্থ থাকে না। কেরানী হওয়ার জন্যে আর তিনি দুঃখ করবেন না। মন্ত্রী হ'লেও কষ্ট তিনি পেতেন। যে-প্রাসাদের ভিত কাঁচা, তলায় ফাঁক আছে, তার মধ্যে বাস করা তো নিরাপদ নয়। ভয় তাঁর একলার নয়। ভয় সবারই। এ-সভ্যতার প্রাসাদ ক্ষণভঙ্গুর।

রাত বোধ হয় তখন ন'টা হবে। বিকাশ ডাক্তার চ'লে যাওয়ার পরে সময় জানবার অসুবিধে হচ্ছে সুবোধবাবুর। এদিক ওদিক থেকে সময় জানতে হয়। একটু আগেই সুবোধবাবু চন্দনকে পাঠিয়েছেন আহেরীপুকুরের মোড়ে। সেখানে একটা পান-সিগারেটের দোকান আছে। দোকানে একটা ঘড়িও ছিল। সুবোধবাবু চন্দনকে ডেকে বলেছিলেন, "যা তো বাবা, এক বাক্স সিগারেট নিয়ে আয়। ক'টা বেজেছে তা-ও দেখে আসিস।"

ললিতা এখনো ফেরে নি। স্নেহলতা বললেন, "আজ একটু বেশি রাতই হ'ল। বিনোদ বক্সির ওখানে একবার খোঁজ নিলে কেমন হয়?"

"কি করবে খোঁজ নিয়ে?"

"না, না—এত রাত অবধি ইংরেজী শেখাবার মানে হয় না।"

"ব্যস্ত হওয়ার কারণ নেই, এক্ষুনি এসে পড়বে।"

"সন্ধের সময় তুমি তো গিয়েছিলে, ডেকে নিয়ে এলে না কেন?"

সন্ধেবেলার ঘটনা সম্বন্ধে সুবোধবাবু কোন আলোচনাই করেন নি, স্নেহলতার অবিশ্যি আলোচনা করবারও সময় ছিল না। তিনি রান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তা ছাড়া তিনি দেখে-ছিলেন, বাড়ি ফিরে এসে সুবোধবাবু চন্দনকে পড়াতে বসেছেন। এমন দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য তাঁর কোনদিনই হয় নি। পিতা-পুত্রের মধ্যে নতুন সম্পর্কের সূচনাটি দেখতে বড় ভাল লেগেছিল স্নেহলতার। তাই তিনি উনুনের সামনে চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন। কোন কিছু জানতে চান নি। একটু আগে পড়া শেষ ক'রে চন্দন গেল সময় দেখতে। এবার তিনি সামনের ঘরে এসে ঢুকলেন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "ললিতাকে ডেকে নিয়ে এলে না কেন?"

"ললিতা ওখানে ছিল না। বিনোদবাবুর সঙ্গে বাইরে কোথায় গেছে। তা যাক, এক্ষুনি ফিরে আসবে।"

"ফিরে এলে ওকে ব'লে দিও কাল থেকে আর পড়ানো চলবে না। পোস্ট অফিসের চাকরি তো ও পাবেই।"

হাই তুললেন সুবোধবাবু। বার পাঁচেক তুললেন। তারপর বললেন, "হ্যাঁ, সেইজন্যেই অপেক্ষা করছি। ললিতা এলে আজকেই ওকে দিয়ে দরখাস্তটা লিখিয়ে রাখব। সুপারিনটেনডেন্ট

বোসসাহেব নিজেই আমায় ডেকে বলেছিলেন দরখাস্ত দেওয়ার জন্যে। ললিতা বি-এ পাস করেছে। এবার তোমার সংসারের অভাব অনটন ঘুচবে। সিঁড়ি দিয়ে অমন ছুমদাম ক'রে কে উঠছে ?"

"মনে হচ্ছে অমিয়াংশু। ও ছাড়া অমন দুমদাম ক'রে কেউ ওঠেও না। বাড়িটা যে পুরনো তা ওর মনে থাকে না।" বললেন স্নেহলতা।

"অমিয়াংশু কলকাতায় নেই। দিল্লী গেছে।"

"পোস্ট অফিসের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে বুঝি ?"

"না। বোধ হয় দিল্লী থেকেই ইস্তফা দেবে। এখানে আর আসবার দরকার হবে না।"

একটু ভেবে নিয়ে স্নেহলতা বললেন, "কি আশ্চর্য, যাওয়ার আগে আমাদের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে গেল না।"

ললিতার ঘরে ব'সেই কথা হচ্ছিল। অচেনা লোকের পায়ের শব্দ পেয়ে স্নেহলতা স'রে গেলেন ওখান থেকে। ঘরে ঢুকল ললিতা। সে বলল, "এই যে বাবা, তুমি এখানেই আছ। ভাল হ'ল। বিনোদবাবু এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।"

"আমার সঙ্গে কেন ?" চোখ তুললেন সুবোধবাবু।

"দরকার আছে ব'লেই এসেছেন। বুঝতেই পারছ, দরকার তাঁর নয়, আমাদের।"

"তাই নাকি ? বেশ। কষ্ট ক'রে যখন তিনি ওপরে উঠতে পেরেছেন ডেকে নিয়ে আয়।"

ডাকতে হ'ল না বিনোদ বক্সিকে। ভেজানো দরজা ঠেলা দিয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন ঘরে। সামনেই একটা চেয়ার ছিল, সেখানে বসলেন না তিনি। সোজা চ'লে এলেন তক্তাপোশের কাছে। বিছানাটা পাতা ছিল না। চট দিয়ে মোড়ানো তোশকের দিকে

চেয়ে কি যেন ভাবলেন তিনি। তারপর তক্তাপোশের ওপর পা তুলে ব'সে বিনোদ বক্সি জিজ্ঞাসা করলেন, "এই বিছানায় কে শোয় ললিতা ?"

"আমি।" জবাব দিল ললিতা।

"ও—" বিনোদ বক্সি হঠাৎ যেন সুবোধবাবুকে দেখতে পেলেন, "নমস্কার সুবোধবাবু।"

"নমস্কার।"

"একটা জরুরী কাজের জন্যে আসতেই হ'ল আমায়।" মিষ্টি হাসি বিনোদ বক্সির মুখে। ললিতার দিকে চেয়ে তিনি জরুরী কাজের কথাটা ব্যক্ত করতে লাগলেন, "একটু আগেই সব পাকা হ'য়ে গেল। ললিতা চাকরি পেল। এখন সে সাড়ে তিনশো পাবে—"

মেঝে থেকে উঠে পড়লেন সুবোধ মিত্র। চন্দনকে পড়াবার জন্যে তিনি সতরঞ্চি পেতে সন্ধে থেকে মেঝেতেই ব'সে ছিলেন। বিনোদ বক্সির ঘোষণা শোনবার পরে আর তিনি ব'সে থাকতে পারলেন না। সতরঞ্চির সুতোয় বিদ্রূপের হাসি! ভাঙা সিমেণ্টের ফাঁকে নতুন রোয়াকের কোলাহল! কোটি ন্যাপাদার কণ্ঠে আজ একবিন্দু করুণা নেই। ভয়ে ভেতরে ভেতরে সুবোধবাবু শুকিয়ে উঠলেন। এর চেয়ে হিংস্রতর ঠাট্টা পৃথিবীর কোন্ রোয়াকে শোনা যায় ? শুধু সাড়ে তিনশো টাকা নয়, চাকরি পাওয়ার মুহূর্তটাও অদ্ভুত শোনালো সুবোধবাবুর কানে। রাত ন'টার সময় ললিতার চাকরি পাকা হ'য়ে গেল! কোন্ অফিসের বড়সাহেব ললিতার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ? কোন্ মন্ত্রীর দপ্তরে আজ রাত ন'টার সময় আলো জ্বলছিল ?

শান্ত হওয়ার সময় পেলেন না সুবোধ মিত্র। বিনোদ বক্সি বলতে লাগলেন, "দারিদ্র্যের চেয়ে বড় পাপ আর কিছু নেই।

এবার আপনারা সবাই পুণ্যের সরোবরে সাঁতার কাটতে পারবেন। পয়লা তারিখ থেকে ললিতা কাজে যোগ দেবে। সকাল ন'টায় পৌঁছতে হবে অফিসে। ট্রামে বাসে উঠতে হবে না। আমাকে তো প্রত্যেক দিন সাড়ে আটটায় বেরুতেই হয়—"

"বেরুতেই হয়?" এত বড় শুভ সমাচার শোনবার পরেও সুবোধবাবুর যেন আর কোন প্রশ্ন জাগলো না মনে, "কেন বেরুতে হয়?"

"ইলেক্‌শনের সময় যাঁরা আমায় ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের দরজায় দরজায় ঘুরি। খবর নিই, তাঁরা কে কেমন আছেন। অভাব-অভিযোগের কথা শুনতে হয়। না শুনলে চলবে কেন? বাষট্টির নির্বাচনে আবার আমি দাঁড়াব। সুবোধবাবু, একবারও তো আপনি জানতে চাইলেন না ললিতার চাকরি হ'ল কোন্ অফিসে?"

"অফিস? রাত ন'টার সময় কোন্ কোন্ অফিস খোলা থাকে আমি তার খবর রাখি নে।"

হি হি ক'রে হেসে উঠলেন এ-অঞ্চলের এম-এল-এ।

আহেরীপুকুরের মোড় থেকে চন্দন ফিরে এসেছে। এতক্ষণ সে দরজার ওপাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। ঘরে ঢোকে নি। বাইরে দাঁড়িয়েই সে দিদির চাকরি হওয়ার খবরটা শুনলো। প্রথম মাস থেকেই যে দিদি সাড়ে তিনশো টাকা মাইনে পাবে তাও সে জেনে ফেলেছে। এত বড় একটা খবর শোনবার পরেও চন্দন ভেতরে ঢোকে নি। কেমন ক'রে যেন ও বুঝতে পেরেছে বিনোদ বক্সি ভাল লোক নন। অতএব, তাঁর দেওয়া চাকরিটাও ভাল নয়. এমনি ধরনের একটা উপসংহার মনে মনে তৈরি ক'রে চন্দন এবার ঢুকে পড়ল ঘরে। ললিতার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল সে, "দিদি, এতবড় চাকরি তুমি নিয়ো না।"

"কেন রে?" জিজ্ঞাসা করলেন বিনোদ বক্সি, "তোর বাবার চেয়ে বেশি মাইনে ব'লে?"

"না। অমিয়দার চেয়ে অনেক বেশি ব'লে। অমিয়দা এম-এ পাস।"

বিনোদ বক্সি বুঝতে পারলেন, ঘরের আবহাওয়া ক্রমে ক্রমে দূষিত হ'য়ে উঠছে। চন্দন ছেলেমানুষ। ওকে শাসন করা চলবে না। হয়তো ওর মুখ দিয়ে আরও সব দোষের কথা বেরিয়ে পড়তে পারে। পড়লেও, বিনোদ বক্সি তাতে লজ্জা পেতেন না। হয়তো ললিতাই লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠবে। বিনোদবাবুর যেন মনে হ'ল, ললিতার মুখ সত্যি সত্যি রাঙা হ'য়ে উঠেছে। এক মাস আগেও ললিতার মনে এমন রং তিনি দেখেন নি। গতকল্যই কি দেখেছেন? স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন বিনোদ বক্সি। ইংরেজী শেখবার তন্ময়তা কাটতে লাগল তাঁর। খুঁজে বেড়াতে লাগলেন ললিতার সেই পুরনো মুখের মলিন রং। দু' মাস আগের মুখখানা ভেসে উঠল তাঁর চোখের সামনে। হ্যাঁ, সত্যিই মলিন ছিল। মনে মনে খুশী হলেন তিনি। আধুনিক ললিতার রং বদলেছে।

বিনোদবাবু উঠে পড়লেন। ওঠবার আগে চট-দিয়ে-মোড়ানো বিছানাটার দিকে আবার তিনি দৃষ্টি ফেললেন একবার। পরিচ্ছন্নতার অভাব তাঁকে পীড়া দিতে লাগল। ভারতমাতা কি আজও এমন মলিন শয্যায় শয়ন করেন? মায়ের-দেওয়া মোটা কাপড় প'রেও বিনোদ বক্সি এই প্রশ্নটা তুলতে পারলেন না। মনে মনে ভাবলেন, আহা, ললিতার কি কষ্ট!

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

সুবোধবাবু এক মাসের ছুটি নিয়েছেন। সারা জীবনে তাঁকে ছুটি নিতে দেখেন নি স্নেহলতা। জিজ্ঞেস ক'রেও ছুটি নেওয়ার কারণটা তিনি জানতে পারেন নি। সুবোধবাবু দু' একবার শুধু বলেছেন, "বয়স হয়েছে। বেগার খাটতে আর ভাল লাগে না। যা মাইনে পাই তাতে বেগার খাটাই হয়।"

কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়। কিন্তু এত দীর্ঘদিন পরে বেগার খাটার প্রশ্নটা তাঁর মনে এল কেন? স্নেহলতা ভেবে রেখেছিলেন যে, ললিতা প্রথম মাস থেকেই সাড়ে তিনশো টাকা মাইনে পাবে ব'লে সুবোধবাবু অফিস থেকে ছুটি নিয়েছেন। মনে মনে লজ্জা পাচ্ছেন। সেইজন্যে কাজের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। হঠাৎ তাঁর বয়সও বেড়েছে। বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে সুবোধবাবুর। কিন্তু তিনি তো বাড়ি থাকেন না? স্নেহলতা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না সারাটা দিন কোথায় কোথায় তিনি ঘুরে বেড়ান। বন্ধু-বান্ধব তাঁর নেই। আত্মীয়-স্বজন হয়তো বা থেকে থাকবে। কিন্তু তাঁদের সঙ্গেও সুবোধবাবুর সামাজিক সম্পর্ক কিছু ছিল না। থাকলে স্নেহলতা নিশ্চয়ই তার খবর রাখতেন।

আজ সকালের দিকেই বাইরে বেরুচ্ছিলেন তিনি। স্নেহলতা জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাচ্ছ?"

"বেড়াতে। একবার অমিয়াংশুর হোটেলেও যাব। দেখি সে ফিরে এসেছে কি না। আমার ফিরতে যদি দেরি হয় তোমরা খেয়ে নিও। এবেলা হয়তো আমি নাও ফিরতে পারি।"

"কালও তুমি সন্ধের সময় বাড়ি এলে—কি যে করছ—না বাপু, বিনোদ বক্সিকে খবর দিয়ে এসো সাড়ে তিনশো টাকার চাকরি ললিতা নিতে পারবে না।"

সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে হেসে ফেললেন ললিতার বাবা।

ক'দিন থেকে ললিতাও ঘরে ব'সে ছিল। স্নেহলতা বুঝতে পেরেছিলেন, গত ছু'দিন থেকে সে বিনোদ বক্সিকে আর পড়াতে যায় না। তিন মাসের বিদ্যা বিনোদবাবু হয়তো হজম করতে সময় নিচ্ছেন। কিংবা রাহুল হয়তো আপত্তি জানিয়ে গেছে। ছু'দিন আগে রাহুল এসেছিল ললিতার সঙ্গে দেখা করতে।

সুবোধবাবু চ'লে যাওয়ার পর স্নেহলতা ললিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "নতুন চাকরির দরখাস্তটা পাঠিয়ে দিস নি ?"

"দিয়েছি।"

"নিয়োগপত্র পেয়েছিস ?"

"বিনোদবাবু নিজেই হাতে ক'রে নিয়ে এসেছেন। পয়লা তারিখ থেকে কাজে যোগ দিতে হবে। মা—"

"কিছু বলবি ?" ঘুরে দাঁড়ালেন স্নেহলতা। তারপর ললিতার মাথায় হাত বুলতে বুলতে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "সেদিন রাহুল কি বলল রে ? এতদিন আসে নি কেন ?"

"অসুখ করেছিল।"

"মনে হয় জন্ম থেকেই ছেলেটা ভুগছে। ওকি, কাঁদছিস ? কেন রে ? আমি তোকে কি বললুম ?" স্নেহলতা নিজের আঁচল দিয়ে ললিতার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে আবার বললেন, "তোর বাবা কিংবা আমি—ললিতা, আমরা তোকে কোনদিনই কিছু বলি নি।"

"কেন বলো নি মা ? কেন আমায় শাসন করো না ? ছেলে-বেলায় বাবা আমায় কত ভালবাসতেন ! আর এখন ? বি-এ পাস করেছি ব'লে বাবা মনে করেন আমি তাঁর চেয়ে বেশি শিক্ষিত—মা—"

"কি রে ?"

"বিনোদ বক্সিকে আর পড়াব না।"

"কেন ?"

"রাহুল পছন্দ করে না।...আমি আর বিনোদ বক্সির ওখানে যাই না।" ললিতার কথা শুনে যতটা খুশী হওয়া উচিত ছিল ততটা খুশী তিনি হ'তে পারলেন না। স্নেহলতা শুনতে চান নি, দেখতে চেয়েছিলেন। ক'দিন থেকে ললিতার লুকনো জগতটার দিকে দৃষ্টি পড়েছিল তাঁর। রাহুলের প্রতি ললিতার যে আগ্রহ ক'মে গেছে তা তিনি জানতেন। এম-এ পড়া ছেড়ে দেওয়ার পর রাহুলের নাম পর্যন্ত সে মুখে আনে নি। আজকে এক্ষুনি ললিতা বোঝাতে চাইল রাহুল পছন্দ করে না ব'লে বিনোদ বক্সির কাজ সে ছেড়ে দিয়েছে। স্নেহলতার দৃষ্টির অস্পষ্টতা ক্রমে ক্রমে কেটে যেতে লাগল। বোধ হয় রাহুল গুপ্তকেই ভালবাসা উচিত ছিল ওর। এই ভেবে স্নেহলতা কি একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সিঁড়ির দিক থেকে কে যেন ললিতাকে নাম ধ'রে ডাকতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, "ও কার গলা ?"

"প্রণবের গলা ব'লে মনে হচ্ছে।"

"প্রণব ? তার নাম তো কখনো শুনি নি ?"

"আমরা একসঙ্গেই এম-এ পড়তুম।" ললিতা উঠে গেল। স্নেহলতা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

প্রণব একলা আসে নি। জয়ন্ত আর শঙ্করও ছিল। ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল ওরা। ললিতা বলল, "যার যেখানে ইচ্ছে ব'সে পড়ো। আমাদের ড্রইং-রুম নেই।"

"নেই তো ব'য়ে গেছে। আমরা আবার কোথাকার রাজপুত্তুর !" এই ব'লে জয়ন্ত দাশ ব'সে পড়ল টেবিলের ওপর। হাসতে হাসতে শঙ্কর বলল, "জয়ন্ত আজকাল উড়োজাহাজ চালায় কিনা, উঁচু দিকে বসতে ওর আরাম লাগে। আয় প্রণব, আমরা ললিতার খাটের ওপর বসি। জয়ন্তর চেয়ে নিচু জায়গা।"

"তোমরা এই সকালবেলা কি মনে ক'রে? ক্লাশ নেই?" জিজ্ঞাসা করল ললিতা, "এক পেয়ালা চা খাবে তো?"

"না। আমাদের হাতে সময় খুব কম। আমরা এখন বেনিয়াপুকুর যাব। তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে।" বলল প্রণব।

"সেখানে কি?" জানতে চাইল ললিতা।

"চায়ের নেমন্তন্ন। রাহুল আমাদের চা খেতে ডেকেছে। ইউনিভারসিটি আজ বন্ধ। জয়ন্তরও ছুটি।"

"তা হ'লে দাঁড়াও, মাকে ব'লে আসি।"

"আমরা গাড়ি নিয়ে এসেছি। তোমাকে আবার পৌঁছে দিয়ে যাব।" এই ব'লে প্রণব কেমন একটু অর্থপূর্ণভাবে হাসতে লাগল। তিনজনের মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময়ও হ'য়ে গেল তাও লক্ষ্য করল ললিতা। প্রত্যেকেই যেন মনে মনে হাসছিল।

গাড়িতে উঠে ললিতা জিজ্ঞাসা করল, "রাহুলের সঙ্গে তোমাদের দেখা হ'ল কবে? দু'দিন আগে এখানে সে এসেছিল, কই, চা খাওয়ার কথা কিছু তো সে বলে নি?"

জবাব দিল না কেউ। শঙ্কর পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বা'র ক'রে শুধু বলল, "অনেক চেষ্টা ক'রে ওদের বাড়ির ঠিকানা পেয়েছি। তুমি তো ওর ঠিকানা আজও জানো না?"

"ঠিকানা?" কি যেন ভাবল ললিতা। তারপর বলল, "হ্যাঁ, মনে পড়ছে বেনিয়াপুকুরের ঠিকানা যেন সে আমায় দিয়েছিল। কিন্তু রাহুলরা কি তাদের নতুন বাড়িতে উঠে যায় নি?"

"তাই তো আমরা আজ নিজের চোখে দেখতে যাচ্ছি।"

গাড়ি চালাচ্ছিল প্রণব। জয়ন্ত ব'সে ছিল প্রণবের পাশেই। পেছনে ব'সে ললিতা বুঝতে পারল তিনজনের মনে আজ একটা কৌতুক উপভোগের নেশা জ'মে উঠেছে। রাহুলকে কেন্দ্র ক'রেই কৌতুকটা জ'মে উঠবে তাও সে বুঝতে পারল। বোধ হয় ওদের

সঙ্গে না এলেই হ'তো। মাঝপথ থেকে নেমে যাওয়ার কথাও ভাবল সে। কিন্তু সাহস ক'রে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারল না। তা ছাড়া বহুদিনকার একটা রহস্য জানবারও আগ্রহ ছিল ললিতার। রাহুলের লুকনো জগতে প্রবেশের সুযোগটা শেষ পর্যন্ত ছাড়তে চাইল না সে। গাড়িটা ঢুকে পড়ল বেনিয়াপুকুরে। দু'দিকের নম্বর দেখতে দেখতে ওরা এগুচ্ছিল। চওড়া গলিটা পার হ'য়ে এসে ঢুকে পড়ল সরু গলিতে। এত সরু যে, গাড়িটা মাঝপথেই প'ড়ে রইল। ওরা নেমে এল গাড়ি থেকে। নম্বর খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত একটা বাগান-বাড়ির সামনে এসে পৌঁছল ওরা। ফটকের সামনে নম্বর একটা ছিল বটে, কিন্তু পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা গেল না। শ্বেত পাথরের ফলকের গায়ে নম্বরটা লেখা হয়েছিল। এখন সেই ফলকটা আস্ত নেই। অতএব নম্বরটাও মাঝখান থেকে ভেঙে গেছে। প্রণব তবু বলল, "এই বাড়িটাই হবে।"

"মস্তবড় বাড়ি দেখছি—" সিগারেট ধরাল জয়ন্ত, "কিন্তু পুরনো। এক সময়ে বাগানের সখ ছিল রাহুলের পূর্বপুরুষদের—মাঝখানে একটা পুকুরও দেখা যাচ্ছে।" ফটকের ওপর দিয়ে ভেতরটা ভাল ক'রে দেখে নিয়ে জয়ন্ত বলল, "হ্যাঁ, বাগানবাড়িই ছিল। সবই নষ্ট হ'তে বসেছে। বাগানে ফুল নেই, পুকুরে জল খুব কম।"

"এখন কি করা যায় বল্?" জিজ্ঞাসা করল প্রণব, "আশে-পাশে কাউকে দেখতে পাচ্ছিস?"

জয়ন্ত বেশ লম্বা। উঁচু ফটকের ওপর দিয়ে সে-ই শুধু ভেতরটা দেখতে পাচ্ছিল। ঠেলা দিয়ে দেখল, ভেতর থেকে গেট বন্ধ। আরও একটু জোরে ঠেলা মারলে এটা হয়তো খুলেও যাবে। কিন্তু তার আগে জয়ন্ত বলতে লাগল, "ভেতরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

জনপ্রাণী কেউ আছে ব'লে মনেও হয় না। বাড়িটা এখান থেকে অনেকটা দূরে। ডানদিকে একটা ঘরের মত দেখা যাচ্ছে। মনে হয়, এক সময়ে চাকর-দারওয়ানরা থাকত এখানে। আউট-হাউসের মত। কি করব?”

শঙ্কর এগিয়ে এল সামনে। কাঠের ফটকটাতে বেশ জোরেই একটু ধাক্কা মারল। ফটক খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে শঙ্কর ডাকতে লাগল, “দরওয়ান, দরওয়ান—”

কেউ কোন সাড়া দিল না। জয়ন্ত দেখল, আউট-হাউসের সামনে ব'সে কে একজন তরকারী কাটছে। পুরুষ মানুষ। বয়স বেশি ব'লেই মনে হ'ল ওর। লুঙ্গি না গামছা পরেছে তা ঠিক সে বুঝতে পারল না। ললিতা বলল, “চলো না আমরা যাই ওখানে। হয়তো চাকরবাকর কেউ হবে। আর আমরা তো চুরি-ডাকাতি করতে আসি নি।”

“হ্যাঁ। সেই ভাল। আমরা সবাই ভদ্রলোক—”

“আর শিক্ষিতও।” ঘোষণা করল প্রণব।

ভেতরে ঢুকল ওরা। ডান দিকে যাওয়ার পায়ে-চলার পথও একটা নজরে পড়ল। এক সময়ে লাল সুরকির পথ একটা নিশ্চয়ই ছিল। জয়ন্ত বলল, “ইটের কোনাগুলো মাঝে মাঝে উঁচু হ'য়ে রয়েছে। চারদিকে হেঁটে বেড়াবার জন্যে দু'দিকে ইট পুঁতে পুঁতে রাস্তা করা হয়েছিল। সবই ভেঙে গেছে রে। দেখছিস, কেয়ারিগুলোর কি অবস্থা? রাহুলেরা যে বনেদী বংশ তাতে আর সন্দেহ নেই। বাইরে কোথায় যেন ওর বাবা একটা নতুন বাড়ি করেছেন?”

“শুনেছি বালিগঞ্জের দিকে—” হেসে ফেলল শঙ্কর বোস।

দাওয়ায় ব'সে বুড়ো লোকটি সত্যিই ডাঁটা কাটছিল। বোধ হয় অনেকক্ষণ থেকেই কাটছিল। ওরা দেখল, কলাই-করা

একটা থালার ওপরে বিরাট এক স্তূপ জ’মে উঠেছে। স্তূপটার দিকে চেয়ে প্রণব জিজ্ঞাসা করল, “ব্যাপার কি রে? এত ডাঁটা খাবে কে?”

জবাব দিল ললিতা, “ডাঁটা-চচ্চড়ি আমি তো পেলেই খাই।”

দাওয়ার কাছে এসে পৌঁছবার পরে লোকটি এবার চোখ তুলল। ওদের এত কাছে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, “কি চাই?”

“রাহুল গুপ্ত কোথায় থাকে বলতে পারো?” নম্বর-লেখা কাগজটা শঙ্করের হাতেই ছিল।

“তোমরা কে?” জিজ্ঞাসা করল লোকটি।

ডাঁটার স্তূপটার দিকে এক-মুখ ধোঁয়া ছুঁড়ে দিয়ে প্রণব জবাব দিল, “কলেজে রাহুল আমাদের সহপাঠী ছিল। আমরা এখন এম-এ পড়ছি। আর—” ললিতার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে প্রণবই বলল, “এই যে মেয়েটিকে দেখছেন—”

বুড়ো লোকটি ললিতাকে দেখবার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু পরিষ্কারভাবে দেখতে পেল কি না বোঝা গেল না। চোখে তার খুব পুরু চশমা। তবুও সে ললিতার দিকে চেয়ে বলতে লাগল, “ভাল দেখতে পাই না চোখে। মনে হয়, প্রত্যেক ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাওয়ার বাড়ছে।” মাথা নিচু ক’রে হাসল একটু। মলিন হাসি। তারপর সে-ই আবার বলতে লাগল, “প্রত্যেক ঘণ্টায় ঘণ্টায় তো চশমা বদলানো যায় না। এটা নিয়েছি মাত্র দু’ মাস আগে। তাও বাবুদের হাতে-পায়ে ধরতে হয়েছিল।”

“বাবুদের? তারা কোথায়?” ধৈর্য হারালো জয়ন্ত।

“তাঁরা তো এখানে থাকেন না। বালিগঞ্জের দিকে নতুন বাড়ি করেছেন। তিনতলা বাড়ি। পাঁচটা টাকার জন্যে আমায় তিন তলাতেই উঠতে হয়েছিল। বুড়ো-কর্তা নিচে নামেন না।

জানো বাবা, এই ঘরটার জন্মে কত ভাড়া দিতে হয়? পঁচিশ টাকা। বুড়ো-কর্তার হাতে কুড়িটা টাকা দিয়ে বলেছিলুম যে, পাঁচটা টাকা এমাসে ছেড়ে দিন। চশমার কাচ বদলাতে হবে—"

"রাহুলরা কি হার্টলেস!" বলল শঙ্কর।

"সেইজন্মেই পণ্ডিত নেহেরু সোসালিস্ট রাষ্ট্র চান।" মন্তব্য করল জয়ন্ত।

"আমরা চাই পুরোপুরি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র।" এই ব'লে প্রণব তার সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাগানের দিকে।

ওরা কেউ লক্ষ্য করে নি, ললিতার মুখ এরই মধ্যে পাংশু হ'য়ে গেছে। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্মে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে সে। রাহুলের ঠিকানা অমিয়াংশু সেন চিঠি লিখে জানিয়েছিল ওকে। ইচ্ছে করলে একাই সে এখানে আসতে পারত। এদের সঙ্গে আসা উচিত হয় নি। এরা বিনোদ বক্সির রোয়াকে বসে না বটে, কিন্তু কলকাতায় কি রোয়াকের অভাব আছে? শেষ পর্যন্ত ললিতা ব'লে বসল, "আমার কাজ আছে, চললুম।"

"দাঁড়াও। একা যাবে কেন, আমরাও আসছি।" বুড়ো লোকটির দিকে চেয়ে প্রণব জিজ্ঞাসা করল, "বালিগঞ্জের ঠিকানাটা দিতে পারো?"

"সেখানে তোমরা যাবে কেন বাবা? বুড়ো-কর্তার কাছ থেকে একটা আধলাও গলাতে পারবে না। কলকাতার যা অবস্থা, ইচ্ছে করলে এই ঘরটার ভাড়া তিনি ত্রিশ টাকাও চাইতে পারেন। চাইলেই হ'ল। আমরা উঠে গেলে পাঞ্জাবীরা পঞ্চাশ টাকাও দিতে চাইবে। আমরা আর এখানে থাকব না। চ'লে যাচ্ছি।"

"বেশ, বেশ—রাহুলদের ঠিকানাটা এবার বলো।" প্রণব

দ্বিতীয় সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল। এমন সময় বুড়ো লোকটি বলল, "রাহুল তো আমারই ছেলে—তার তো কোন আলাদা ঠিকানা নেই।"

.মিনিট ছুই পর্যন্ত কেউ কোন কথা বলল না। চাপা হাসির আওয়াজ ফেটে বেরুতে লাগল।

দাওয়ার ওপর ব'সে পড়েছিল ললিতা। ও জানে হাসির বিদ্রূপ রাহুলকে স্পর্শ করতে পারবে না। বিঁধছে ললিতাকেই। প্রণবদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে সে। রাহুলের মিথ্যে জগৎটাকে দেখাবার জন্যেই ওরা ওকে নিয়ে এসেছে আজ। কিন্তু ললিতাও কি ওকে অবিশ্বাস করে নি? এম-এ পড়া ছেড়ে দিল কেন? কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতা!

রাহুলের বাবার কোন নতুন অভিজ্ঞতা হয় নি। তিনি ইতিমধ্যে ডাঁটা কাটতে আরম্ভ করেছিলেন। এবার তিনি পুরনো অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করতে লাগলেন, "প্রায় পাঁচ বছর আগে আমরা কলকাতায় আসি। রাহুল পল্লীগ্রামের ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করল। আমাদের বংশে কেউ কোনদিনও ইংরেজী লেখাপড়া শেখে নি। রাহুলের কীর্তি তাই অবাক করল আমাকে। শুনলুম সে শুধু পাস করে নি, জলপানিও পেয়েছে। গাঁয়ের সবাই পরামর্শ ক'রে ঠিক করল যে, ওকে কলকাতার কলেজে পড়তে হবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উল্লেখ ক'রে তারা বলল, রাহুলের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। আমাদের পল্লীগ্রামের পাশ দিয়ে একটা খাল কাটা হয়েছিল। আমরা সবাই সরকারী খালটা দেখেছিলুম। খবরের কাগজের সংবাদের ওপর নির্ভর করি নি। দেখবার পর আমাদের লোভ বাড়তে লাগল। বাড়ি-ঘর সব বেচে ফেললুম। সামান্য কিছু টাকা পাওয়া গেল। সেই মূলধন নিয়ে আমরা কলকাতা এলুম। রাহুল কলেজে ভর্তি হ'ল। ভালভাবে

আই-এ পাসও করল। তারপর ওর মা অসুখে পড়লেন। তোমরা কি বাবা বসবে না?"

"দাঁড়িয়ে থাকতেই ভাল লাগছে। আপনি বলুন—" দাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে রইল জয়ন্ত চ্যাটার্জি। প্রণব জিজ্ঞাসা করল, "রাহুল গেছে কোথায়?"

"ছাত্র পড়াতে। এক্ষুনি এসে পড়বে। সারা দিনরাত ছাত্রই পড়ায়। বি-এ পরীক্ষাটা দিতে পারল না। শরীরও ভেঙে পড়েছে। ছাত্র পড়াতে পড়াতে বুকের রক্ত শুকিয়ে উঠেছে। তার ওপরে ওষুধপত্র কেনবার খরচও ওকে চালাতে হয়। এতক্ষণে ও এসে যেত। বোধ হয় ওষুধ কিনতে গেছে। দু'দিন থেকে ঘরে এক ফোঁটাও ওষুধ নেই। বাড়ি ফিরে আজ তো ভেঙে পড়বে ছেলেটা।"

"কেন? আমরা বরং এক্ষুনি চ'লে যাচ্ছি। আমরা যে এসেছিলাম ওকে তা বলবার দরকার নেই।" শঙ্করের মনটা হঠাৎ বোধ হয় নরম হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু রাহুলের বাবা বললেন, "না, না, তোমরা এসেছ তাতে ক্ষতি কিছু হয় নি। আজ সকালে ওর ছোট বোনটাও বিছানায় পড়েছে। গা খুব গরম। জ্বর মাপবার ব্যবস্থা নেই—এক মাস থেকে চেষ্টা করছে একটা থারমোমিটার কেনবার জন্যে। পেরে উঠছে না। উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না।"

ফস ক'রে জয়ন্ত তার নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফেলল। হাজার টাকা মাইনে পায় সে। বোধ হয় একটা থারমোমিটার কেনবার জন্যে নগদ টাকা বা'র করতে চেয়েছিল জয়ন্ত। পকেট হাতড়ে কোন কিছুই বা'র করতে পারল না। ললিতার দিকে চেয়ে সে বলল, "পার্সটা বাড়িতে ফেলে এসেছি। প্রণব আমায় একরকম বিছানা থেকে টেনে তুলে নিয়ে এসেছে।"

রাহুলের বাবা উঠলেন। ওদের দিকে চেয়ে বললেন তিনি, "চলো, ওর মায়ের সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রণব সবার আগে উঠে এল দাওয়ার ওপর। অন্ধকার ঘরটার দিকে মুখ ক'রে রাহুলের বাবা বললেন, "কলকাতার সব চড়ুই আর পায়রা এখানে এসে ঘর বেঁধেছে। দিনরাত গোলমাল করে। আমরা এত দুর্বল যে, আমাদের হাতে লম্বা বাখারি দেখলেও ওরা ভয় পায় না।" ঘরের মধ্যে ঢুকে তিনি হাসলেন একটু। তারপর আবার বললেন, "একটু আগেই ওদের তাড়া করেছিলুম। রাহুলের মা বললেন, থাক, থাক— এখন ওদের বাচ্চা দেওয়ার সময়।"

লজ্জা পাওয়ার কথা এটা নয়, ললিতা তবু যেন লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠল। মাথা নিচু করতে গিয়ে নিজের দেহটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল একবার।

ঘরটা শুধু অন্ধকার নয়, ভাঙাও। দু' পাঁচ ফুট চওড়া হ'য়ে দেওয়ালগুলো ভেঙে পড়লে বাইরের আলো ঢুকতে পারত ঘরে। কিন্তু দেওয়ালের বুক তত বেশি দিল্-দরিয়া নয়। ভেঙেছে তাও কৃপণের মত। চিড় ধরেছে—দু' একটা বড় ফাঁকও নজরে পড়ল ওদের। ললিতা দেখতে পেল, ফাঁকের মধ্যে শুধু শ্যাওলা পড়ে নি, দু' একটা বাচ্চা বটগাছ বড় হওয়ার স্বপ্নও দেখছে। এর পাশে গোকুল সরকারের বাড়ি তো স্বর্গ।

ঘরে ইলেকট্রিক আলো ছিল। সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন রাহুলের বাবা। ঘরের সিলিংটা খুব উঁচুতে। বুকের ওপর চেপে বসে নি। পুরনো আমলের তৈরি ব'লে ঘরের মধ্যে খানিকটা ব্যাপ্তি রয়েছে। সেই আমলের চাকর-দারওয়ানদের জীবনযাপনের ধারা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। তারা শুধু চাকরি করত না। দায়িত্বও নিত। বাগানবাড়ির মর্যাদারক্ষার জন্যে জীবন দিত

ওরা। বাঈজী-রক্ষণের মধ্যে বাঙালীবাবুর মর্যাদারক্ষার প্রশ্ন ছিল কঠিন। তাদের চাকরি ছিল সারা দিনরাত্রির। দশটা-পাঁচটার কাঁটার সঙ্গে ওরা বাঁধা পড়ত না। তাই বোধ হয় বাগান-বাড়ির স্থপতি-শিল্পের মধ্যে খানিকটা ব্যাপ্তি রয়েছে। শুধু ব্যাপ্তি নয়। খাতিরও ছিল। সেইজন্যে সিলিংটা অত উঁচুতে। আজ-কালকার হিসেবে ঘরের আয়তনে দশ-বারোজন লম্বা-চওড়া মানুষ হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকতে পারে।

এখন মাত্র চার জন বাস করে এই ঘরে। দুটো চৌকি আছে। একটাতে রাহুলের মা শুয়ে ছিলেন। অন্যটাতে বোন। রাহুল নিশ্চয়ই মেঝেতে বিছানা পেতে শোয়। ওর বাবা কি করেন ললিতা বুঝতে পারল না। ওরা এগিয়ে এসে দাঁড়াল রাহুলের মায়ের সামনে।

পরিচয়ের কোন দরকার ছিল না। রাহুলের বাবা তবু বললেন, "ইনিই হচ্ছেন রাহুলের মা। আর ওই যে আমার মেয়ে। ওগো শুনছো—এরা সব রাহুলের সহপাঠী। তোমার নাম কি মা?"

"ললিতা।"

"ললিতা কি?"

"মিত্র।"

"বাবার নাম?"

"শ্রীসুবোধ মিত্র। পোস্ট অফিসের কেরানী। ক্লাশ থ্রী।" ললিতার মুখ দিয়ে কথা সরতে চাইছে না। ব'সে পড়বার জন্যে জায়গা খুঁজছিল সে। দেহটা কেমন ভারি ভারি ঠেকছে। ওর নতুন উপলব্ধির সূচনা আজকের নয়, দু'মাস আগের। মাস তিনেকের পুরনো হওয়াও অসম্ভব নয়। হিসেবে ভুলও থাকতে পারে।

শুধু রাহুলের জগৎটাই লুকনো ছিল না। ললিতার জগতেও

অন্তরালের সৃষ্টি হয়েছে। সেখানকার অন্ধকারও দিন দিন ঘনতর হচ্ছে। আলোর অবয়ব ফুটে বেরুতে সময় লাগবে। কল্যাণের পৃথিবী জন্ম নিচ্ছে, হয়তো বা কল্কীর কালো অন্ধকারে। চোখ ভিজে উঠল ললিতার। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পালিয়ে যেতে পারছে না। নরক-যন্ত্রণার মেয়াদ শুধু বেড়েই চলেছে। এখানে দাঁড়িয়েও রোয়াকের কোলাহল শুনতে পেল ললিতা।

ওষুধের শিশি হাতের মুঠোতে নিয়ে প্রবেশ করল রাহুল গুপ্ত। প্রবেশ-মুখ থেকে বিশেষ কিছু বুঝতে পারে নি সে। দেখতে তো পায়ই নি। তারপর কাছে এগিয়ে আসতেই স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল রাহুল। কি দেখল সে? এ তো কল্কী-শেষের পৃথিবী নয়! ওষুধের শিশিটা হাত থেকে প'ড়ে গেল ওর। ভেঙে টুকরো হ'য়ে গেল শিশি। এ ওষুধে ব্যাধি সারবে না। নর্দমার দিকে গড়িয়ে চলল ওষুধের স্রোত। লক্ষ লক্ষ বীজাণু পালাবার পথ খুঁজছে। প্রণবরা সে-সব দেখতে পেল না কিছু। রাহুলের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল ওরা।

ললিতা হাসল না, কাছে এগিয়ে এল রাহুলের। হাত দুটো তুলে ধ'রে ডাকল, "রাহুল—"

জবাব ওরা শুনলো। বিকট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল রাহুলের গলা দিয়ে। ভাঙা শিশিটার মত সেও ভেঙে পড়ল মেঝের ওপর।

বোধ হয় ময়ূরাক্ষীর জলে আর কোন স্বপ্ন নেই।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

এক মাসের ছুটি প্রায় শেষ হ'য়ে এল। শেষ হ'ল বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে। মকদ্দমা নিষ্পত্তি হয় নি। হ'তে আরও সময় লাগবে। কিন্তু সুবোধবাবু নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকতে পারলেন না। মকদ্দমা নিষ্পত্তি হওয়ার আগে, তিনি হেরে গেছেন। উকীলবাবু খবর দিয়েছেন, বাড়ি ছাড়তে হবে। করপোরেশন নোটিশ জারি করেছে, এ-বাড়িতে বাস করা নিরাপদ নয়। বাড়িওয়ালার ওপরও হুকুম হয়েছে বাড়িটা ভেঙে ফেলতে হবে। সোনা-কুঠির গোকুল সরকার ভাঙতেই চেয়েছিলেন।

আজও সকালে সুবোধবাবু বাইরে বেরুচ্ছিলেন। গোকুল সবকারের সঙ্গে দেখা করবেন। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবার সময় তিনি দেয়ালের গায়ে নখ বসিয়ে পরীক্ষা করলেন, ইটের বুক সত্যিই শূন্য কি না। নখ দিয়ে খোঁচা মারতে মারতে নেমে এলেন একতলায়। বাড়িটা পুরনো তাতে সন্দেহ নেই। পলস্তারাও খ'সে পড়েছে অনেকদিন আগে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি মাথার ওপর ভেঙে পড়বার মত অবস্থা এর হয় নি। তবে কি এর পেছনে গোকুল সরকারের কারসাজী আছে? হয়তো হাইকোর্টের জজসাহেবকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে গোকুল সরকার করপোরেশনের সাহায্য নিয়েছেন। সুবোধবাবু শুনেছেন, কলকাতার কোথায় কোথায় যেন দু' একটা বাড়ি সত্যিই ভেঙে পড়েছে। লোকও মারা গেছে। সেইজন্যে করপোরেশনের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে সোনা-কুঠির মালিকের কোন অসুবিধে হয় নি। করপোরেশনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুবোধবাবু নিঃসন্দেহ হ'তে পারলেন না। তা ছাড়া উদ্দেশ্য যদি তাদের সাধু না-ই হয় তাতেও সুবোধবাবুর সুবিধা কিছু হবে না। পয়সার জোর যখন নেই তখন হাজার

রকম আইনের আক্রমণ তিনি রুখবেন কি দিয়ে? অতএব উঠে যাওয়াই ভাল। কোথায় গিয়ে উঠবেন সে-প্রশ্ন তুলেও কিছু লাভ নেই। জবাব দেবে কে? যাঁরা রাষ্ট্র চালান তাঁদের কথা হঠাৎ একবার সুবোধবাবুর মনেও পড়েছিল। কিন্তু ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশের ভিড়ের মধ্যে ব'সে তাঁদের কথা ভুলেও গেলেন তিনি।

সোনা-কুঠিতে যখন এসে পৌঁছলেন তখন প্রায় দশটা। সকাল দশটা। অফিসের ভিড় চরমে উঠেছে। গোকুলবাবুর অফিসেও ভিড় কম নয়। সোনা বেচবার দোকান এটা নয়, বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করবার অফিস। অফিসে এসে সুবোধবাবু শুনলেন, গোকুল সরকারের সঙ্গে দেখা করতে হ'লে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তিনি সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন। সাড়ে দশটায় লাইব্রেরীতে গিয়ে বসবেন। তারপর স্নান-ঘরে যাবেন। সেখান থেকে বেরুবেন সওয়া এগারোটায়। ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে বারোটা তো বাজবেই। সাহস ক'রে সুবোধবাবু তবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন তিনি কোথায়? মানে, সাড়ে দশটা তো বাজলোই।"

ছোকরা-কেরানীটি ঘড়ির দিকে চেয়ে জবাব দিল, "এখন তিনি লাইব্রেরীতে ঢুকছেন। মোটা মানুষ, আমাদের মত দৌড়ঝাঁপ করতে পারেন না। আপনার কি দরকার?"

"আমি কর্নেল বিশ্বাস রোড থেকে আসছি। লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখা করা যায় না? বছর পনের আগে একবার দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। আমার নামটা কাগজে লিখে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিন দয়া ক'রে। অবিশ্যি আসবার জন্যে তিনিই আমায় খবর পাঠিয়েছেন।"

কেরানী ছেলেটি তাই করল। সঙ্গে সঙ্গে খবর এল সুবোধবাবুকে পাঁচ তলায় লাইব্রেরী-ঘরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে। সামনেই একটা লিফট রয়েছে। লিফটের মধ্যে একজন চালকও ব'সে

ছিল। কিন্তু সুবোধবাবু দেখলেন হিন্দুস্থানী দারওয়ানটি তাঁকে সিঁড়ি দিয়ে পাঁচতলায় উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় চারতলার মুখে এসে সুবোধবাবু থামলেন। বিশ্রাম করবার প্রয়োজন হ'ল। দারওয়ানটির দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "লিফটটা কি ওপর দিকে ওঠে না?"

"ওঠে। বাবুরাই ওঠা-নামা করেন। আমরা উঠতে পারি না, হুকুম নেই।" দারওয়ানটিও হাঁটুর ওপর হাত রেখে উবু হ'য়ে দাঁড়াল। সুবোধবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কতদিন কাজ করছ এখানে?"

"বিশ বছর।"

"তা হ'লে তো হাঁটুর জোর কমবেই।"

"হ্যাঁ বাবু, তাকত ক'মে গেছে। প্রথম প্রথম ত্থ' চারবার ওঠা-নামা করলে ক্ষিধে বাড়ত, এখন শুধু মেহনতই বাড়ছে। আসুন।"

পাঁচতলায় উঠে সুবোধবাবু দেখলেন, ডাইনে বাঁয়ে ত্থ'দিকেই লম্বা করিডোর। করিডোরের ত্থ'পাশে সব কামরা। দারওয়ানের কাছে তিনি খবর পেলেন, পুরো পাঁচতলাটাই বড়বাবুর মহল। মেয়েরা কেউ এ-অঞ্চলে আসতে পারেন না। আসতে হ'লে হুকুম নিতে হয়। তিন আর চার তলাটা তিনি ছেড়ে দিয়েছেন মেয়ে-মহলের জন্যে। লাইব্রেরী-ঘরের সামনে এসে দারওয়ান বলল, "যান, উনি ভেতরেই আছেন।"

গোকুল সরকারকে দেখে অবাক হ'য়ে গেলেন সুবোধবাবু। দেখে প্রায় চেনা যাচ্ছিল না। পনের বছর আগের দেহটা ফুলে ফেঁপে শুধু ডবল হয় নি, বোধ হয় চার ডবল হয়েছে। ঘরে ঢোকবার পরে সুবোধবাবুর দিকে দৃষ্টি দিলেন না গোকুল সরকার। তিনি একটু ব্যস্তই ছিলেন। লাইব্রেরী-ঘরে ব'সে তিনি খবরের কাগজ পড়ছিলেন। কলকাতার সবগুলো দৈনিক কাগজ তিনি কেনেন।

কাগজগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁরই একজন কর্মচারী। এক একটা কাগজ সে তুলে ধরছিল গোকুলবাবুর চোখের সামনে।

সুবোধবাবু আরও একটু সামনে গিয়ে বললেন, "নমস্কার গোকুলবাবু। চিনতে পারছেন?"

ঘাড় ফেরাতে পারলেন না গোকুল সরকার। তাই তিনি বললেন, "আমার সামনে এসে বসুন। বড্ড রোগা হ'য়ে গেছেন দেখছি। করপোরেশনের নোটিশ পেয়েছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" সুবোধবাবু বসলেন।

"একতলার ভাড়াটে—ওই উকীলটা মশাই, ভারি ত্যাঁদড়।" এই ব'লে থামলেন গোকুল সরকার। চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে উপস্থিত হ'ল একজন চাকর। স্নান-ঘরে ঢোকবার আগে তিনি চা খাবেন। হাঁড়ির মত মস্তবড় টি-পট। পেয়ালাটাও খুবই বড়। সুবোধবাবু ভাবলেন, এসব জিনিস নিশ্চয়ই কারখানা থেকে অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়ে নিয়েছেন গোকুল সরকার। পেয়ালা পিরিচের গায়ে সোনা-কুঠির ছবি আঁকা রয়েছে। হাত নাড়তে অসুবিধে হয় ব'লে চাকরটা এগিয়ে এল গোকুলবাবুর কাছে। পেয়ালাটা তুলে ধরল তাঁর মুখের সামনে। প্রথম পেয়ালা চা তিনি টান মেরে খেয়ে ফেললেন এক নিশ্বাসে।

দ্বিতীয় পেয়ালায় চুমুক মারবার আগে সুবোধবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ডেকেছিলেন কেন?"

"দেখুন, ওই উকীলটা হয়তো করপোরেশনের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করতে পারে। আমি আপনাদের কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা উঠে যান। করপোরেশনের বিরুদ্ধে ল'ড়ে কিছু লাভও হবে না। সময় কিছু পেতে পারেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার আপনাদের হবেই। আপনি ভাল লোক, কত টাকা পেলে আপনি উঠবেন? একটু তাড়াতাড়ি বলুন, আমাকে আবার এক্ষুনি স্নান-

ঘরে যেতে হবে।” এই ব’লে দ্বিতীয় পেয়ালায় টান মারলেন গোকুল সরকার। উত্তর দিতে দেরি করলেন না সুবোধবাবু। তিনি বললেন, “আমি তো উঠেই যাচ্ছি।”

“যাচ্ছেন ? কবে ?”

“পরশু।”

“কত টাকা নেবেন ?”

“টাকা লাগবে না,” সুবোধবাবু উঠে পড়লেন, “ধারদেনা আমার নেই। গত মাসের ভাড়াও আমি আদালতে জমা দিয়ে দিয়েছি। পরশুদিন সকালে আপনি লোক পাঠাবেন—এই ক’টা দিনের ভাড়াও আমি তার হাতে দিয়ে দেব।”

তৃতীয় পেয়ালা চা-ও খাওয়া হ’য়ে গেল গোকুল সরকারের। সুবোধবাবুকে ভুল বুঝলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, “হঠাৎ এমন ভয় পেলেন কেন ? বসুন সুবোধবাবু, এক পেয়ালা চা খেয়ে যান।”

“না। আমি চলি। ভয় পাবো কাকে ?” পাল্টা প্রশ্ন করলেন সুবোধ মিত্র, “আমি তো ভাড়া দিয়েই ছিলাম আপনার বাড়িতে।”

“যাচ্ছেন ? উকীলটা কি করবে জানেন ?”

“আজ্ঞে না।”

“থাক, থাক—আপনি উঠলেই হ’ল। তাকে আমি ভয় দেখিয়ে তুলে দেব। নমস্কার সুবোধবাবু। খুশী হলুম। মাঝে মাঝে আসবেন। কোথায় বাড়ি পেলেন ?”

“কলকাতা করপোরেশনের বাইরে—কসবায়।”

নামবার মুখে সুবোধবাবু দারওয়ানটিকে আর দেখতে পেলেন না। একাই নামতে লাগলেন। পাঁচতলা থেকে একতলায় নেমে আসতে একটুও তাঁর ভয় করল না। ভয় করবার মত লোক নন গোকুল সরকার। সোনা-কুঠির মালিক তিনি, আর কিছু নয়।

রাস্তায় নেমে সুবোধবাবু ভাবলেন, সারাজীবন কাউকে তিনি ভয় করেন নি। ভয় করবার কারণও ঘটে নি কিছু। আজকাল তাঁর মাঝে মাঝে ভয় আসে মনে। বোধ হয় বুড়ো হ'য়ে পড়ছেন। আইন-আদালতের কথা মনে পড়লেই নিজেকে আশ্রয়হীন মনে করেন। পৃথিবীর কোন ঘাটে আজও বুঝি নিরাপদ বন্দর একটাও তৈরি হ'ল না।

বন্দর খোঁজবার জন্যে নয়, অমিয়াংশুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই তিনি তার হোটেলের দিকে পথ ধরলেন। বিকেলের আগে বাড়ি ফেরবার ইচ্ছে ছিল না সুবোধবাবুর। প্রায় পুরো একটা মাসই অমিয়াংশুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি। করপোরেশনের বাইরে তিনি চ'লে যাচ্ছেন, ঋণের টাকার ব্যবস্থা কিছু ক'রে যাওয়া দরকার। এবার তিনি টাকাটা তার ফেরৎ দেওয়ার তারিখ দিয়ে আসবেন। হোটেলে পৌঁছবার পরে সুবোধবাবুর মনে হ'ল, তারিখ দেওয়ার মানেই তো টাকা ফেরৎ দেওয়া। কিন্তু তিনি টাকা ফেরৎ দেবেন কেমন ক'রে? এ-মাসে তাঁর খরচ আরও বেশি। এত দিনের পুরনো সংসার তুলে নিয়ে যেতে হবে। তুলতে খরচ লাগবে।

হোটেলে এসে সুবোধবাবু খবর পেলেন অমিয়াংশু দিল্লী গেছে। এখনো ফেরে নি। কবে ফিরবে ম্যানেজার তা বলতে পারলেন না। ঘর সে ছেড়ে দিয়ে যায় নি। মনে হয়, কলকাতায় সে এক-দিনের জন্যে হ'লেও ফিরে আসবে। ঘরে জিনিসপত্র রেখে গেছে।

অমিয়াংশুর সঙ্গে দেখা হ'ল না। আর বোধ হয় দেখা হবেও না। পররাষ্ট্র-দপ্তরে বড় চাকরি একটা ওর জন্যে তৈরি হ'য়ে আছে। কলকাতার পোস্ট অফিসে আর কেন সে পায়ের ধুলো দেবে? ঋণের টাকাটা তিনি মনিঅর্ডার ক'রে দিল্লীতেই পাঠিয়ে দেবেন। দিল্লীতে যদি সে না-ই থাকে তাতেও ক্ষতি নেই।

ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র-দপ্তরের 'কেয়ারে' পাঠিয়ে দিলে অমিয়াংশু নিশ্চয়ই পাবে। এই ভেবে সুবোধবাবু বেরিয়ে এলেন হোটেল থেকে। আর কোন সমস্যা রইল না। ধারের টাকা শোধ দেওয়ার তারিখ দিতেই তিনি এসেছিলেন। দেওয়ার তারিখটাকে পাঁচ ছ' মাস পিছিয়ে দিতে হ'তো বটে, কিন্তু তাতে নীতিভ্রষ্ট হওয়ার ভয় কিছু থাকত না।

বাড়ি ফিরে চললেন সুবোধবাবু। সন্ধের আগেই গিয়ে পৌঁছনো চাই। নতুন ঠিকানায় উঠে যাওয়ার খবরটা কাউকে এখনো দেওয়া হয় নি। দিতে সাহস পাচ্ছিলেন না সুবোধবাবু।

তারক দত্ত রোডের মোড়ে ভিড় জমেছে। বিনোদ বক্সির বাড়ির সামনে সভা বসবার কথা আছে। বিকেল চারটে থেকে রাস্তা দিয়ে গাড়ি কিংবা লোকজন কেউ যাওয়া আসা করতে পারছে না। মোড়ের মুখে পুলিশ দাঁড়িয়েছে গুটি কয়েক। ওপাশের রাস্তা দিয়ে গাড়ি সব ঘুরিয়ে দিচ্ছে ওরা। একজন বাঙালী পুলিশ-সার্জেণ্ট ঘন ঘন বাঁশীতে ফুঁ দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে বাংলা ভাষায় অনুরোধ করছিল সে, "ওখানে দাঁড়াবেন না আপনারা। স'রে যান। তেওয়ারী ভিড় হঠাও—" ফুটপাতের ওপরে উঠে এলেন সুবোধবাবু। কলকাতার পুলিশ-সার্জেণ্ট শুধু বাঁশীতে ফুঁ দেয় না, বাংলায় কথাও বলে। স্বাধীন বাংলায় যে সুরের মধ্যে এতবড় একটা পরিবর্তন এসেছে তাও তিনি গত দশ বছরের মধ্যে শুনতে পান নি। এই প্রথম তিনি বিনোদ বক্সির বাড়ির সামনে সুরের বিপ্লব শুনতে পেলেন। ভিড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে রইলেন সুবোধবাবু। সেই পরিচিত রোয়াকটার ইজ্জত বেড়েছে। রোয়াকের দেহে নতুন পোশাক। আজ ওখানে গণ্যমান্যরা সব বসবেন। সারা রোয়াক জুড়ে ফরাশ পাতা। ফরাশের ওপর গোটা চার ফুলদানি। হাতীর শুঁড়ের মত মাথা উঁচু ক'রে সুবোধ-

বাবু ফুলদানিগুলো দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বড় অদ্ভুত ধরনের ফুলদানি। মনে হয়, বড় বড় চারটে হাঁড়ি বসিয়ে রাখা হয়েছে। চিনেমাটি দিয়ে তৈরি নয়, যেন কালিঘাটের চেনা-মাটির গন্ধ পেলেন সুবোধবাবু। বিষ্ণুপুর কিংবা কেষ্টনগরের মাটি হওয়াও সম্ভব। হাঁড়ির গায়ে নানারকমের ছবি আঁকা। গাছ কিংবা ফুলের ছবি ওতে নেই। সবই মেয়ে এবং পুরুষদের ছবি। এমন ধরনের মেয়ে কিংবা পুরুষের চেহারা তাঁর একটিও আজ পর্যন্ত চোখে পড়ে নি। দৃষ্টি প্রসারিত করলেন ক্লাশ 'থ্রী'র কেরানী সুবোধ মিত্র। রোয়াকের পেছন দিকের দেয়ালটা আজ আর দেখা যাচ্ছে না। পর্দার মত একখানা শাড়ি ঝুলছে সেখানে। শাড়ির গায়েও চিত্র আঁকা। ভারতীয় চিত্র তাতে সন্দেহ নেই। কদম গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে ব'সে আছেন শ্রীকৃষ্ণ। গুটি কয়েক মেয়ে জলের মধ্যে উবু হ'য়ে লজ্জা ঢাকবার চেষ্টা করছেন। ব্যাপারটা কি? ফরাশের ওপর একখানা মোটা সাইজের বইও রয়েছে। সুবল মিত্রের বাংলা অভিধানের চেয়ে সরু। বইটির চারদিকে একটা ফুলের মালা। দু'দিকে দুটো ধূপদানি। একটু আগে ন্যাপাদা তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। এবার ধূপের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সব মিলিয়ে সুবোধবাবুর মনে হ'ল বিনোদ বক্সির রোয়াক থেকে যেন একটা নতুন ধরনের গন্ধ ভেসে আসছে। বোধ হয় সংস্কৃতির গন্ধ। 'বাংলার নবযুগ' বুঝি এতদিন পরে দেহলাভ করল বিনোদ বক্সির রোয়াকে।

সুবোধবাবুর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল হারু মুন্সি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে কি হচ্ছে রে?"

"আপনি জানেন না? আজকের খবরের কাগজ পড়েন নি? বিনোদদার আজ জন্মদিন। মস্ত বড় সভা হবে। কলকাতার সব বড় বড় লোক আসবেন। এম-এল-এ, মন্ত্রী, কবি, সাহিত্যিক—"

"কবি, সাহিত্যিক? তাঁরা আসবেন কেন? বিনোদবাবুর সঙ্গে তাঁদের কি সম্পর্ক?"

হেসে উঠল হারু মুন্সি। হাসতে হাসতে সে বলল, "সব্বনাশ! বিনোদদা শুনতে পেলে আপনাকে আর আস্ত রাখবে না। ভিড়ের মধ্যে বিনোদদার স্পাই আছে। ওই যে রোয়াকের ওপরে একখানা বই দেখতে পাচ্ছেন, ওটা হচ্ছে বিনোদদার জীবনী।"

"জীবনী?" সুবোধবাবু শুধু আকাশ থেকে পড়লেন না, ভেঙে বুঝি চৌচিরও হ'য়ে গেলেন। তাই তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "জীবনী? কাদের জন্যে লেখা হ'ল? কে লিখেছে জীবনী?"

"কেউ নিশ্চয়ই লিখে দিয়েছে। ছেপেছে কলকাতার একটা বই-এর দোকান। আজকেই বাজারে বেরুলো—"

"কোন্ বাজারে?" অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করলেন চন্দনের বাবা।

"আজকের কাগজ আপনি পড়েন নি কিনা। কিছুই জানেন না।—চার আনা পয়সা দিন না স্যার?"

"পয়সা?"

"ধার চাইছি—" হারু মুন্সি হাতের তালু উল্টো ক'রে ধ'রে রাখল।

কিন্তু এরই মধ্যে হারু মুন্সির কথা ভুলে গেলেন সুবোধবাবু। ট্রাম লাইনের ওধার থেকে পুলিশের বাঁশী বাজতে লাগল। সেপাইরা সব তারক দত্ত রোডের মাঝখান থেকে ভিড় সরিয়ে দিল। বোধ হয় রুই-কাৎলারা কেউ আসছেন। বিনোদ বক্সি মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। একটু আগে গোকুল সরকারও এসে গিয়েছিলেন। রোয়াকের সামনে রাস্তার ওপরে চেয়ার সব সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। একখানা চেয়ারও আর

খালি নেই। অতিথিরা সব উপস্থিত আছেন। এবার বোধ হয় প্রধান অতিথি এলেন। সত্যিই এলেন।

সভা আরম্ভ হ'ল। বাংলার এম-এল-এ, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিজ্ঞ, কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক সবাই বক্তৃতা দিলেন। সবার মুখে একই ভাষা। একই সুর। সবাই ব'লে গেলেন, বিনোদ বক্সি শুধু স্বপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিজ্ঞ নন, তিনি সাহিত্যরসিক, তিনি সাহিত্যিকও। কবিতা কিংবা ছোটগল্প তিনি লেখেন নি বটে, কিন্তু লিখলে তিনি নাম করতে পারতেন। হয়তো বা সাহিত্যকীর্তির জন্যে পুরস্কার লাভও করতেন। সভাপতি এবার 'জীবনী'খানা রোয়াক থেকে হাতে তুলে নিয়ে ঘোষণা করলেন, "বিনোদবাবুর সারা জীবনের সাধনা এতে ছাপা হয়েছে। আমি আশা করি, বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা এ-বই তো পড়বেই এবং যাঁরা পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন তাঁরাও এ-বই পড়লে উপকৃত হবেন।"

সুবোধবাবু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। পা কাঁপছিল তাঁর। একটা নয়, দুটো পা-ই কাঁপছিল। ধীরে ধীরে হেঁটে তিনি ঢুকে পড়লেন কর্নেল বিশ্বাস রোডে। পকেটে সিগারেটের বাক্সটা খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন আবার। ডান এবং বাঁ পকেটে কোথাও তিনি বাক্সটা খুঁজে পেলেন না। সিগারেটের প্যাকেটটা নেই। সেই সঙ্গে মনিব্যাগটাও উধাও হয়েছে। ওতে মাত্র দুটো টাকাই ছিল। বোধ হয় হারু মুন্সিকে চার আনা পয়সা ধার দিলে ভালই হ'তো। এত বেশি লোকসান হওয়ার ভয় থাকত না।

বেনিয়াপুকুরের সরু গলিটায় নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। রাহুল অসুস্থ। দেখবার-শোনবার লোক কেউ নেই। রাহুলের

বাবা একা মানুষ। দুটি রোগী নিয়ে তিনি আগেই বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলেন। সময়মত ওষুধ এবং পথ্য দিতে হয়। তরকারি কাটা, মশলা বাটা এবং রান্নার কাজও তিনিই করছিলেন। কষ্টের আর সীমা ছিল না। দিনের বেলাতেও ঘরে আলো ঢোকে না। তার ওপর চোখ এত খারাপ যে, চশমা প'রেও মাঝে মাঝে মারাত্মক রকমের ভুল ক'রে বসছিলেন। ওষুধের শিশি অদল-বদল হ'য়ে যাচ্ছিল। আজ সকালে মেয়ের ওষুধ স্ত্রীর মুখে ঢেলে দিয়েছেন তিনি। পাঁচ ছ' ঘণ্টা না কাটলে এর ফলাফল কিছু বোঝা যাবে না। হয়তো ভুল ওষুধ খেয়ে রাহুলের মা আরোগ্য লাভ করবেন। কলকাতা শহরে সব কিছুই ঘটতে পারে।

আজও তিনি দাওয়ায় ব'সে ডাঁটা কাটছিলেন। পেট ভরাবার জন্যে ডাঁটা-চচ্চড়িই ভাল। এত অল্প খরচে এত বেশি তরকারি আর কি তিনি রাঁধতে পারতেন? পারা যায় না, পারা অসম্ভব। ভারতবর্ষের চতুরতম খাদ্যমন্ত্রীও পারতেন না।

হঠাৎ তিনি সামনের দিকে চোখ তুললেন। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকবার পরে বুঝতে পারলেন যে, সেদিনের সেই মেয়েটি এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। তিনি বললেন, "ব'সো মা, ব'সো। কেমন আছ তোমরা? বন্ধুরা সব ভাল আছে তো?"

জবাব দিল না ললিতা। দাওয়ার ওপর ব'সে প'ড়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "রাহুল কেমন আছে? ক'দিন কোন খবর নিতে পারি নি।"

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন রাহুলের বাবা। ডাঁটা কাটতে কাটতে তিনি বললেন, "সেই যে চিৎকার ক'রে উঠে মাটিতে প'ড়ে গেল—সেই থেকে সে তো আর সুস্থ হ'ল না। পাগল হ'য়ে গেছে। বদ্ধ পাগল! রাহুলের মা বলছিলেন ওকে কোন উন্মাদ-আশ্রমে রেখে আসবার জন্যে। রাঁচী তো অনেক দূর। শুনেছি,

কলকাতার কাছে যেটা আছে সেটা নাকি খুবই বড় হ'য়ে উঠেছে। আরও হবে—পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধাক্কায় পৃথিবীর কোন কিছুই আর ছোট থাকবে না। কিন্তু—" তিনি এবার ললিতার দিকে দৃষ্টি দিয়ে আলোচনার উপসংহার টানলেন, "কিন্তু আমি ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা কালই দেশে ফিরে যাব। বাড়িওয়ালাকে খবর দিয়ে এসেছি। দারোয়ানটা আজ থেকেই তালা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

এই সময় ঘরের মধ্যে রাহুল চিৎকার ক'রে উঠল। দরজাটা খোলা ছিল। ললিতা দেখতে পেল রাহুলকে। সে জিজ্ঞাসা করল, "তক্তাপোশের সঙ্গে ওকে বেঁধে রেখেছেন কেন?"

"কাল থেকে সে মারধোর সুরু করেছিল। সে যে কি বিপদে পড়েছিলাম মা! আমার নিজের গায়ে তো শক্তি নেই। দারওয়ানটাকে খোশামোদ করতে হ'ল। শুধু খোশামোদে কাজ হ'ল না। চার আনা পয়সা নিয়ে, তারপর রাহুলকে সে বেঁধে রেখে গেল ওইখানে। এখন শুধু দিনরাত চিৎকার করে আর বলে, 'পেলুম না, পেলুম না। ওরা নিয়ে গেল।' ওর মা আর বোনের খুব অসুবিধে হচ্ছে। ঘুমতে পারছে না। চলো মা, ভেতরে যাই। দেখবে ওকে।" বঁটি দা-টা সরিয়ে রাখলেন রাহুলের বাবা। তারপর আবার তিনি বলতে লাগলেন, "বি-এ পাস করবার আগেই কি যে সে পেতে চেয়েছিল জানি না। আমাদের সংসারে টাকার চেয়ে বড় পাওয়া আর কিছু নেই। সেইজন্যেই কলকাতা এসেছিলুম। ভাল ক'রে লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিলুম ওকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বি-এ পরীক্ষাটা দিতে পারলে না রাহুল। যাক, যা হওয়ার তাই হয়েছে। এবার ফিরে যাচ্ছি গাঁয়ে। সেখানে গেলে এদের আর ব্যারামপীড়া থাকবে না। রাহুলও সুস্থ হ'য়ে উঠবে।"

"কালই যাচ্ছেন?" জিজ্ঞাসা করল ললিতা।

"হ্যাঁ। টাকা-পয়সা প্রায় সব ফুরিয়ে এসেছে। কাল হাঁটতে হাঁটতে বালিগঞ্জের দিকে গিয়েছিলাম। মাসের আজ বারো তারিখ। ছেলেটা যে কতগুলো টিউশানী করত জানি না। ছুটো ঠিকানা আমার জানা ছিল। ভাবলুম, দশ দিন যখন পড়িয়েছে তখন এই ক'টা দিনের মাইনে তাঁরা দিয়ে দেবেন। কিন্তু—" এই ব'লে চশমার কাচ মুছলেন রাহুলের বাবা। ললিতা শুধু কথা শুনছিল না, কাজও করছিল। বঁটি দা-টা টেনে নিয়ে বাকি ডাঁটা-গুলো কুচি কুচি ক'রে কেটে ফেলছিল সে। হাত নাড়ার ভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছিল, ললিতা বুঝি ডাঁটার স্তূপটাকে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। রাহুলের বাবা তাই হাসতে হাসতে বললেন, "ডাঁটাগুলো এত ছোট ক'রে কাটলে মা, যে, এ দিয়ে আর চচ্চড়ি রাঁধা যাবে না।"

"তবে ?"

"ঠিক আছে। আজ না হয় ঘণ্ট রাঁধব। ডাঁটা-ঘণ্ট। হ্যাঁ, রাহুলের মাইনে তো আর আদায় হ'ল না। রাহুলের খবর শুনে একজন তো রেগে উঠলেন। সরকারী চাকরি করেন তিনি। আমি ফটকের বাইরেই অপেক্ষা করছিলাম। তিনি গাড়ি থেকে নামতেই আমি বললুম সব কথা। সাহেবটি প্রথমে ধমকে উঠলেন। তারপর বললেন, 'মাসের এগারো তারিখে টাকা দেওয়া যায় না। মাইনে তো পাই মাত্র বারো শো। ব্রিটিশ আমলের সাত শো টাকায় যা পারতুম এখন বারো শো-তে তা পারি না। বছরে ছু' বার ক'রে পাহাড়ে উঠতুম, আজকাল একবার উঠি। আগামী মাসের সাত তারিখে আসবেন। একদিন পরে যেন আসবেন না। সাত তারিখেই আমি চাকর-ড্রাইভারদের মাইনে দিই।' বুঝলে মা, ওর দশ দিনের মাইনেটা সঙ্গে নিতে পারলুম না। এখানেই ফেলে রেখে যেতে হ'ল।"

ললিতা উঠে পড়েছিল। রাহুলের বাবার সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। রাহুল ওকে দেখতে পেল। 'পেলুম না, পেলুম না' ব'লে চেঁচিয়ে উঠল একবার। হাত দুটো একসঙ্গে বাঁধা, তবুও সে হাতের মুঠো বন্ধ ক'রে ওপর দিকে ঘুষি মারবার ভঙ্গি করল বার দুই। কাছে এগিয়ে যেতে ভয় পেল ললিতা। রাহুলের বাবা বললেন, "দিনরাত ঘুষি ছুঁড়ছে। এ বিদ্রোহ যে কার বিরুদ্ধে আমি ঠিক জানি না। তুমি আর এগিয়ে যেও না মা।"

ললিতার চোখের পাতা আর শুকনো ছিল না। প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও চোখের জল সে রুখতে পারছে না। রাহুলের সামনে একটা কলাই-করা থালা প'ড়ে রয়েছে। ললিতা দেখতে পেল, থালার ওপরে এবং বাইরে চারদিকে ভাত আর তরকারী সব ছড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে। বোধ হয় গতকাল দুপুর বেলার ভাত তরকারী এ-সব। বিনোদ বক্সির বাড়িতেও এমন দৃশ্য দু' একবার দেখেছে ললিতা। তাঁর ভেতর-বাড়ির বারান্দায় একটা কুকুর বাঁধা আছে। কুকুরটার সামনেও ঠিক এমনি ধরনের কলাই-করা থালা একটা প'ড়ে থাকে। তাতে ভাত এবং মাছের টুকরোর অবশিষ্টাংশ মাঝে মাঝে চোখে পড়েছে ওর।

ললিতা এবার দূর থেকেই ডাকলো, "রাহুল—রাহুল।"

"ডোবাটা বোধ হয় ভরাট হয়ে এল। দেখতে পাচ্ছ, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ব্যাঙ আর ব্যাঙাচির দল পথে বেরিয়ে পড়েছে?" এই ব'লে রাহুল গুপ্ত হো হো ক'রে হেসে উঠল একবার। তারপর আবার সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "জোর যার মুল্লুক তার। ব্যাঙাচির দল হেরে গেছে, জানো?"

ললিতা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। বেরিয়ে এল বাইরে। রাহুলের বাবাও এলেন পেছনে পেছনে। জিজ্ঞাসা করলেন, "কাঁদছ কেন মা? আমাদের কষ্ট বুঝি আর সহ্য করতে

পারলে না? কবে যে আমরা সবাই মিলে একবার পেট ভ'রে ভাত খেয়েছিলাম ভাবতে গেলে রামায়ণের যুগের কথা মনে পড়ে। সত্যিই আমরা খেতে পাই না ললিতা।"

খাওয়ার কষ্টের কথাটা মনে রইল না ললিতার। সে বলল, "দেখুন, রাহুল কী ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। ওকে কেন এত মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধলেন? পৃথিবীতে কি এর চেয়ে সরু দড়ি তৈরি হয় না?"

জবাব শোনবার জন্যে ললিতা আর অপেক্ষা করল না। দাওয়া থেকে নেমে পড়ল সে। তারপরে দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে এল ফটকের বাইরে। বেনিয়াপুকুরের সরু গলিটা অতিক্রম করল দ্রুত গতিতে। পেছন দিকে দৃষ্টি ফেলার কোন দরকার ছিল না। তবুও ললিতা শেষবারের মত সেই দিকে দৃষ্টি ফেলল একবার। মনে হ'ল, দড়িটা ওর চেনা। সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে এই দড়িটাই যেন ক্রমশ মোটা হ'য়ে উঠছে। ইতিহাসের রোড, ষ্ট্রীট আর লেনগুলোতেও বার কয়েক উঁকি দিয়ে দেখেছে ললিতা। লাঞ্ছনার দড়ি সেখানেও সরু নেই। কোটি কোটি রাহুলকে দড়ি দিয়ে না বাঁধলে আজও কেউ রাজ্যশাসনের দায়িত্ব নিতে পারেন না। বেঁচে গেছে ললিতা। ইতিহাস প'ড়ে সে সময় নষ্ট করে নি। কেন পড়বে? ইতিহাসের আত্মাও লাঞ্ছনায় কাতর।

বিকেলবেলা জানালার ধারে ব'সে ছিল ললিতা। ব'সে ব'সে ভাবছে। বেনিয়াপুকুরের কথা ভেবে মাঝে মাঝে চোখে জলও আসছে ওর। কি দরকার ছিল এত বড় একটা মিথ্যে জগৎ গ'ড়ে তোলবার? রাহুল যা করেছে তার জন্যে ললিতা ওর কাছে কৃতজ্ঞ। সারাজীবনেও রাহুলের ঋণ সে শোধ করতে পারবে না। কিন্তু ললিতার যতদূর মনে পড়ে, সে কোনদিনও জোর ক'রে

কিছু আদায় করে নি। রাহুল যা দিয়েছে স্ব-ইচ্ছায় দিয়েছে। তবে কেন এমন হ'ল ?

বেচারী রাহুল! সব সময়েই সে মনে করত, ললিতাকে বুঝি ছোঁ মেরে অন্য কেউ নিয়ে গেল। ওর চেয়ে সবাই ছিল বেশি শক্তিশালী।' প্রণব, শঙ্কর, জয়ন্ত কিংবা অমিয়াংশু, এদের কথা ভেবে ভেবে সে ভয়ে অস্থির হ'য়ে উঠত। শেষ পর্যন্ত সারা সংসার-টাকে ভয় করতে লাগল। ললিতাকে পাওয়ার জন্যে সে তিনতলা বাড়ির কল্পনা পর্যন্ত করেছে। কারো চেয়ে সে ছোট নয়, সেইটে প্রমাণ করতে গিয়ে কী নিদারুণ কষ্ট পেল রাহুল! শৌখিন শহরটার বুকে এতটুকু নরম জায়গা নেই। নিষ্ঠুরতার পাথর দিয়ে এর সবগুলো তলাই তৈরি হয়েছে।

ইস্কুল থেকে ফিরে এল চন্দন। বই, খাতাপত্র সব টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে এসে ব'সে পড়ল দিদির পায়ের কাছে। জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কি হয়েছে দিদি ?"

"কি হবে, কিছুই না।"

"তবে তুমি আজ ক'দিন থেকে জানালার ধারে ব'সে ব'সে কাঁদ কেন ?"

"তুই কখন আমায় কাঁদতে দেখলি ভাই!"

চুপ ক'রে রইল চন্দন। দিদি যে সত্যি কথা বলছে না তাও সে বুঝতে পারল। দিদির চোখ এখনো ভেজা। তা ছাড়া কাল মাঝরাত্রিতে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ললিতাকে সে বিছানায় দেখতে পায় নি। তারপর সে বুঝতে পারল, দিদি জানালার ধারে ব'সে ব'সে কাঁদছে। তবে কি বাবা ওকে কিছু বলেছেন ? না, দিদিকে যে বাবা কিছু বলবেন না চন্দন তা জানে। বাবার দুর্বলতা চন্দনের চোখেও এখন ধরা পড়েছে। বাবা শুধু গরিব নন, দিদির মত লেখাপড়াও তিনি জানেন না। বাবার কষ্টের

অংশ নিচ্ছে চন্দনও। আজকাল মাঝে মাঝে সে ভাবছে, স্কুল-ফাইনাল দেওয়ার পরে আর সে পড়বে না। বিদ্যায় সে বাবার চেয়ে ছোটই থাকবে। আহা, বেচারী বাবা! একটু পরেই চন্দন জিজ্ঞাসা করল, "আজকাল রাহুলদা আসে না কেন দিদি?"

"রাহুলদার অসুখ।"

"কি অসুখ?"

"রাহুলদা পাগল হ'য়ে গেছে রে!" ললিতার চোখ দিয়ে ঝর-ঝর ক'রে জল পড়তে লাগল।

কর্নেল বিশ্বাস রোডের বাড়িটা কাল ছেড়ে দিতে হবে। সুবোধবাবু নিজেই পাকা কথা দিয়ে এসেছেন গোকুল সরকারকে। কথা দেওয়া মানে কথা রাখা। কিন্তু স্নেহলতাকে খবর দিতে ভয় পাচ্ছিলেন তিনি। এতদিনকার পুরনো শেকড় উপড়ে ফেলতে হয়তো তাঁর কষ্টই হবে। ললিতা এবং চন্দনও যে শান্তভাবে এখান থেকে উঠে যাবে তাও তিনি ভাবতে পারেন নি। চন্দন এখনো বাবার ওপর নির্ভরশীল, সে প্রতিবাদ করলেও রুখে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু ললিতা? সে তো আসছে মাসের পয়লা তারিখে নতুন কাজে যোগ দিতে যাবে। সাড়ে তিনশো টাকা মাইনে পাবে। বাধা দেওয়ার সামর্থ্য শুধু ললিতারই আছে। হয়তো বিনোদ বক্সিও বাধা দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে রোয়াকটাও পথ রুখে দাঁড়াবে তাঁর।

না, ভয় করলে আর চলবে না। দিনটা প্রায় শেষ হ'তে চলল। খবরটা সবাইকে দেওয়া দরকার। রাত্রির মধ্যে জিনিস-পত্র সব গুছিয়ে ফেলতে হবে। অবিশ্যি দু'দিন ধ'রে গুছবার মত জিনিসপত্র নেইও তাঁর। একটা ঠেলাগাড়িতেই কুলিয়ে যাবে। সকালবেলা তিনি একটা ঠেলাগাড়ি ভাড়া ক'রেও এসেছেন।

কাল ভোরবেলা ছ'টার সময় ঠেলাগাড়িটা আসবে। সাতটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে আর কোন অসুবিধে হবে না।

মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন সুবোধবাবু। স্নেহলতা চা তৈরি করছেন। ললিতা জানালার ধারে ব'সে আছে। চন্দনও এইমাত্র ইস্কুল থেকে ফিরে এল। প্রেক্ষাগার পূর্ণ।

স্নেহলতাকে ডাকতে গিয়ে সুবোধবাবু দেখলেন, চন্দনের মা তন্ময় হ'য়ে কি যেন ভাবছেন। কেটলীর জল ফুটে ফুটে বোধ হয় শুকিয়েও গেল। কেটলীর চারদিক দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন সুবোধবাবু। তবে কি বাড়ি ছাড়বার খবরটা পেয়ে গেছে স্নেহলতা? কি ক'রে পেল, কোথা থেকে খবর বেরুলো? হয়তো গোকুল সরকারের অফিস থেকে বেরিয়েছে। সেই খবরটা উড়ে এসেছে বিনোদ বক্সির কানে। ললিতা-মারফৎ পৌঁছেছে এসে স্নেহলতার কাছে। যাক, তা হ'লে তো যা ঘটবার ঘটেই গেছে। ভয় করবার আর কারণ নেই। এবার জিনিসপত্র গুছবার আদেশ দিলেই হ'ল। পেছনে দাঁড়িয়ে তিনি ডাকলেন, "স্নেহ, স্নেহলতা—"

"কে? ও, তুমি! চা নিয়ে আসছি। এই সবে জলটা ফুটলো—" কেটলী থেকে টি-পটে জল ঢালতে গিয়ে স্নেহলতা দেখলেন, জল শুধু বাষ্প হ'য়ে উড়ে যায় নি, উথ্‌লে খানিকটা প'ড়েও গেছে। মাপা জল, তবুও টি-পটটা ভর্তি হ'ল না।

সুবোধবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "জল একটু কম হ'ল না?"

"হ্যাঁ। বোধ হয় কমই দিয়েছিলাম। তুমি যাও, তোমার চা আমি আগেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"না, না—সবাই একসঙ্গে খাব। তুমি বরং আধ পেয়ালা ক'রে দাও। ললিতা, ললিতা গেল কোথায়?" সুবোধবাবু হঠাৎ ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। আর দেরি করা চলে না। রাত্রিটা

শুধু বাকি। জিনিসপত্র খুবই কম, তবুও গুছতে পাঁচ ছ' ঘণ্টা তো লাগবে। দেরি যদি হয় তা হ'লে সেই শেকড়টা কাটতেই দেরি হবে। এদের মনের শেকড়গুলো ইটের ফাঁক থেকে টেনে টেনে তুলে ফেলতে সময় লাগতে পারে। সময় দিতে চান না সুবোধবাবু। সেইজন্যেই তিনি মাত্র একটা রাত্রির সময় রেখেছেন হাতে।

পেয়ালায় চা ঢালছিলেন স্নেহলতা। চন্দন চা খায় না। তিনটে পেয়ালায় অর্ধেক ক'রে চা ঢেলে তিনি বললেন, "যাও, ব'সো গিয়ে—"

"বসবার আর সময় নেই—তোমরা সব এসো। ললিতা, চন্দন, তোরা সব আয়—আমার ঘরে আয়।" বলতে বলতে সুবোধবাবু এগিয়ে গেলেন ললিতার ঘরের দিকে।

ভয়ে বুক শুকিয়ে উঠল স্নেহলতার। চন্দনের বাবার গলায় নতুন সুর শোনা যাচ্ছে। বড্ড বেশি কর্কশ শোনাচ্ছে। গত ছ' দিন তিনি কথা বলেন নি। দম নিচ্ছিলেন। আজ বোধ হয় শোধ নেবেন তিনি। ঝড় ওঠবার পূর্বাভাস। গোকুল সরকারের পুরনো বাড়িটা ভেঙে পড়বে না তো? পেয়ালাটা তুলতে গিয়ে স্নেহলতা দেখলেন, হাতটা তাঁর কেঁপে উঠল। চন্দনের বাবা বোধ হয় সবই শুনতে পেয়েছেন। কার কাছ থেকে শুনলেন? কোথা থেকে খবর বেরুলো? বোধ হয় খবর বেরিয়েছে বিনোদ বক্সির রোয়াক থেকে। চন্দনের মারফৎ পৌঁছেছে এসে সুবোধ-বাবুর কানে। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে স্নেহলতা উঠে পড়লেন।

ললিতার সামনে এসে সুবোধবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর কি এখন কোন কাজ আছে?"

"না, বাবা।" জবাব দিল ললিতা।

"কোথাও যেতে হবে না তো ? মানে, অ্যাপয়েন্টমেণ্ট নেই তো ?"

"থাকলেও বাতিল ক'রে দেব।"

"হঠাৎ এমন জোর এল কোথা থেকে ? চাকরি তো এখনো পাস নি ললিতা।"

"তা হোক—এতদিন পর তুমি ডাকছ।...তুমি তো আমার সঙ্গে কোনদিনই অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করো নি বাবা।"

"বেশ, বেশ—আজ করলুম। ওঘরে আয়। চন্দন—

"কেন বাবা ?" চন্দন এসে দাঁড়াল সুবোধবাবুর গা ঘেঁষে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর সময় আছে তো ?"

"এই তো ইস্কুল থেকে এলুম বাবা। ছ'টার আগে পড়তেও বসব না।"

"রোয়াকে গিয়ে বসবি নে ?"

"আমি তো আজকাল সেখানে যাই না বাবা।"

"ও, তোরও উন্নতি হয়েছে দেখছি। শুধু আমি, আমিই কেবল দিন দিন তলিয়ে যাচ্ছি। যাক, আমি বুড়ো হ'য়ে গেছি। আমার কোন ভবিষ্যৎ নেই। তোরা আয় আমার সঙ্গে।"

হতভম্বের মত ললিতা আর চন্দন চ'লে এল সুবোধবাবুর পিছু পিছু। স্নেহলতা আগেই পোঁছে গিয়েছিলেন। জানালার ধারে তিনটে চায়ের পেয়ালা সাজিয়ে রেখেছিলেন তিনি। এ ঘরে টেবিল ছিল না। তিনি বললেন, "তোমরা আগে চা খেয়ে নাও। ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।"

স্নেহলতার আদেশ মত সুবোধবাবু চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিলেন হাতে। এক টানে পুরো চাটুকু খেয়েও ফেললেন তিনি। ললিতার চা খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, তবুও সে সুবোধবাবুর মত তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। স্নেহলতা শুধু ধীরে ধীরে আরাম ক'রে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলেন।

এবার সুবোধবাবু আর অপেক্ষা করলেন না। ব'লে ফেললেন, "কাল সকাল সাতটার সময় আমরা এ বাড়ি থেকে উঠে যাব।"

সবার আগে নিষ্কৃতির দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন স্নেহলতা। বললেন তিনি, "বাঁচলুম।"

সিগারেট ধরাতে বাধ্য হলেন সুবোধবাবু।

চন্দন লাফিয়ে উঠে বলল, "আমিও বাঁচলুম মা।"

সুবোধবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন রে?"

"রোয়াকের ছেলেরা আমায় দেখে হাসে। কাল থেকে বিনোদবাবুও হাসতে আরম্ভ করেছেন। তিনি আমায় ডেকে-ছিলেন, যাই নি কিনা।"

"যাস নি কেন?"

"কি করব গিয়ে, শুধু দিদির খবর জিজ্ঞাসা করেন। দিদি কেমন আছে, দিদি এখন কোথায়, এইসব। এক নম্বরের বদমায়েস।"

চন্দনের কথা শুনে সুবোধবাবু হি হি ক'রে হেসে উঠলেন। তৃপ্তির হাসি। সিগারেটে ঘন ঘন টান মারতে লাগলেন তিনি। তৃপ্তির স্বাদ ঘনতর হচ্ছে। স্বাদের মাত্রা বাড়াবার জন্যে তিনি এবার প্রশ্ন করলেন, "কই, ললিতা কিছু বললি না তো?"

"বাঁচলুম কি না জানি না। তবে ভাল হ'ল।"

"ভাবছিস, এখান থেকে আমরা বুঝি চৌরঙ্গীর হোটেলে গিয়ে উঠব?"

"তা কেন ভাবতে যাব বাবা?" ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল ললিতা।

"দাঁড়া—" গর্জন ক'রে উঠলেন সুবোধবাবু, "ইচ্ছে করলে তুই গিয়ে চৌরঙ্গীর হোটেলে উঠতে পারিস। আমরা কেউ আপত্তি করব না।"

"আমায় তোমরা আলাদা ক'রে দিতে চাও বুঝি ?"

"তুই তো আলাদাই—" স্নেহলতার দিকে চেয়ে সুবোধবাবু বললেন, "আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে কেউ সাড়ে তিনশো টাকা মাইনে পায় না।"

"কোথায় যাচ্ছি আমরা ?" জিজ্ঞাসা করলেন স্নেহলতা।

"করপোরেশনের বাইরে—কসবায়।" জবাব দিলেন সুবোধবাবু।

দ্বিতীয়বার লাফিয়ে উঠল চন্দন, "বাবা, কসবা আমি চিনি। বালিগঞ্জ স্টেশনের পুব দিকে। একদিন আমি গিয়েছিলাম—"

"গিয়েছিলি ?"

"হ্যাঁ বাবা। ন্যাপাদা নিয়ে গেল।"

"সেদিকেও ন্যাপাদারা যায় নাকি ?" শঙ্কিত বোধ করলেন সুবোধবাবু।

"যায়। বিনোদবাবুর গাড়ি চেপে যায়। সেখানে বিনোদ বক্সির একটা বাগানবাড়ি আছে। দিদি, তুমি চ'লে যাচ্ছ কেন ? তুমি তো বিনোদবাবুর সঙ্গে সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে একদিন।"

দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে পড়লেন সুবোধবাবু। নিজেকে সংযত করার দরকার বোধ করলেন তিনি।

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সুবোধ মিত্র। সন্ধে ছ'টা থেকেই ঘুমচ্ছেন। রাত এখন আটটা। রান্নাবাড়া শেষ হ'য়ে গেছে স্নেহলতার। চন্দন আর ললিতা খেয়ে নিয়েছে। বাসনগুলো রাত্রির মধ্যেই মেজে ফেলতে হবে। কাল কসবায় গিয়ে যতক্ষণ না পৌঁছনো যাচ্ছে ততক্ষণ আর এগুলো কাজে আসবে না।

সামনের ঘরে ব'সে চন্দন আর ললিতা নিজেদের জিনিসগুলো গোছগাছ ক'রে রাখছিল। কাল সকালে ঠেলাগাড়িতে সব

চাপিয়ে দিতে হবে। ললিতার অর্থবিদ্যার নোটবইখানা চন্দন তার নিজের বইগুলোর সঙ্গেই বেঁধে ফেলল। নারকোলের দড়ি দিয়ে খুব ক'ষে ক'ষে বেঁধেছে সে। না বাঁধলেও পারত। ললিতা জানে, ব্যানার্জির অর্থবিদ্যার এক পয়সাও দাম নেই। এটা পুরনো সংস্করণ। অষ্টাবিংশতির জন্যে কলকাতার ছেলেরা সব অপেক্ষা করছে। নোটবইখানা জানালা দিয়ে রাস্তায় কিংবা ডাস্টবিনে ফেলে দিতেও পারত ললিতা। কিন্তু দিল কই? বোধ হয় পুরনো কাগজ সের দরে বিক্রি করলে দু' চার আনা দাম পাওয়া যেতে পারে। কিংবা রাহুল গুপ্তের নাম-লেখা ঐশ্বর্য সে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে পারল না।

ন'টা বাজল। সামনের উঁচু ম্যানসনটার দেয়াল-ঘড়িতে সজোরে সময় বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। হঠাৎ পুবদিকের দেয়ালে দৃষ্টি পড়ল চন্দনের। জিজ্ঞাসা করল সে, "দিদি, মানচিত্রটা নেব না? আঠা দিয়ে লাগানো আছে।"

"কি দরকার? ছিঁড়ে গেছে।"

"ওতে গোটা পৃথিবীটা আছে দিদি।"

"বড্ড পুরনো পৃথিবী ভাই। ও না থাকাই ভাল। এবার শুয়ে পড়। ন'টা বেজে গেল। কাল আবার সকাল সকাল উঠতে হবে।"

"আমায় কিন্তু ভোররাত্রে তুলে দিও। তুমি এখন কি করবে? শোবে না?"

"আসছি।" আলোটা নিবিয়ে দিল ললিতা। চন্দনের পাশে এসে শুয়েও পড়ল সে। ঘুমবার আগে চন্দন আবার জিজ্ঞাসা করল, "মানচিত্রটা ফেলে গেলে বাবা রাগ করবেন না তো?"

"না রে।...বাবাকে আমরা কেউ চিনি না। তিনিও নতুন মানচিত্রের খোঁজ করছেন। এখন ঘুমো চন্দন।"

"কিন্তু—" ভাবতে লাগল চন্দন। একটু পরে আবার সে বলল, "সকালে তো সময় পাওয়া যাবে না। সাত-তাড়াতাড়িতে খুলতেও পারব না। এক কাজ করলে কেমন হয় দিদি?"

"কি?"

"এখন যদি জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখি—আঠা সব গ'লে যাবে। সকালে উঠে টান মারলেই—"

"দরকার নেই। ওকে জল দিয়ে ভেজালে কাজ হবে না। আগুন দিয়ে পোড়াতে হবে। চন্দন—"

"দিদি—"

"তারপর কি হবে জানিস? গোকুল সরকার আর বিনোদ বক্সিদের পৃথিবীটা পুড়ে যাওয়ার পরে নতুন মানচিত্র আঁকা হবে। আঁকব আমরাই। নইলে কোটি কোটি রাহুলদা জন্ম থেকেই পাগল হ'য়ে থাকবে। চন্দন—চন্দন—"

উত্তর দিল না চন্দন। ললিতা বুঝল, ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। আগুনের গল্পটা সে শুনল কি না জানতে পারল না ললিতা।

ঘুম থেকে উঠে সুবোধবাবু ভাত খেয়ে নিয়েছেন। স্নেহলতার বাসন মাজাও শেষ হ'য়ে গেছে। উনুনের আগুন নিবে গিয়েছিল। তোলা উনুন। এবার সেটা পরিষ্কারও ক'রে ফেললেন তিনি। ছাইগুলো ফেলে রাখলেন বারান্দার কোনায়। কুলুঙ্গিতে মসলার কৌটোগুলোও ফেলে রাখলেন না। আজই সব গুছিয়ে ফেললেন তিনি। ছেঁড়া শাড়ির টুকরো একটা ছিল। টিনগুলো বেঁধে ফেললেন তাতে। সরষের তেলের শিশিটা আলোর দিকে তুলে ধ'রে দেখলেন, চার-পাঁচ ফোঁটা তেল তলার দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। গড়িয়ে গড়িয়ে নষ্ট হওয়ার ভয় নেই। সেটাও তিনি বেঁধে নিলেন মসলার কৌটোর সঙ্গে।

ঘরে ব'সে সুবোধবাবু স্নেহলতাকে লক্ষ্য করছিলেন। চার-পাঁচটা মসলার টিন গুছিয়ে রাখতে বেশি সময় নিচ্ছিলেন তিনি। অন্যমনস্কতার প্রমাণও তিনি পেলেন দু'একটা। তবে কি কর্নেল বিশ্বাস রোডের বাড়িটা ত্যাগ করতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর? হওয়া স্বাভাবিক। অভ্যাস পুরনো হ'লেই তার প্রতি মায়া পড়ে মানুষের। খারাপ অভ্যাসও ভাল ব'লে মনে হয়।

স্নেহলতা ঘরে আসতেই সুবোধবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কাজ কি তোমার শেষ হয় নি?"

"হ্যাঁ, তেমন আর কি কাজ। ঠেলাগাড়ির ওপর একটা চট বিছিয়ে দিলেই চলবে। ছোট ছোট জিনিসের সংখ্যাই তো বেশি। ফাঁক দিয়ে প'ড়ে যাওয়ার ভয় আছে। ললিতার তোশকের তলায় বেশ বড় সাইজের চট আছে একটা—"

"স্নেহ—" গম্ভীর স্বরে সুবোধবাবু ডাকলেন, "বাড়িটা কি তুমি ছাড়তে চাও নি?"

"আগে ছাড়লে খুশী হতুম। মাস চার আগেও যদি ছাড়তে—" হঠাৎ থেমে গেলেন স্নেহলতা। উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলেন সুবোধ মিত্র। আগামী কালের নতুন প্রভাতের কথা ভেবে ঈষৎ পূর্বেও সুবোধবাবু মনে মনে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিলেন। বাড়ি ছাড়বার পক্ষে সবারই সমর্থন তিনি পেয়েছেন। অতএব নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন তাঁকে মাতিয়ে তুলেছিল খুব। কিন্তু স্নেহলতার হাবভাব থেকে এখন তাঁর সন্দেহ হচ্ছে, ললিতার মায়ের সমর্থন তিনি পান নি।

সুবোধবাবু তাই জিজ্ঞাসা করলেন, "চার মাস আগে বাড়ি ছাড়বার কথাটা তুললে কেন স্নেহ?"

"একটা সর্বনাশ থেকে সবাই আমরা বাঁচতে পারতুম।"

"সর্বনাশ? কি হয়েছে স্নেহ?" সুবোধবাবু স্থির হ'য়ে বসলেন।

মধ্যরাত্রির সময় বিজ্ঞাপিত হ'ল ম্যানসনটার দেয়াল-ঘড়িতে। তারিখটা বদলে যাচ্ছে। গেলও বদলে। স্নেহলতা ঘোষণা করলেন, "ললিতা গর্ভবতী ॥"

পৃথিবীর সবগুলো ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলছে। নীতিভ্রষ্ট পৃথিবীর ঘড়ি এগুলো নয়। সময়ের হিসেব করছেন সুবোধ মিত্র। তাঁর মগ্নচৈতন্যে নতুন রক্তমাংস দানা বাঁধছে। আশার অঙ্কুর জন্ম নিয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ক' মাস হ'ল ?"

"তিন মাস।"

"বিনোদ বক্সিকে আর ভয় পাওয়ার কারণ নেই।" এই ব'লে উঠে পড়লেন সুবোধবাবু। স্নেহলতা থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় চললে ?"

"খবরটা দিয়ে আসি।" সুবোধবাবু চ'লে এলেন ললিতার ঘরে। আলো জ্বাললেন। তিনি দেখলেন, জানালার ধারে ব'সে রয়েছে ললিতা। মাথায় হাত রাখলেন ওর। তারপর সুবোধবাবু বললেন, "আয়, আজ আর চন্দনের পাশে শোয়ার দরকার নেই। আমার পাশে শুয়ে ঘুমুবি আয় ললিতা।"

ওকে হাতে ধ'রে তুলে নিয়ে এলেন সুবোধবাবু। নিজের বিছানার ওপর বসিয়ে দিয়ে বললেন, "স্নেহ, আমরা দু'দিকে শোব, মাঝখানে শোবে ললিতা। আমরা পাহারা দেব, ও ঘুমবে। আমাদের জাগরণ ব্রত-পালনের জাগরণ। ললিতা, আর তোকে হোটেলে গিয়ে বাস করতে বলব না। তুই আমাদের, তোর সন্তানও আমাদের।"

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

ভোরবেলাতেই ঠেলাগাড়ি এসে গেল। সুবোধবাবু আর চন্দন দু'জনেই জিনিসপত্র তুলে দিলেন সব। পাড়ায় নিশ্চয়ই বাড়ি ছাড়বার খবরটা এতক্ষণে র'টে গেছে। খোঁজ নেওয়ার দরকার বোধ করে নি কেউ।

সাতটায় বেরুতে পারলেন না সুবোধবাবু। গোকুল সরকারের লোকজন পৌঁছল এসে আটটায়। সুবোধবাবু বললেন, "আপনি সব দেখেশুনে নিন।" ভাড়ার টাকাও চুকিয়ে দিলেন তিনি। সঙ্গে সেই কেরানী-ছেলেটি রসিদ নিয়ে এসেছিল। রসিদটা সুবোধবাবুর হাতে দিয়ে ছেলেটি বলল, "দেখবার কিছু নেই। এই অংশটা আজ থেকেই ভাঙা সুরু হবে।"

"একেবারে আজ থেকেই ?" জিজ্ঞাসা করলেন সুবোধবাবু।

"একেবারে এই মুহূর্ত থেকে। ঠিকেদার তার লোকজন নিয়ে এসেছে। কনট্রাক্টের কাজ—যত তাড়াতাড়ি ভাঙতে পারবে ঠিকে-দারের মুনাফা হবে তত বেশি। আপনারা তো এক্ষুনি ছাড়ছেন ?"

"এক্ষুনি।"

"কিন্তু—" ছেলেটি কি যেন ভাবল একটু, তারপর বলল, "ইচ্ছে করলে আজকের পুরো দিনটাই আপনারা দখল নিয়ে থাকতে পারতেন। গোকুল সরকার আজকের ভাড়াটাও নিয়ে নিলেন। হিসেব ক'রে দেখলেন না ?"

"না। দরকার নেই।" এই ব'লে সুবোধবাবু যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন। স্নেহলতা, চন্দন আর ললিতা সিঁড়ির মুখে অপেক্ষা করছিল। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, "সবগুলো ঘর ভাল ক'রে দেখেছেন তো ? এক্ষুনি ভাঙতে সুরু করবে ওরা। কিছু ফেলে গেলেন না তো ?"

"না—" এই ব'লে সুবোধবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন। পুব দিকের দেয়ালে দৃষ্টি পড়ল তাঁর। সহসা দেয়ালের দিকে হাঁটতে লাগলেন তিনি। পৃথিবীর পুরনো মানচিত্রটা ফস ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সুবোধবাবু বললেন, "চন্দন, দিদি আর মাকে নিয়ে তুই ট্রামে চেপে যা। বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে গিয়ে নেমে পড়বি। সেখান থেকে রিকশা নিবি। ঠিকানা তোর মায়ের কাছে আছে। এই নে নতুন বাড়ির চাবি। আমার পৌঁছতে একটু দেরি হবে। ঠেলাগাড়ির সঙ্গে আমি যাব।"

"কেন বাবা? আমি ঠেলার সঙ্গে সঙ্গে যাই। তুমি বরং মা আর দিদিকে নিয়ে যাও।"

"না। এক কাজ কর। বালিগঞ্জ স্টেশনে গিয়ে তোরা অপেক্ষা করিস। আমি এলে তারপর রিকশার ব্যবস্থা হবে।"

কর্নেল বিশ্বাস রোডে নেমে পড়লেন ওঁরা। পাশের দরজা দিয়ে উকীলবাবু বেরিয়ে এলেন। বললেন তিনি, "আমিও এবার উঠব। কাল গিয়েছিলাম গোকুল সরকারের সোনা-কুঠিতে। কথা দিয়ে এলুম। কত টাকা নিয়ে বাড়িটা ছাড়লেন সুবোধবাবু?"

"টাকা? টাকা নেব কেন?"

"টাকা নেন নি?"

"না।"

"কি আশ্চর্য! গোকুল সরকার বললেন, আপনি তিনশো টাকা নিয়েছেন? ছি. ছি, মশাই, আমি তাই তাড়াতাড়ি আড়াইশো টাকা গিলে ফেললুম! তিনি বললেন, দোতলার ভাড়াটে ব'লে আপনাকে তিনশো দিয়েছেন। লোকটা তো ভারি চালাক! যাক, যাক, এখন তো কিছু করবার নেই। একটু দাঁড়ান সুবোধবাবু। নমস্কার।" সুবোধবাবুও হাত তুলে নমস্কার

করলেন তাঁকে। উকীলবাবু রাস্তায় এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় বাড়ি পেলেন ?"

"কলকাতা করপোরেশনের বাইরে—কসবায়।"

বাড়ির সামনে কুলীরা সব অপেক্ষা করছিল। হাতুড়ি, শাবল, গাঁতি ছাড়াও আরো সব নতুন রকমের যন্ত্রপাতি দেখতে পেলেন সুবোধবাবু। তিনি বেরিয়ে আসবার পরে ওরা সব ভেতরে ঢুকল। ঠিকেদারটি তো উঠে গিয়েছিল আগেই।

সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল জায়গাটা এবার পার হ'তে হবে। সকাল আটটার আগেই রোয়াকের ওপর ভিড় জ'মে গেছে। পথে বেরিয়ে পড়বার পরে সুবোধবাবুর মন থেকে ভয়ের মাত্রা ক'মে যেতে লাগল। শক্তি এবং সাহস বাড়তে লাগল তাঁর। মুখ উঁচু করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন সামনের বড় ম্যানশনটার সবগুলো জানালা আজ খোলা। প্রত্যেকটা জানালার ওপাশে লোকের ভিড়। জানালার বাইরে মুখ বা'র ক'রে দিয়ে দাশুবাবু দাঁতে বুরুশ লাগাচ্ছেন। মস্ত বড় চাকরি করেন তিনি। শিক্ষিত মানুষ। রোয়াকে বসেন না দাশুবাবু। তবুও তিনি সুবোধবাবুদের দেখে হাসবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সুবোধবাবু ভয় পেলেন না। তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন।

বিনোদ বক্সিও রোয়াকের ওপর ব'সে ছিলেন আজ। সকালের দিকেই খবর পেয়েছিলেন তিনি ললিতারা চ'লে যাচ্ছে। সুবোধ-বাবুদের দেখতে পেয়ে বিনোদ বক্সি সুর চড়িয়ে বলতে লাগলেন, "ক' টাকার জিলিপী আনলি রে ম্যাপা ?"

"মাত্র দু' টাকার দাদা। আর গোটা দুই টাকা দ্যাও-না, সন্দেশ আনি ?"

"দেব, দেব। সময় আসুক, বিশ টাকার সন্দেশ খাওয়াব। এখন গরম গরম জিলিপী খা।"

জিলিপী চিবতে চিবতে হারু মুন্সি বলল, "বিনোদদা খাঁটি কথা বলেছে। জিব সামলে খেয়ো, বড্ড গরম। বাষট্টি সালে আবার বিনোদদার হ'য়ে চেঁচাতে হবে তো।"

ন্যাপাদা জিজ্ঞাসা করল, "আরও চারটে বছর কি ক'রে কাটবে বিনোদদা?"

"জিলিপী খেয়ে কাটাবি। প্রতিবাদ করিস নে, গরম গরম জিলিপী খাওয়াব। প্রতিবাদ করলে রকের তলায় চাপা পড়বি। ওই ওরা আসছে রে—"

হারু মুন্সি সামনের দিকে চেয়ে বলল, "এই চন্দন, জিলিপী খেয়ে যা। চললি মাইরি?"

জবাব কেউ পেল না। বিনোদ বক্সি দেখলেন, ওরা সবাই নিঃশব্দে মাথা উঁচু ক'রে মোড়টা পার হ'য়ে যাচ্ছে। অপমানিত বোধ করলেন বিনোদবাবু। রোয়াক থেকে নেমে পড়লেন তিনি। সুবোধবাবুর হাতে একখানা বই দিয়ে বললেন, "আমার জীবনী এটা। ছ'শো বায়ান্ন পাতার বই। প'ড়ে দেখবেন।" তারপর ললিতার দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "পয়লা তারিখে কাজে যোগ দেবে না?"

"না। গতকাল চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছি।" এই ব'লে ললিতা এসে দাঁড়াল ট্রাম-রাস্তার ধারে। বিনোদ বক্সি ভাবলেন, ছেলেগুলোকে লেলিয়ে দেবেন কি না। ভয় পেলেন। সুবোধবাবুকে মনে মনে তিনি ভয় করেন। তা ছাড়া সদর রাস্তার ওপর একটা হৈ-হল্লাও হ'য়ে যেতে পারে। দুপুরের দিকে আবার তাঁকে আইন-পরিষদে গিয়ে বসতে হবে। সন্ধের সময় লেডী ভানু ব্যানার্জির বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন রক্ষা করা চাই। রাত্রে রাজভবনে ডিনার। এশিয়ার কোন্ এক দেশ থেকে যেন মস্তবড় একজন নামী লোক এসেছেন। হৈ-হল্লার

মধ্যে জড়িয়ে পড়লে মুশকিল হ'তে পারে। মাত্র পাঁচশো ভোট পেয়ে জিতেছেন তিনি। এত অল্প মূলধন নিয়ে আর বেশি এগিয়ে যাওয়া যায় না। বিনোদ বক্সি উঠে পড়লেন রোয়াকে। শেষ অস্ত্রটা ছুঁড়লেন তিনি। ছেলেদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিনোদ বক্সিও আজ হাসতে লাগলেন। হাসির অস্ত্র সুবোধবাবুর কান পর্যন্ত পৌঁছলো।

ট্রামের স্টপেজ সামনেই ছিল। ট্রাম আসতে দু' এক মিনিট দেরি আছে। উল্টো দিকের ট্রাম, ভিড় খুব বেশি থাকবার কথা নয়। তবুও সাবধান হওয়ার দরকার আছে। এমন সময় একটা খালি ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সুবোধবাবুর সামনে। নতুন বেবি ট্যাক্সি। অমিয়াংশুর সঙ্গে তিনি একবার ট্যাক্সিতে উঠেছিলেন। সেই সময়কার অনুভূতির কথা মনে নেই। ট্যাক্সিটা নতুন, না পুরনো ছিল তাও তিনি স্মরণ করতে পারলেন না। এটা যে নতুন 'বেবি' সে সম্বন্ধে সুবোধবাবুর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। তিনি থামতে বললেন ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে। ললিতাকেই ডেকে বললেন, "এটাতে উঠে বোস্ মা। সাবধান মত বসিস।"

চন্দন চেঁচিয়ে উঠল, "আবার ট্যাক্সি কেন বাবা ?"

"তর্ক করিস নে। ওঠ—ললিতা, তুই মাঝখানে বোস্,—হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। ড্রাইভার, বালিগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছে দিও। সাবধানে চালাবে। ভাড়া যা লাগে আমার ছেলেই দিয়ে দেবে।" পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বা'র ক'রে চন্দনের হাতে গুঁজে দিলেন তিনি। ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাওয়ার পরে হঠাৎ যেন সুবোধবাবুর মনে হ'ল, গাড়িটা তো নতুন নয়, পুরনো বড় ট্যাক্সি। বেবি ট্যাক্সি ব'লে তিনি ভুল করলেন কি ক'রে ?

বিনোদ বক্সিদের হাসি থেমে গেছে। হাসির আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছিল না। এবার তিনি অন্য আওয়াজটা শুনতে পেলেন।

হাতুড়ি আর শাবল মেরে বাড়িটা ভাঙছে ওরা। উকীলবাবু ভালই করেছেন। উঠে যাচ্ছেন তিনি। এ মকদ্দমা জেতা যায় না, জেতা সম্ভব নয়। গোকুল সরকার হেরে গেলেও আইন-আদালতকে হারাতে পারতেন না উকীলবাবু। হুম্ ক'রে মস্তবড় একটা আওয়াজ কর্নেল বিশ্বাস রোডের ওপর দিয়ে যেন ছিটকে এসে পড়ল ট্রাম-রাস্তার ওপর। বোধ হয় তাঁর শোবার ঘরের সিলিংটা ভেঙে পড়ল। নিজের মাথার ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিলেন সুবোধবাবু। তারপর বিনোদ বক্সির রোয়াকের দিকে দৃষ্টি ফেললেন তিনি। তাঁকে যেতে হবে ডানদিকে। ঠেলাগাড়িটা রাস্তার ওপাশে গিয়ে অপেক্ষা করছে। ট্রাম-রাস্তাটা তাঁকেও পার হ'তে হবে। হু'দিক থেকে হুটো ট্রাম এল, এসে চ'লেও গেল। সুবোধবাবু তবু ডাইনে বাঁয়ে হু'দিকেই দৃষ্টি দিতে লাগলেন। নিরাপদ রাস্তা যেন পৃথিবীর কোথাও নেই। এই ভেবে সুবোধবাবু সত্যি সত্যি এবার রাস্তাটা পার হ'য়ে গেলেন। এসে দাঁড়ালেন ঠেলাগাড়িটার পাশে। হাতের বইখানা ফেলে রাখলেন ঠেলাগাড়ির ওপর।

ঠিক সেই সময় ট্রাম থেকে নেমে পড়ল অমিয়াংশু সেন। সুবোধবাবু দেখলেন ওকে। অবাকও হলেন একটু। ট্যাক্সি চেপে সে আসে নি। এমনকি গ্যাবার্ডিন কাপড়ের প্যাণ্ট কোট পর্যন্ত আজ অমিয়াংশু সেন বর্জন ক'রে এসেছে। ধুতি পাঞ্জাবি প'রে এসেছে সেনসাহেব।

রাস্তার এপাশ থেকে অমিয়াংশু ডাকলো, "সুবোধবাবু, সুবোধ-বাবু—একটু দাঁড়ান, আমি আসছি।"

পর পর হু'খানা ট্রাম মাঝখান দিয়ে পার হ'য়ে যাওয়ার পরে অমিয়াংশু ওপাশে গিয়ে পৌঁছলো। সুবোধবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে অমিয়, কবে ফিরলে ?"

জবাব দেওয়ার আগে অমিয়াংশু অদ্ভুত এক কাণ্ড ক'রে বসলো। সুবোধবাবুর পায়ের ধুলো নিল।

সুবোধবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি অমিয়?"

"দিল্লী গিয়েছিলুম। দাদা-বৌদিরা কেউ রাজী হলেন না।"

"তার মানে?"

"আমি ললিতাকে বিয়ে করতে চাই।"

সুবোধবাবু হাসলেন একটু। তারপর বললেন, "চলো, যেতে যেতে কথা হবে।"

"ঠেলাগাড়ি কেন সঙ্গে?" জিজ্ঞাসা করল অমিয়াংশু।

"কর্নেল বিশ্বাস রোডের বাড়িটা আমরা ছেড়ে দিলুম। আর থাকতে পারলুম না।"

"কেন? রোয়াকটাকে ভয় পেলেন না কি? কেন ছাড়লেন? বিনোদ বক্সিকে আমি এবার শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।"

আবার হেসে ফেললেন সুবোধবাবু। জিজ্ঞাসা করলেন, "এত সাহস কোথায় পেলে? মনে হচ্ছে, দিল্লী থেকে নতুন মানুষ হ'য়ে ফিরেছ।"

"হ্যাঁ, আমি আর কাউকে ভয় করি না। দাদা-বৌদিদের অমতেই আমি ললিতাকে বিয়ে করব। দিল্লীর চাকরি পর্যন্ত আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছি। সুবোধবাবু, আপনারা কি এ-বিয়েতে রাজী নন?"

"চলো, বেলা বাড়ছে। যেতে যেতে কথা হবে।"

"কোথায় যাচ্ছেন এখন?"

"কসবায়—করপোরেশনের বাইরে।"

কসবার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে অমিয়াংশুর বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না। বিড়লা-পার্কের কাছে এসে অমিয়াংশু জিজ্ঞাসা করল, "এখান থেকে আর কতদূর?"

"কেন হে, এইটুকু পথ চলতে হাঁপিয়ে পড়লে না কি?"

"না, ঠিক তা নয়। ললিতা, চন্দন, ওরা সব কোথায় গেল?"

"ওরা ট্যাক্সি চেপে গেছে। অমিয়, তুমি বোধ হয় অতটা পথ হাঁটতে পারবে না। এক কাজ করো—তুমি বরং কাল অফিসে এসো।"

অমিয়াংশু তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। কি করবে ঠিক করতে পারছিল না। সুবোধবাবুর মত সে পায় নি। ললিতাকেও পাকাপাকিভাবে কথাটা জিজ্ঞাসা করা হ'ল না। বিয়ের প্রস্তাবটা যখন সে একবার পেশ ক'রে ফেলেছে তখন কি আগামীকাল পর্যন্ত তার অপেক্ষা করা উচিত? চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধান বড় কম সময় নয়। এর মধ্যে সব-কিছু নড়চড় হ'য়ে যেতে পারে। দিল্লীর পারিবারিক বন্দর থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে। পেছন দিকে ফিরে চাইবারও আর কোন দরকার ছিল না। গত একশো বছরের লম্বা রাস্তাটা পার হ'য়ে এসে এখন আর বাকি পথটুকু হাঁটতে ওর ভয় পাওয়া উচিত নয়। মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ভুলে যাওয়াই ভাল।

বিড়লা-পার্কের উল্টোদিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন সুবোধবাবু। ঠেলাগাড়িটাও অপেক্ষা করছিল। মিনিট দুই পরে সুবোধবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "অমিয়, আওয়াজ শুনছো?"

"আওয়াজ? কিসের আওয়াজ?"

"সোনা-কুঠির গোকুল সরকার বাড়িটা ভেঙে ফেলছেন। কী ভীষণ আওয়াজ! মাথার ঘিলু পর্যন্ত ন'ড়ে উঠছে। অমিয়—"

"আজ্ঞে—"

"আমাদের পুরনো আশ্রয়টা ভেঙে গেল!—তবুও বাঁচবার জন্যে চেষ্টা করতে হচ্ছে। চলো—" এই ব'লে সুবোধবাবু পুনরায় হাঁটতে লাগলেন সামনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ঠেলাগাড়িটাও চলতে

লাগল। মিনিট পাঁচ হাঁটবার পরে বালিগঞ্জ পোস্ট অফিসের কাছে এসে সুবোধবাবু বললেন, “অমিয়, একটা গল্প শুনবে ?”

“মন্দ হয় না। উঃ, কী গরম! মাঝে মাঝে বিশ্রাম করা দরকার। আর ক' মাইল বাকি ?” রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে অমিয়াংশুই বলল, “গল্পটা শুনি।”

“রাশিয়ার রাজাদের আমলের গল্প। কার কাছে যে গল্পটা শুনেছিলাম আজ আর মনে নেই। দাঁড়াও—” সিগারেট ধরালেন সুবোধবাবু। দু'একটা টান মারবার প'রে তিনি বুঝতে পারলেন অমিয়াংশুরও ধূমপান করবার প্রবল ইচ্ছা হয়েছে। তিনি মৃদু হেসে বললেন, “তুমিও একটা ধরিয়ে নাও অমিয়। এখনো তো আমি তোমার শ্বশুর হই নি হে। তোমার বিলিতী ব্র্যাণ্ড বা'র করো—”

“নাঃ, এই রোদ্দুরে ওসব ধোঁয়া-টোয়া গিলতে আর ভাল লাগছে না। ভাবছি, সিগারেট আর খাবই না। জানি কষ্ট হবে —তা হোক। এখন থেকে আমি কষ্ট করতেই চাই।”

“আরও প্রায় তিন মাইল পথ হাঁটতে হবে, অমিয়।”

“বলেন কি ?” অমিয়াংশু রুমাল নিঙড়ে ঘাম ফেলতে লাগল।

“তাহ'লে তুমি ট্যাক্সি চেপে এসো। আমরা যাই—”

“গল্পটা ব'লে যান।”

অমিয়াংশুর মুখের দিকে চেয়ে সুবোধবাবু বলতে লাগলেন, “গল্পটা আমি ললিতার কাছ থেকেই শুনেছি। এইমাত্র মনে পড়ল। নিকোলাস তখন রাশিয়ার সম্রাট। বোধ হয় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়। সম্রাট নিকোলাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। বিপ্লবের বীজ বোনা হ'য়ে গেছে। বিশিষ্ট একজন বিপ্লবী ধরা পড়লেন। বিচার হ'ল না তাঁর। সম্রাট হুকুম দিলেন, বিপ্লবীকে গোপনে মেরে ফেলতে হবে। গুলি ক'রে মারবার হুকুম তিনি

দিলেন না। শীতের সময়। তাঁকে বরফের তলায় চাপা দিয়ে রেখে ধীরে ধীরে মারতে হবে। সেইরকমই ব্যবস্থা হ'ল। প্রায় এক শো মাইল দূরে বিপ্লবীকে নিয়ে এল সম্রাটের পুলিশরা। চতুর্দিকে বরফ আর বরফ। মস্তবড় একটা বরফের তলায় তাঁকে শুইয়ে দিল ওরা। তার আগে বিপ্লবীটিকে ভীষণভাবে জখম করতে হয়েছিল। সন্ধের একটু আগে পুলিশরা বুঝতে পারলে, লোকটা আর বেঁচে নেই। কাজ শেষ ক'রে তারা ফিরে গেল সম্রাটের কাছে। অমিয়, বড্ড বেশি ঘামছ তুমি।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। মনে হচ্ছে, সকালবেলাতেই এক শো পাঁচ ডিগ্রী হয়েছে।"

"তা হ'লে তুমি একটা ট্যাক্সি ধ'রে নাও। হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম করো।"

"গল্পটা শেষ করুন।"

"এত গরমে তোমার গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে?"

"এত ঠাণ্ডায় লোকটা বোধ হয় মরল না?"

"না। তুমি ঠিকই ধরেছ। মরলে তো আর গল্প থাকত না। দিন পাঁচেক পরে তিনি ফিরে এলেন তাঁদের আড্ডায়। সাত দিন পর্যন্ত তাঁর হুঁশ ছিল না। তারপর বন্ধুরা জিজ্ঞেস করল, 'কি ক'রে বেঁচে এলেন আপনি?' বিপ্লবী-নেতার মুখ থেকে তারা শুনলো, 'এমন অবস্থায় সত্যিই কেউ বাঁচে না। পুলিশরা কখন যে চ'লে গিয়েছিল আমি টের পাই নি। হঠাৎ আমার জ্ঞান ফিরে এল মাঝরাত্রির দিকে। চোখ খুললুম। মাথার ওপরে কালো আকাশ। দিগন্ত যে ওখান থেকে কত দূর তাও বুঝতে পারি নি। তখন মনে হ'ল, দু' এক ঘণ্টার বেশি আমি বাঁচব না। ক্ষীণ অনুভূতি যেটুকু ছিল তার ওপরেও ক্রমে ক্রমে যেন বরফ জমতে লাগল। একটু উত্তাপ যদি পেতুম! আমি বিপ্লবী, জীবনে

কোন কিছুই তো চাই নি। সেদিন শুধু একটু, শুধু এক চামচে উষ্ণতা আমি ভিক্ষা চেয়েছিলুম। ওপরের দিকে কালো আকাশের কাছে ভিক্ষা চাইতে গিয়ে দেখলুম যে, দূরে, অনেক দূরে একটা রেখার মত কি যেন ক্রমশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। দিগন্ত নয় তো? দিগন্তের চেয়েও দূরের অস্তিত্ব চোখে পড়ল আমার। রেখাটা আসলে একটা মোমবাতির শিষ। মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে শিষটা। সারারাত আমি সেই আলোটার দিকে চেয়ে রইলাম। ভোরের দিকে আমার মনে হ'ল আমার দেহের কোথাও আর উত্তাপের অভাব নেই। মোমবাতিটা সমস্ত রাত ধ'রে পুড়েছে। পুড়েছে শুধু আমাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। শুধু কি আমাকে? বন্ধুগণ, রাশিয়ায় কি মাত্র একজন নিকোলাসই রয়েছেন? একাধিক নিকোলাস তো সারা দেশটাকে বরফ দিয়ে' আবৃত ক'রে রেখেছেন। তবে আমরা, কোটি কোটি রাশিয়ান বেঁচে আছি কি ক'রে? আজ মনে হচ্ছে, সেই আলো থেকেই উত্তাপ আমরা পেয়েছি। উপলব্ধির জগতে বরফ সব গলছে। বন্ধুগণ, আশার আলো কখনই নেবে না। যদি নিবতো তা হ'লে এক শো মাইল পথ আমি হেঁটে এলুম কি ক'রে? পরের দিন ভোরবেলা থেকেই বরফ সব গলতে আরম্ভ করল। পথ তৈরি হ'য়ে গেল। অনিশ্চয়তা আর রইল না। সম্রাট নিকোলাস ওই মোমবাতিটির অস্তিত্ব দেখতে পান নি।' অমিয়—"

"আজ্ঞে—" অমিয়াংশু চমকে উঠল। উপলব্ধির জগতে সেও যেন ঢুকে পড়েছিল। সুবোধবাবু বললেন, "শুধু বিনোদ বক্সিকে আমরা আর অপরাধী করব না।"

"কেন? কেন করব না?" তেড়ে উঠল অমিয়াংশু সেন।

"মূল সমস্যা তো প'ড়ে রয়েছে রোয়াকের তলায়। আমরা যদি সেই বিপ্লবীটির মত কোন-কিছু একটা দেখতে না পাই তা

হ'লে সেখান থেকে বেরুবার পথ পাব না। পৃথিবীর নিকোলাস এবং বিনোদ বক্সিরা চিরদিনই রোয়াকের ওপর আড্ডা জমিয়ে বসবেন। অসৎ-এর বিচরণভূমি শুধু ওখানেই আবদ্ধ হ'য়ে নেই। আজ থাক। এবার চলি। অমিয়—" সুবোধবাবু চেয়ে রইলেন অমিয়াংশুর দিকে।

"আজ্ঞে—" অমিয়াংশু ঘর্মাক্ত।

"আচ্ছা থাক। কাল তুমি অফিসে এসো। বড্ড কড়া রোদ উঠেছে। এখনো মাইল তিন পথ যেতে হবে।" এই ব'লে সুবোধবাবু সামনের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

অবাক হ'য়ে অমিয়াংশু চেয়ে ছিল ললিতার বাবার দিকে। ক্লাশ 'থ্রী'র কেরানী ব'লে আর তাঁকে চেনা যাচ্ছে না। স্বাধীন রাষ্ট্রের নতুন জাত-বিভাগটা তিনি যেন এইমাত্র মুছে দিয়ে গেলেন। পৃথিবীর বুকটাও বুঝি সমতল হ'ল। উঁচু-নিচু সব ভেঙে দিয়ে গেলেন সুবোধবাবু।

একটা 'বেবি' ধরবে, না বাসবার দিকে পা বাড়াবে ঠিক করতে পারছিল না অমিয়াংশু। ঠেলাগাড়িটা এগিয়ে গেছে। এগিয়ে চলেছেন সুবোধ মিত্রও। মুহূর্তগুলোই শুধু অনিশ্চয়তার টানে বিলম্বিত হ'তে লাগল।

শেষ পর্যন্ত পথ বেছে নিল অমিয়াংশু সেন। ডান এবং বাঁ, দু' দিকটাই ভাল ক'রে দেখে নিল একবার। তারপর ঠেলাগাড়িটার পেছনে পেছনে সেও হাঁটতে লাগল।

পথের নিশ্চয়তা পছন্দ হ'ল ওর।